সমাজ ও শিশুশিক্ষা

প্রতিভা গুপ্ত

পরিচালিকা, শিশুশিক্ষা-শিক্ষণ বিভাগ, অধ্যাপিকা, শিশুশিক্ষা-নীতি,
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

যে শিশুদের কল্যাণে এই গ্রন্থটি লেখা সম্ভব হলো, তাদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম

ভূমিকা

বাঙলায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বই বেশী নাই। শিশুশিক্ষা-সংক্রান্ত বই তো নাই বললেই চলে। অথচ আজকার দিনে এই জাতীয় বইয়ের প্রয়োজন আছে।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, ছেলের ভবিষ্যৎ শিক্ষার গোড়াপত্তন তার পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই হয়ে যায়। সেইজন্য আজ সমস্ত প্রগতিশীল দেশে শিশুশিক্ষার উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে আমরা শিশুশিক্ষার সম্বন্ধে এখনও তেমন সচেতন নই। তাই আজ কলকাতার বাইরে শিশুবিদ্যালয় আমরা বড় একটা দেখতে পাই না।

শিক্ষার এই দিকটার সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের জন্য এই শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য। শিক্ষাবিদরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু চিন্তা করলেও জনসাধারণ এ বিষয়ে একরকম উদাসীন। শিশুশিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হলে এই ঔদাসীন্য দূর করতে হবে।

শিশুশিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক দেশে খুব কম। এই বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। যাঁরা এই শিক্ষার কাজ করতে চান তাঁদের একটা বড় বাধা এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। জনসাধারণকে এই শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য এবং যাঁরা এই শিক্ষার কাজ করতে চান তাঁদের সাহায্যের জন্য শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বইয়ের একান্ত প্রয়োজন।

এইদিক থেকে এই বইখানি খুব সময়োপযোগী হয়েছে। লেখিকা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং কিছুদিন থেকে এই নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন। বইখানি তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ফল। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন তারই খানিকটা পরিচয় তিনি তাঁর এই বইটির মধ্যে দেবার চেষ্টা করেছেন। বইখানি শিশুশিক্ষানুরাগী সকলেরই কাজে লাগবে বলে আমি আশা করি।

বিদ্যালয়
কলানবগ্রাম,
বর্ধমান

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

ফুলগাছে জল দেওয়া হচ্ছে ২। বাগানের মাটি প্রস্তুত ৩ মাটির কাজ
৪। বালিতে খেলাধূলা ৫। কাঠের কাজ

ভাবসাম্য রক্ষা ২। চোর-পুলিস খেলা ৩। সমবেত প্রার্থনা

৪। পুতুল খেলা ৫। স্লাইডএ আরোহণ
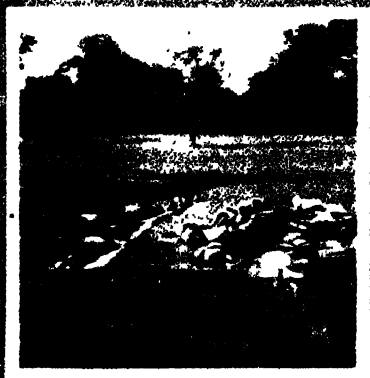
১। দোকানের মাধ্যমে অঙ্ক শিক্ষা ২। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে প্রক্ষালন ৩। মধ্যাহ্ন ভোজন
৪। উন্মুক্ত স্থানে বিশ্রাম ৫। নিদ্রার পরে দন্তধাবন

প্রথম অধ্যায়

শিশুশিক্ষার ধারা

শিশুশিক্ষার ধারা

"ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।"

—রবীন্দ্রনাথ—

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা চিন্তা ও অনুসন্ধান করে আসছে, এবং আজও মানুষের সেই প্রচেষ্টা সমান ভাবেই চলেছে। শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, এ কথা আজ আমাদের শিক্ষাবিদগণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরা শিশুর জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রকৃষ্ট সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা বিধান দিয়েছেন—শিশুপরিচর্য্যা ও প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের বা নার্সারি স্কুলের মাধ্যমে। তাঁরা বুঝেছেন যে শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ-অনুভূতির যথাযথ বিকাশের উপরেই নির্ভর করে শিশুর সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন। মানুষের আবেগ ও অনুভূতির যথার্থ বিকাশে যেমন একদিকে উচ্চশ্রেণীর শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত জন্মলাভ করেছে, অন্যদিকে দেখা যায় যে, আবেগ অনুভূতির বিকৃত ও বিভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে, সময় সময় মানুষ বর্ব্বর পশুর মত আচরণ করেছে। মানুষের পক্ষে তার আবেগ অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করে জয় করা সম্ভব নয়, কিন্তু শৈশব থেকেই যদি তার অনর্জ্জিত প্রবৃত্তিগুলিকে সহজভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ক্রমশঃই সেগুলি সংযত ও সুসংহত হয়ে শিশু-জীবনের প্রগতিপথে মানবের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে তুলবে আশা করা যায়।

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহু শিক্ষাবিদ্, বহু কাল ধরে বিভিন্ন মতবাদের প্রচার করে গেছেন। তাঁদের কারও মতে, মনোবৃত্তির সম্যক বিকাশই শিক্ষার আদর্শ, আবার কারও মতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার কাম্য, আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বলেন চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের শিক্ষাবিদ্‌গণের অবদানের বিষয় জানতে হলে, প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা দেখি যে সনাতন বা classical educationএর উপরেই বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম্ম, শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষাদানই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্যই, দ্বাদশবর্ষ বয়সে "দ্বিজ" সন্তানের উপনয়নের পরেই বালকের শিক্ষারম্ভের উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত হতো।

পরবর্ত্তী যুগে, ৫ বৎসর বয়সে 'হাতে খড়ি'র সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর শিক্ষালাভ সুরু হতো। গ্রামের পুরোহিত ছিলেন শিক্ষাদাতা গুরু। সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় যে সকল শিশু গুরুর কাছে শিক্ষালাভের উপযুক্ত বলে গণ্য হতো তাদের তিনি "3 R's" অর্থাৎ লেখা, পড়া, অঙ্ক কষা শেখাতেন। এছাড়া ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অন্য কোন নির্দ্দেশ আমরা পাই না। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদগণ আজ বুঝতে পেরেছেন যে, শৈশবের অভিজ্ঞতার উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে ওঠে। তাই আজ পাশ্চাত্য জগতে শিশুশিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য শিক্ষাবিদগণ আপ্রাণ চেষ্টায় শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করে যথেষ্ট সুফল অর্জ্জন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা জগতে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আজ আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। এবং তার ফলে আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বুঝেছেন যে শিশুর জন্যই শিশুশিক্ষাবিধির সৃষ্টি, শিক্ষাবিধি প্রচলনের উপকরণমাত্র হয়েই মানবসমাজে শিশুর আবির্ভাব হয়নি। এইজন্যই, শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষালয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে ক্রমশঃই দ্রুতভাবে ব্যাপকতর হচ্ছে। কিন্তু

আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস জানবার আগে, পাশ্চাত্য মনীষীগণের প্রবর্ত্তিত শিশুশিক্ষা বিধান ও পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। কেননা আমাদের বহু পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য জগতেই শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৬৯-৩৯৯ সালে সক্রেটিস শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করে বলেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষা অবহেলা করে, সে দেশে কখনও উৎকৃষ্ট জাতি গড়ে উঠতে পারে না। এথেন্স সহরে শিশুদের কি ভাবে যত্ন নেওয়া হতো তারও বহু প্রমাণ নানা পুস্তকে পাওয়া যায়। (১) তারপর তাঁর উপযুক্ত শিষ্য প্লেটো (খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২৭—৩৪৭ সাল) ও পরে আরিষ্টটল (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮৪—৩২২ সাল) শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বে মানবজীবনের শৈশবকালকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার অভ্যাস ও চিন্তাধারা সৎপথে চালিত করা প্রত্যেক জননী ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য। খৃষ্টপূর্ব্ব একশত বৎসরে ইহুদিগণের মন্দিরের মধ্যে শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং পরে ৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহুদি বালকদিগের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। (২)

সপ্তদশ শতাব্দীতে কমিনিয়াস (Comenius, ১৫৯২—১৬৭১) তাঁর

(১) A History of Western Education by H. G. Good. pp. 24—That the Athenian parents loved and indulged their children is shown in literature and many inscriptions. There were cradle songs, children's stories and many toys and games. The manufacture of dolls was an Athenian industry. The games were such universal favourites as marbles, leapfrogs, hoops, ball games and knuckle-bones. Children's games are among the most conservative and persistent customs.

(২) (ক) A History of Western Education—By H. G. Good, pp. 36. —Both Plato & Aristotle began with infancy and the care and hygiene of the young child.

(খ) A Cultural History of Education—By R. Freeman Butts. (McGraw ill Bock Co.)

৭৫ পৃষ্ঠা—Plato's "Republic"—Children should be reared in state nurseries before the age of six, and during this time they should be

বিখ্যাত পুস্তকে (School of Infancy) (৩) শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন, সকলেরই তা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। তারপরে মহামতি রুসো (Rousseau, ১৭১২—১৭৮৮), পেষ্টালটসি (Pestalozzi, ১৭৪৬—১৮২৭), ও হার্ব্বার্ট (Herbart, ১৭৭৬—১৮৪১) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ মানবজীবনের শৈশবকালকে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। এর পরেই আমরা এসে পড়ি শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ফ্রোবেলের (Froebel, ১৭৮২—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) যুগে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রোবেল জন্মগ্রহণ করেন জার্ম্মাণীর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে বড় হয়ে তিনি জঙ্গল পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়েই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয় ঘটে এবং তখন থেকেই তিনি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তিনটি বিভিন্ন স্থানে প্রায় একই সময়ে শিশু শিক্ষালয় গড়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এই তিনটি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকগণ পরস্পরের কাজ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। অথচ শিশু জীবনের অনর্থক অপচয় দেখে তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিশু-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ওবেরলিন (J. F. Oberlin, ১৭৪০—১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) নামক একজন পুরোহিত ওয়ালড্‌বাক, আলসাস অঞ্চলে (Waldbach,

---

taught fairy tales, nursery rhymes, and stories of the gods, with emphasis upon the virtuous gods and omission of immoral stories.

Page 74—Aristotle,—Aristotle further believed that the organisation and curriculum of education for free citizens should follow the growth patterns of children. Infants, who are virtually animals, should be given opportunities for play, physical activity and proper stories.

Page 20--Appearance of the Formal School,—The religious control of education was always uppermost in Jewish culture by the beginning of the Christian Era. Schools were required to be set up in every Jewish Community and compulsory education for boys was a part of the law.

(৩) page 1--Report on Infant and Nursery Schools H M S O , London. This celebrated treatise dealing with the education of children up to the age of six, was an expansion in German of Chapter XXVII of the Czech draft of Comenius' Didactica written in 1628. It was published in 1633 at Leszno in Poland. Comenius states that his School of Infancy was translated into English in 1641. A Patera Korrespondence J. A. Komenskeho, (1892), p. 89.

Alsace) শিশুদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে নব পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। এখানে পরিচালিকাগণ (Conductrices) শিশুদের জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন, পরিবেশ পরিচিতি কালে ফুল, ফল ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির প্রতি তাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করতেন। শিশুদের চিত্তাকর্ষক গল্প বলতেন, ছবি দেখাতেন এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ ব্যবস্থার দ্বারা যেন তাদের চিত্তের প্রসার হয় সেজন্য আয়োজন করতেন। এই কেন্দ্রটি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড ও জার্মাণীর কোন কোন স্থানে ওবেরলিনের আদর্শে শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (৪)

ইংলণ্ডে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen—১৭৭১—১৮৫৮) স্কটল্যাণ্ডের নিউ ল্যানার্ক গ্রামে (New Lanark, Scotland) শিশুদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে তিন বৎসর বয়স হতেই শিশুরা আসতো এবং তাদের পিতামাতাদের অবর্ত্তমানে শিক্ষিকাগণ এই শিশুদের তত্ত্বাবধান করতেন। (৫) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রোবেল কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) নাম দিয়ে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই শিশুবিদ্যালয়কে "শিশুকানন" সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে শিশুরা উদ্যানের চারাগাছের মত স্বাভাবিক গতিতে, উত্তম পরিবেশের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করবে। (৬) মানবজীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের মূল্য অতুলনীয়।

(৪) Report of the Consultative Committee on Infant and Nursery Schools. H. M. S. O, London, Chapter 1, pp. 2.

(৫) Page 175—Life of Robert Owen, written by himself. London 1857. Children received at the age of three in our preparatory or Training School, in which they are constantly superintended, to prevent their acquiring bad habits, to give them good ones and to form their dispositions to mutual kindness. The school in bad weather is held in apartments properly arranged for the purpose, but in fine weather the children are much out of doors that they may have sufficient exercise in open air.

(৬) (ক) The Teachers Encyclopaedia Vol. VII. Edited by A. P. Laurie M.A, D.Sc.—pp. 177, Froebel (1782-1852). In 1840 he founded at Blackenburg the first Kindergarten School for the purpose of educating young children, and of training teachers and nurses in the true methods of teaching.

(খ) A Cultural History of Education—Butts. (McGraw-Hill Book Co.) pp. 434. Froebel—His philosophy of Education.

এই পাঁচ বৎসরের শিক্ষাই শিশুর সারাজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। যে সব বালক-বালিকাগণ ৯।১০ বৎসর বয়সে ফ্রোবেলের কাছে বিদ্যালাভের জন্য আসতো, তাদের নানা মন্দ অভ্যাস থাকায় এবং তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় তাদের শিক্ষাদানে ফ্রোবেলকে বিশেষ বেগ পেতে হতো। এইজন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (The Education of Man)লিখেছিলেন (৭) যে কৈশোরের স্বাস্থ্যহীনতা বা মন্দ অভ্যাসের জন্য শৈশবের কুশিক্ষাই দায়ী। শিশুর জন্মের পূর্ব্ব হতেই যদি জননী নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেন এবং তার জন্মের পর নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে আর কোনই অন্তরায় থাকে না। এ ছাড়া, ফ্রোবেল তথাকথিত ইয়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। ইয়ুরোপের ক্ষমতা, পরাক্রম ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের চাপে মানবতা, সহৃদয়তা ও পরস্পরের মধ্যে মানুষের সহজ, সরল সম্পর্ক ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে চলেছে দেখে তিনি ভীত ও ত্রস্ত হয়ে উদাত্ত স্বরে জানালেন আহ্বান, "এসো, সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে যেখানে মনুষ্যত্বের সহজ আস্বাদ পাই, চলো সেইখানে ফিরে যাই।" শিশুদের শরীর ও মনে শান্তি ও সহিষ্ণুতা বিরাজ করুক, এই তিনি চেয়েছিলেন। সে-শিক্ষা পেতে হলে মানুষকে ফিরে যেতে হবে প্রকৃতি মায়ের কোলে। ফ্রোবেল সৌন্দর্য্য অনুভূতিকে সৌখীন বিলাস বলে জ্ঞান করেন নি, তিনি জানতেন এতে গভীরভাবে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়—আর, এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণ হলো পরিপূর্ণ শান্তি। তিনি আরও বলেছেন যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ ও বাস্তবের সংঘাত হতে রক্ষা করে। আসন্ন ধ্বংস থেকে ইয়ুরোপকে বাচাতে হলে দেশের শিশুদের মনের মধ্যে সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাতে হবে বলেই তিনি তাঁর Kindergarten বা "শিশু কানন" প্রতিষ্ঠা করেন।

তরুণী কন্যা ও জননীদের শিশুপরিচর্য্যা ও শিশু লালনপালনের কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি যে সব সরঞ্জাম বা উপহার (gifts) ব্যবহার করতেন, সেগুলি আজ পর্য্যন্ত মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিশুশিক্ষায় ব্যবহার করছেন। দুঃখের বিষয় এই যে জনসাধারণ ফ্রোবেলের শিক্ষাতত্ত্ব

(৭) Froebel—The Education of Man. Ch VI.—Connection between the school and the family and the subjects of instruction it implies.

সহজে বুঝতে না পেরে, তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি—তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিকৃতরূপে ব্যবহার করে এবং ফলে জার্ম্মাণীতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে শিক্ষাবিদগণ ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা সুরু করেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ফুল যেমন বাগানে ফোটে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশধারার নিয়মে, তেমনি "কিণ্ডারগার্টেনে" শিশু তার নিজস্ব বংশগতিক শক্তি প্রকাশ করবে আপনার স্বাভাবিক পরিবেশে, স্বাভাবিক নিয়মে। জোর করে ফোটাতে গেলে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। শিশু-প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষক কোনমতেই শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবেন না, ফ্রোবেলের এই অমোঘ শিক্ষা। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে আজ আরও গভীরভাবে কার্য্যকরী করে তুলেছেন বিংশ শতাব্দীর শিশু-মনস্তত্ত্ববিদগণ। বৈজ্ঞানিক মতে শিশুর জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের সুসম্পাদনে অশেষ সহায়তা করেছেন।

ম্যাদাম মন্তেসরী (Madame Montessori, ১৮৭০—১৯৫২) শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করেছেন, শিক্ষাজগতে তা সম্পূর্ণ নূতন না হলেও তাঁর সিদ্ধান্তগুলির গুরুত্ব কম নয়। তিনি ফ্রোবেলের সুযোগ্যা শিষ্যা। ফ্রোবেলের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনার কার্য্যে মগ্ন থাকবে। শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজনমত তাকে সাহায্য করবেন, নির্দ্দেশ দেবেন, কিন্তু তার কোন প্রচেষ্টায় বাধা দেবেন না। শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবে এবং শিক্ষিকা সেইজন্য শিক্ষাসম্ভাবনা-পূর্ণ পরিবেশ (environment with educational possibilities) রচনা করবেন এবং তারই ফলে শিশুর আনুভূতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হবে। (৮)

(৮) Il Metodo della pedogogia Scientifica applicato all' educaticne infantile nelle case dei bambini Rome, 1912.

(ক) The English translation by Anno. E. George, published in 1912, New York and London is entitled, "The Montessori Method".

(খ) The secret of childhood.

(গ) The Discovery of child.

বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণ বেশ সহজভাবেই ম্যাদাম মন্তেসরীর মতবাদ গ্রহণ করেছে, অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষার গুরু মহামতি ফ্রোবেলকে তাঁর মতবাদের জন্য কতই না লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল—কেন ?

প্রথমতঃ, ফ্রোবেলের শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি এত বেশী সূক্ষ্ম ও গভীর যে সাধারণ লোকে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তদানীন্তন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে ফ্রোবেল করেছিলেন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা। বস্তুমাত্রেরই উৎস হচ্ছেন সেই পরম ভগবান, শিশু স্বয়ং ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি, সেইজন্য তার সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত সদবৃত্তিগুলি সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হয়ে উঠবে, ফ্রোবেলের মতে শিশুশিক্ষার এই হলো মূলনীতি। শিশুর জীবন কিভাবে প্রকৃতির শোভার সঙ্গে, পরে মানুষের সঙ্গে এবং পরিশেষে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে ফ্রোবেল তা নিজে গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেও সহজ ও সরল ভাষায় তাঁর শিক্ষা সাধারণের বোধগম্য করাতে পারেননি। কাজেই তাঁর শিক্ষাদর্শন যেন কতকটা কুয়াসাবৃত।

দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণ শিশুর অধিকার ও দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। শিশুজীবনের একান্ত অক্ষমতা তারা অবহেলার চোখে দেখতো। সবল ও সক্ষম ব্যক্তি, যারা রাষ্ট্রের কার্য্যভার সাক্ষাতভাবে পরিচালনা করবে তাদেরই দাবী ছিল সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য এবং তাদেরই উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলবার জন্য সকলে থাকতো অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর বিশেষ কোন স্থান ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণ, বিশেষ করে গৃহস্থ পিতামাতারা শিশুর জন্মগত অধিকার মেনে নিতে কুণ্ঠিত হননি। এর জন্য আমরা শিশু-মনস্তত্ত্ব-বিদগণের কাছে ঋণী। তাঁরাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু মাত্র কয়েক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছে বলে পৃথিবীতে তার দাবী কোন অংশে কম নয়। শিশু স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তার মন কাদার মত নয় যে ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে গড়ে তোলা যাবে, কিম্বা পরিষ্কার ধোওয়া মোছা শ্লেটের মতও নয় যে শিক্ষিকা বা অন্য কোন অভিভাবক ইচ্ছামত দাগ কাটলেই সেই দাগ থেকে যাবে। তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই সুফলপ্রসূ হতে পারে না। ফলে বিংশ শতাব্দীকে "শিশু শতাব্দী" আখ্যা দিয়ে সমস্ত সভ্যদেশই আজ শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট।

তৃতীয়তঃ, মন্তেসরী স্কুলে কিণ্ডারগার্টেনের মত সমবেত ভাবে শিক্ষা দেওয়া

হয় না। ফ্রোবেল অপেক্ষা ম্যাদাম মন্তেসরী শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদান প্রণালী তিনিই প্রবর্ত্তিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেবলমাত্র তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা সরঞ্জামগুলির ব্যবহার কালেই বিশেষ করে প্রযোজ্য, এইজন্য শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে কিছুটা গতানুগতিক ধারা এসে পড়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। ফ্রোবেলের শিক্ষাপদ্ধতি মতে একজন শিক্ষিকা ১৫ থেকে ২০ জন পর্য্যন্ত শিশুকে দলগতভাবে তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু ম্যাদাম মন্তেসরীর মতে একজন শিক্ষিকা একই রকম কাজের দ্বারা ২০জন শিশুকে একক ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। প্রত্যেক শিশুর সামনে একই রকম সরঞ্জাম দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকে আপনার ক্ষমতানুসারে, নিজের স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয়, সেইজন্য শিক্ষিকার পক্ষে তাদের সকলকেই রীতিমত তত্ত্বাবধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। যে সকল দেশে শিক্ষিকার অভাব, সেই সব স্থানে মন্তেসরী প্রণালী এইজন্য সাদরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আজ শিক্ষাজগতে ফ্রোবেল ও মন্তেসরী প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এবং কখন-কখনও একক ভাবে কখনও বা দলগত ভাবেই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশু আত্মকেন্দ্রিক ; তাই তাকে সমাজ-সচেতনতা দিতে হলে, এই দুই প্রণালীর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন।

শিক্ষাজগতে শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে যে সব অজস্র মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে মতবাদ স্থান পেয়েছে তারই অভিব্যক্তি দেখি কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলিতে। এই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে ডিউয়ি (John Dewey, ১৮৫৯-১৯৫২) অন্যতম। তাঁর মতে অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যেই মানবজীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষের চিন্তাশক্তি আছে বলেই মানুষ পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করে। তিনি বলেন যে শিক্ষাকে কেবল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। শিক্ষা—জীবনযাত্রার ধারা ও জীবন ধারণের প্রণালীবিশেষ। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী এক। এই দুইয়েরই লক্ষ্য অবিরত পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের দ্বারা জীবনধারার গতি নিয়ন্ত্রণ করা ; সুতরাং শিক্ষা স্থিতিশীল নয় কিন্তু গতিশীল। তিনি আরও বলেন যে শিশুর মানসিক ও সামাজিক অভিব্যক্তি পরস্পরের সম্পূর্ণ অধীন নয়।

শিশুর নিজস্ব শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা, তারপর তার বিকশিত শক্তিকে সামাজিক পরিবেশে সক্রিয় ও কার্য্যকরী করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর শিক্ষা তার নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা নিয়ে সুরু করা উচিত, পরে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে ও সামাজিক মূল্যে সেই লব্ধ শিক্ষার মূল্য বিচার করা হবে। যে সামাজিক পরিবেশ বা আদর্শের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পূর্ব্বকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী বাহ্যিক চাপে শিশুকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা যেমন ভুল, অন্যদিকে সমাজকে ও সামাজিক উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করে শুধু ব্যক্তিগত বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করাও ভুল। ডিউয়ির মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা "Activity Method" বা সমস্যাপূর্ণ পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাবিধি অবলম্বন করেছেন তাঁদের শিক্ষাপ্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ।(৯)

এর পরে মারগারেট ম্যাকমিলান (Margaret McMillan) এবং তাঁর ভগ্নী রেচেল ম্যাকমিলানের নাম (Rachel McMillan) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা প্রসারে এই দুই ভগিনীর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। তাঁদেরই আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে ইংলণ্ডে নার্সারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র মহাবিদ্যালয় (College) স্থাপিত হয়েছে এবং এই কলেজ সংলগ্ন নার্সারী স্কুলটিকে ইংলণ্ডের আদর্শ স্কুল বলে গণ্য করা হয়। (১০)

আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দানও বড় কম নয়। বয়স্কের কাছে যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, শিশুর মনোজগতে তা তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে একটি কাহিনীর উল্লেখ করলেই কথাটি বেশ সহজে বোধগম্য হবে। কাহিনীটি এই, বীরভূমের লাল মাটি—যতদূর দৃষ্টি যায়

---

(৯) (ক) A Cultural History of Education--Butts, pp. 528.

(খ) Report on Infant and Nursery Schools--H. M. S. O, London, --pp. 40.

(গ) The School and Society—J. Dewey.

(ঘ) The Development of Education in the Twentieth Century—Adolph E. Meyer. (Modernizing Educational Theory. John Dewey)—pp. 13.

(১০) (ক) The Life of Rachel McMillan by Margaret McMillan.

(খ) Report on Infant and Nursery Schools, Appendix IV; H. M. S. O. London. pp. 254-256.

চারিদিক ধূ ধূ করছে। কিশোর কবি সেই প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে নানা রকম পাথর কুড়িয়ে পকেট ভর্ত্তি করে নিয়ে আসতেন পিতার কাছে। মহর্ষি সেগুলি উপেক্ষা করতেন না, বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "কী চমৎকার, এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে ?" বালক রবি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন, "এমন আরোও কত আছে! কত হাজার, হাজার। আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।"(১১)

সেদিনকার সেই কিশোর কবি বোলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অসীম আনন্দ আহরণ করেছিলেন মনে হয় সেই স্নিগ্ধ অনুভূতির ফলেই তিনি শান্তি-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুমন কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ সে কথা শত শত গানে ও কবিতায় আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করে গেছেন। তারই মধ্যে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক একটি কবিতা নীচে উদ্ধৃত করা গেল।

খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি, "ওমা, দেখ্ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল বাঁধে নাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশ রাশি।

সোনালি রঙের পাখির পালকে
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে,
লয়ে সে-পালক কপোলে বুলায়
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,

(১১) রবীন্দ্রনাথ—জীবনস্মৃতি, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪,—৮৬ পৃষ্ঠা

বলে হেসে হেসে, "ওমা দেখ্ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে ॥"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কী বা জিনিষের ছিরি"
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি।

খেলাধুলো তার হলো নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কারে আর ॥ (১২)

শিশু যখন পাথরের টুকরো, ফুল, শামুক, ঝিনুক, প্রজাপতি সংগ্রহ করে, তখন সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং উপেক্ষা করলে শিশুর প্রতি যে কত অবিচার করা হয়—কত সহজ ও সরল ভাষায়, কত প্রাণস্পর্শী করে এই কবিতাতে সে তথ্য রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গেছেন।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে,—অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, নিদারুণ অর্থ নৈতিক সমস্যার

(১২) রবীন্দ্রনাথ—শিশু, পাখির পালক—১১৫

আমাদের জাতীয় জীবন কত দুর্ব্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছে, মহাত্মা গান্ধী মর্ম্মে মর্ম্মে তা অনুভব করেছিলেন। প্রথম ওয়ার্দ্ধা এডুকেশন কমিটিতে (First Wardha Education Committee) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে মুমূর্ষু গ্রামের জীবন ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে কেবল প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষার ব্যবস্থা করলে চলবে না—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন না হলে দেশের প্রকৃত মুক্তি হওয়া অসম্ভব। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের রচয়িতা ও আনুষঙ্গিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গকে বন্দী করা হয়। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পরই তাঁর প্রথম উক্তিই ছিল এই ঃ "কারাবাসের সময়ে আমি 'নঈ তালিমের' সম্ভাবনার কথা গভীরভাবে ভেবেছি এবং এইজন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছি, তাতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে; এবং সেই সঙ্গে মাতাপিতার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রাম্য সমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠবে। তবেই আসবে প্রকৃত মুক্তি—প্রকৃত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন।"

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে "তালিমী সঙ্ঘ"-এর উদ্যোগে আবার একটি শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় গান্ধীজী অসুস্থ ছিলেন। তথাপি এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনিই। সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেন সাহেব গান্ধীজীর একটি লিখিত বাণী পাঠ করেন। এই বাণীর মধ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষার নূতন পর্য্যায় সুরু হওয়ার সূচনা ছিল। গান্ধীজী এই বাণীতেই বলেছিলেন, "এতদিন আমরা সুরক্ষিত উপসাগরে ছিলাম, আমাদের কাজের সীমা সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ ছিল। আজ আমরা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে খোলা সমুদ্রে এসে পড়লাম। এখন থেকে আমাদের কাজ মাত্র ৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। 'নঈ তালিম' বা নূতন শিক্ষা পদ্ধতিকে—জন্মমুহূর্ত্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ের জনগণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থারূপে প্রচলিত করতে হবে। কাজ বাড়লো অনেক, কিন্তু পুরাণো কর্ম্মীদের নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে হবে।"

এই সম্মেলনের পর, প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রৌঢ় শিক্ষা ও উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি, নীতি, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি রচনার জন্য "তালিমী সঙ্ঘ" বিভিন্ন উপসমিতি নিয়োগ করেন। এই সব উপসমিতি যে সকল সুপারিশ পেশ করেছেন "তালিমী সঙ্ঘ" কর্তৃক সেগুলি গৃহীত হয়েছে। (১৩)

বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একটা গবেষণা চলছে। বর্ত্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার দুটি পরিকল্পনা আমাদের সামনে আছে— ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা ও সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট সাধারণতঃ সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে অভিহিত। ভারত সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা-উপদেষ্টা স্যার জন সার্জ্জেণ্ট-এর নামানুসারেই এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষানীতি কিভাবে পরিচালিত হবে এ সম্বন্ধে তাঁরা স্থির করেন। যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় কিভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবে তার একটি বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এই কমিটি দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। সমগ্র শিক্ষাপর্ব্বকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাই প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা তুচ্ছ করেননি। এই কমিটি প্রাক্-বুনিয়াদী বা নার্সারী শিক্ষার স্তরে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে তিন হতে ছয় বৎসরের শিশুদের জন্য কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অনেক পরিবারেই শিশুর যথোপযুক্ত লালন-পালন, যত্ন ও তত্ত্বাবধান হয় না। বর্ত্তমান যুগে ইয়ুরোপে বা আমেরিকায় শিশুদের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন অসম্ভব। ঐ সমস্ত দেশে মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি সুনির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। শিশুশিক্ষার উন্নতির জন্য কত গবেষণা হচ্ছে ও নানাবিধ সুব্যবস্থা হচ্ছে। এই কমিটি বলেন যে ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায়

---

(১৩) Basic National Education—Syllabus—Hindustani Talimi Sangh, Sevagram, Wardha, C. P. Report on Pre-Basic Education, Page 1—15.

শিশুশিক্ষাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া উচিত এবং এ পর্য্যন্ত যে সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রভূত ও প্রচুর ব্যবস্থা করা নিতান্তই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ—সহরে, শিল্পাঞ্চলে এবং যে যে স্থানে জননীকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়, সেখানে শিশুদের লালন-পালনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। প্রাণচঞ্চল শিশু স্বাধীনভাবে চলে, ফিরে, নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক খেলনা ও আমোদ-প্রমোদের সাহায্যে আপনার স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির স্ফুরণ ও আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

তৃতীয়তঃ—শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সকল শিশু-শিক্ষালয় সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা এই সকল শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে এবং রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থতঃ—শিশু-শিক্ষালয়গুলির পরিচালনার ভার দায়িত্বসম্পন্না, সুশিক্ষিতা, স্নেহময়ী, ধৈর্য্যশীলা, সুদক্ষা মহিলাদের উপরেই অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা মহিলাগণই এই গুরু কর্ত্তব্যভার বহন করবার জন্য বেশী উপযুক্ত।

পঞ্চমতঃ—এই কমিটির মত অনুসারে ১,০০০,০০০ জন শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ৩,১৮,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

ষষ্ঠতঃ—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বক্ষেত্রেই অবৈতনিক হবে। (১৪)

(১৪) Post-war Educational Development in India—Report by the Central Advisory Board of Education—Jan. 1944, Chapter II. Page 12-15.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি

পরিবর্ত্তনশীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি

বংশগতিক ধারা এবং পরিবেশ, এই ছুটি নিয়েই পরিণত মানবের উৎপত্তি এবং বিকাশ। বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে কত যে আলোচনা ও গবেষণা হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, একথা নিশ্চিত যে জন্ম-সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বংশগতিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে যায়; কিন্তু পারিবেশিক প্রভাব থেকে মানুষ কখনও মুক্তিলাভ করতে পারে না। শিশুজীবনে, শিশুর উপর তার পরিবেশের প্রভাব অতি প্রগাঢ়। সেইজন্য, ঠিক এই সময়টিতেই সুষ্ঠু পরিবেশের নিতান্তই প্রয়োজন। তা না হলে শিশুর জীবনবিকাশ ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয়। মানব-শিশু যে সকল গুণাগুণ ও সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেগুলিকে বলে বংশগতিক ধারা বা বংশানুবর্ত্তন। এই গুণ বা দোষগুলি সহজাত ও পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হতে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। এই যে সহজাত গুণাগুণ, এর মধ্যে কতকগুলিকে প্রবৃত্তি, কতকগুলিকে আবেগ-বৃত্তি এবং কতকগুলিকে ঝোঁক বলা হয়। এরা শিক্ষানিরপেক্ষ পৈতৃক সম্পত্তি, জন্মাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদ, এইজন্য শিশু-শিক্ষিকা সর্ব্বপ্রথমে শিশুর এই অনর্জ্জিত স্বভাব-সম্পদগুলি বেশ ভাল করে লক্ষ্য করবেন, কেননা শিক্ষাদানের ও শিক্ষাগ্রহণের আদি উপকরণই এইগুলি। একদিকে যেমন শিশুর উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত অনর্জ্জিত ক্ষমতাগুলি শিশুর শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনি সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ও স্ফুরণের জন্য শিক্ষাপ্রদ পরিবেশের নিতান্তই প্রয়োজন। পরিবার ও সমাজ শিশুর কাছে ক্রমশঃ বাহ্যিক প্রভাবরূপে উপস্থিত হয় এবং শিশু নিজের প্রকৃতি অনুসারে সেই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কোন্ শিশু কিভাবে, কতটুকু গড়ে উঠবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার স্বভাবজ শক্তি ও সামর্থ্যের উপরে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুর জীবনে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন কি?

মাতৃগর্ভে সন্তান উৎপত্তির মুহূর্ত্তটিতেই ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতার বীজটি উপ্ত হয়ে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই সম্ভাব্য ক্ষমতাগুলি বহিঃপ্রকাশের সুযোগ

না পায় ততদিন তা শিশুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে। যথাসময়ে এবং স্বাভাবিক উপায়ে সেই ক্ষমতাগুলি প্রকাশিত হতে না পেলে হয় ক্রমে সেগুলি লুপ্ত হয়ে যায়, না হয় অন্যপথে চালিত হয়। এইজন্যই বলা হয় পরিবেশ বংশানুবর্ত্তনের সম্পূরক। বংশানুবর্ত্তনে প্রাপ্ত কোন গুণ বা দোষ কতটা বিকাশপ্রাপ্ত হতে পারে, পরিবেশের সাহায্যে তাই নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। বংশগতিক ক্ষমতাগুলি অনর্জ্জিত ও স্থির কিন্তু পরিবেশ পরিবর্ত্তনশীল। পরিবেশ এই অনর্জ্জিত ক্ষমতাগুলির পরিবর্ত্তন করতে পারে না বটে কিন্তু সুপ্ত, অপ্রকাশিত প্রকৃতিকে সুপ্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা দিতে পারে। যথোপযুক্ত এবং অনুকূল সুযোগ ও পরিবেশের অভাবে মনীষারও স্ফুরণ ও বিকাশ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা গড়ে তোলাই পরিবেশের কাজ। পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান একথা আজ অস্বীকার করলে চলবে না। পাশ্চাত্যে শিশুশিক্ষার সহায়ক পরিবেশ রচনা করবার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে এত ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন তার কারণ এই যে তাঁরা বেশ সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে বংশানুবর্ত্তন ব্যতীত আর যা কিছুর সঙ্গে প্রাণী, জীব বা মানব সংস্পর্শে আসে তাই ব্যাপক অর্থে প্রভাব বা পরিবেশ। পরিবেশ যত সুষ্ঠু, সুন্দর ও রুচিসঙ্গত করা যায় শিশুর বিকাশও তত সুষ্ঠু, সুন্দর ও রুচিপূর্ণ হবে। এবং তারই ফলে আশা করা যায় যে একদিন পৃথিবীতে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব হবে না।

বিগত ৫০ বৎসরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলে আজ শিক্ষাবিদ্‌গণ নিঃসন্দেহ যে যাদের বয়স ৫ বৎসরের নীচে, সেইসব শিশুদের জীবনগতি যদি অনাবিল নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের সারাজীবনেই এই দুর্ভাগ্যের আভাস পাওয়া যায়। অনেক ছেলেমেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে বেশ সাফল্য লাভ করে, কিন্তু তবুও অহেতুক দুশ্চিন্তার বাতিক বা ভীতিপ্রবণতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। কারণ যে বিষ শৈশবে তাদের জীবনে প্রবেশ করেছিল, তার প্রতিক্রিয়া সারাজীবনই প্রভাব বিস্তার করে চলেছে—অনেক ক্ষেত্রেই এইরকম দেখা গেছে। আজ ইয়ুরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায়তনের প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে এবং জাতীয়

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ঐ সব দেশে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা একটি বিশিষ্ট এবং প্রধান স্থান লাভ করেছে—কেন? তার কারণ এই যে সামাজিক পরিস্থিতির দরুণ শৈশবকালে শিশুসন্তানের জন্য পিতামাতা যেমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে চান, নানাকারণে আজ তাঁরা স্বগৃহে সেই পরিবেশ সম্ভবপর করে তুলতে পারছেন না। সেইজন্যই সমগ্র জনসাধারণের গড়া সমাজ ও রাষ্ট্র স্বয়ং আজ সেই পরিবেশ গঠনের দায়িত্ব স্বীকার ও গ্রহণ করেছে এবং নার্সারি স্কুল বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যাতে সুসম্পন্ন হয় তারই জন্য প্রচেষ্টা করছে। আমাদের দেশেও ঐ রকম নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন যে এখন অত্যন্ত বেশী এবং অবিলম্বেই. যে সেই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করা উচিত, এবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর, নগ্ন, দারিদ্র্যপূর্ণ যে পরিবেশ—ভীরু, অন্ধ অশিক্ষা ও দুর্ব্বল অসহায়তা ও দুর্গতি ভরা যে গৃহ—সেখানে শিশুজীবনের ভিত্তি সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় হবে এমন আশা করাই অনুচিত। তাই, সমগ্র দেশের পক্ষেই আজ আমাদের মূল ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এই যে কিভাবে, কোন্ প্রণালীতে শিশুজীবনের প্রারম্ভিক পরিবেশ সুন্দর ও ফলপ্রসূ করে তোলা যায়? বিশ্বজগতে আজ এই সম্বন্ধে অভিমত এই যে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাই হলো এর একটি বিশেষ পথ ও উপায়।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে শিশুর লালন-পালন ও পরিচর্য্যাদি যদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়, তাহলে গৃহের স্থান রইলো কোথায়? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগের জন্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে রকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এ রকম আর কোথাও হয়নি। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারি দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন, সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়—কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পারিবারিক গণ্ডী লোপ পায় তাহলে এই প্রমাণ হবে যে, সমাজে পারিবারিকযুগ সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতাবশতঃই নবযুগের প্রসারতার মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে। সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের; তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ।

এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশী বই কম নয়।" (১৫)

"আশ্রমের শিক্ষা" (১৬) প্রবন্ধে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। মনের সঙ্গে মন মিলে যে খুশির জন্ম, সে খুশি আত্মার বন্ধনমুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ। এ আনন্দের উদ্ভব কেবল কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা সম্ভব নয়, জ্ঞানের দ্বারাও সম্ভব নয়—এর জন্যে প্রয়োজন জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ।" এই যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ, তা সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুট হয় স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে। শিশু যখন জননীর কোলে এসে গোলাপ কুঁড়ির মত দেখা দেয়, তখন মাতার হৃদয়ে জাগে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। শিশুর ক্রন্দন, শিশুর হাসি, শিশুর খেলা ও গতিবিধির মধ্যে তিনি দেখতে পান এক গভীর রহস্য। শিশু শক্তিহীন, অক্ষম ও অসহায়; তার আশ্রয়দাত্রী—তার মাতা। সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহে মাতাই সন্তানবর্গের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে থাকেন। এই সুমহান সেবাব্রতে নারীর গরীয়সী মহিমা। যাতে শিশু সন্তানগণ নিরাপদে থাকে, নিশ্চিন্তে খেলাধূলা করে এবং মনের সুখে বৃদ্ধিলাভ করে, মায়ের লক্ষ্য সেদিকে সদাজাগ্রত। ছেলেদের খেলাধূলার সরঞ্জাম তিনিই জুগিয়ে দেন, তাদের কলহাস্যমুখর বাক্‌স্ফূর্ত্তির উদ্যোক্তা তিনিই। মায়ের কাছেই শিশুর জীবন-বেদে প্রথম দীক্ষা ও শিক্ষা। সন্তানের যাতে ঠিকমত আহারাদি হয়, যথানিয়মে তাদের স্নানাদি সম্পন্ন হয়ে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, মাতার সেজন্য অবিরত পরিশ্রম ও সতর্ক প্রচেষ্টা। উন্মুক্ত পরিবেশে যাতে তাদের স্বাস্থ্য স্ফূর্ত্তি হয়, আবার অসুস্থ হলেই তাদের উপযুক্ত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয় এসব দিকে মায়ের সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। গার্হস্থ্য জীবনের এই যে ছবি, স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে কত কল্যাণময়, কত সুন্দর ও মনোহর। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ এমন কয়টি গৃহ আছে যেখানে এইরকম আদর্শ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কল্যাণে শিশু-জীবনের ক্রমবিকাশ সর্ব্বাঙ্গীন রূপে মঙ্গলময় হয়ে

(১৫) রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি—৩১ ও ৮২ পৃষ্ঠা।

(১৬) রবীন্দ্রনাথ—আশ্রমের শিক্ষা।

উঠবে? কোথায় সেই গৃহ যেখানে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও গুণাবলী সহজে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিপুষ্ট হতে পারে? সমাজ ব্যবস্থার এই দুর্গতির রীতিমত প্রতিকার সাধন আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

সমাজহিতৈষী মনীষী ও শিক্ষাবিদগণ আজকাল কেবল শিশুদের জন্যই কল্যাণপ্রদ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হননি; তাঁরা এখন মাতাপিতা ও অভিভাবকবর্গের উপযুক্ত শিক্ষার উপরেও বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। কথাটি আমাদের দেশে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কেননা আমরা আজও চিরাভ্যস্ত অজ্ঞতা ও চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত হতে পারিনি। মা ও শিশু—মা ছাড়া শিশু বাঁচে না, জ্ঞানদাত্রী মাতার যদি শিশু পরিচর্য্যা ও লালনপালন সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান না থাকে, তবে শিশুর জীবন বিকাশের পথ সুগম হয় না। নারী আজ স্বাস্থ্যহীনা, জ্ঞানহীনা, ক্লান্তি ও অবসাদ-পরায়ণা—আজ নারীর কাছে শিশুশিক্ষার উন্নতি বিধান আশা করা উচিত কিনা তাই বিবেচ্য! যেদিন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার গুণে কন্যা ও জননীগণ এমন ভাবে গড়ে উঠবেন যাতে নারী হবেন সূক্ষ্মতর অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারিণী এবং সহজ ও স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্না গৃহকর্ত্রী, সেদিনই শুধু দেশের উন্নতি আশা করা যেতে পারে। পারিবারিক জীবনে যদি আনন্দের উৎস না থাকে, শিশুজীবনে আনন্দময় পরিবেশ ও স্নিগ্ধ পরিস্থিতি গড়ে উঠবে কি করে? যেখানে আনন্দ নেই সেখানে শক্তির বিকাশ নেই। শিশুশিক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজনেই আজ গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশ সুসঙ্গত ও সুখপ্রদ করতে হবে।

শিশুজীবনের প্রথম পাঁচবৎসর চরম গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে মাতা-পিতা ও অভিভাবকবর্গ এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সকলে মিলে শিশুর জীবনের যে বুনিয়াদ রচনা করেন, তারই উপরে শিশুর সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেই সময়ে তার তরুণ মনে ভাবের খেলা এমনভাবে চলতে থাকে যে সে বিশেষ কোন রকমের হাবভাব দৃঢ়রূপে আয়ত্ত করতে না পেরে সামনে যা পায়, যা দেখে তারই প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং, সেই সময়েই শিশুর কল্যাণের জন্য এমন পরিবেশ রচনা করা উচিত যাতে তার জীবনের মূলভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পুরাকালে আমাদের দেশে পিতা-মাতা এবং পরিজনবর্গ এই সত্যটি বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শিশু-

সন্তানের সহজ ও ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার মধ্যেই তার শিক্ষার অকৃত্রিম বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। অপর কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শৈশবে এইরূপ গৃহলব্ধ শিক্ষার মত গঠনমূলক হয় না, সেকথা প্রাচীনকাল থেকেই বিদিত। এইজন্যই আমরা পেয়েছিলাম আমাদের পুরাকালের জ্ঞানী ও সত্যসন্ধানী ঋষিগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ — "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।"

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি"—এই সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল উপদেশটির মধ্যে কত সুগভীর চিন্তা ও ধারণাশক্তির অভিব্যক্তি রয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে সে যুগের সমাজ-জীবনের ধারাও আমাদের মনে রাখতে হবে; ভুললে চলবে না যে, তখন জীবন ধর্ম্মের সহজ বিকাশ হতো প্রতি গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য দিয়ে, এবং তাতে ফল হতো এই যে, শিশুমন অতি সহজেই তার বংশানুগত শিক্ষা, দীক্ষা, 'কৃষ্টি ও সম্ভ্রমনিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যুগসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার হতে অবলীলাক্রমে পুষ্টিলাভ করতো। তখনকার দিনের জীবনযাপনের সরল ও সুন্দর পদ্ধতি, অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠা শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করতো। প্রকৃতিমাতার কোলে, ঋতু পরিবর্ত্তনের আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকে শিশুমন আপনা হতেই ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় হয়ে উঠতো। নানাবিধ পালপর্ব্বণ, মেলা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সামাজিক মিলনোৎসবের নানাবিধ আয়োজনের মধ্য দিয়েই সেকালের শিশু নিঃসংকোচে, স্বচ্ছন্দমনে বৃদ্ধিলাভ করতো। এই সকল উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, নাচগান ও খেলাধূলার যে ব্যবস্থা হতো তাতে শিশুমন নির্দ্দোষ আনন্দে ভরে উঠতো, এবং এই আনন্দপ্রবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকায় নৈতিক শিক্ষার আদর্শেও শিশুরা অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পেতো। সেদিন মানব ও মানবতার স্থান ছিল অতি উচ্চে এবং জনসাধারণ শ্রদ্ধাসহকারে শিশুকে গ্রহণ করে তার শিক্ষালাভের জন্য সুযোগ্য পরিবেশ রচনা করতো। গৃহের ও সমাজের মনোরম পরিবেশে শিশুরা যে শিক্ষা সহজেই লাভ করতো, তা আজকালকার শিক্ষা অপেক্ষা যে সুফলপ্রসূ কম হতো, সেকথা বলা চলে না। আজ শিশুশিক্ষার জন্য যে সব নিয়মবিধি, গৃহরচনা কৌশল এবং সাজসজ্জা অপরিহার্য্য মনে করি, তার চেয়ে প্রকৃতি মায়ের কোলে সেদিনের শিশুরা যে জ্ঞান আহরণ করতো, তা হ'তো বাস্তবিকই মৌলিক, সত্যনিষ্ঠ এবং গভীর তাৎপর্য্যসম্পন্ন।

আমরা যে আজ পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষার আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়েছি, তা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, কিন্তু একথাও ঠিক যে আধুনিক জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে এত বেশী কুটিল ও জটিল যে মনোমতভাবে শিশুপালনের উপায় ও অবকাশ গৃহস্থ-সংসারীর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ, আজ ভারতবর্ষের সামাজিক ও সংসারিক অবস্থা এমন যে নারী আর শুধু অন্তঃপুরচারিণী নন, —আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সংসারক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তিনি ব্যস্ত। নারী যদি তাঁর প্রকৃতি অব্যাহত রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন, এবং দেশের ও দশের জীবনপদ্ধতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে ব্রতী হতে পারেন—তবে তার চেয়ে মঙ্গলের কথা আর কি আছে? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তেত্রিশ বছর আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্রত গ্রহণেচ্ছু জনৈকা মহিলাকে লিখেছিলেন, "স্বদেশের কল্যাণব্রতে মেয়েদের অধিকার আছে; আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সেই অধিকার প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিল, ইহাতে কেবল যে আমাদের মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতেছে তাহা নহে, দেশের সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠান অনেকটা পরিমাণে নির্জ্জীব ও অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছে।" (১৭) কিন্তু ঘরকরণার ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, সাংসারিক অসামঞ্জস্যের দোহাই দিয়ে যদি শিশু-সন্তানের লালনপালনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে নারী আজ একান্তে সমাজোন্নতির ব্রতে অথবা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করতে চান—সেটা শুধু দুঃখের কথাই নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষেই ঘোর অমঙ্গলের আভাস। সুখের বিষয় এই যে, এই অকল্যাণের সুস্পষ্ট সূচনা লক্ষ্য করেই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই একমত হয়েছেন যে, শিশুশিক্ষার গুরু-দায়িত্ব পালনে বাধা আমাদের যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে তার সম্যক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য।

খুব ছোট শিশুরাও তাদের নিজেদের গৃহ হতে অন্যত্র, শিক্ষাসম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে খেলাধূলা করতে যাবে এমনতর রীতি নিতান্তই নূতন নয়। বিখ্যাত "রিপাব্লিক" (The Republic) গ্রন্থে, প্লেটো (Plato) এই মতবাদের প্রচার করেন এবং প্রাচীন গ্রীসদেশে ছেলেদের খেলাধূলার জন্য উন্মুক্ত স্থান পৃথকভাবে

(১৭) শিক্ষাব্রতী—রবীন্দ্র সংখ্যা—১০৬ পৃষ্ঠা, শ্রীযুক্তা সুনীলিমা দেবীর সৌজন্যে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে।

রক্ষা করা প্লেটোর মতেরই পরিপোষক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে যদিও খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকসভ্যতায় শিশুগণের শিক্ষাদানবিধির সূচনা পাওয়া যায়, তবুও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে, প্রত্যেকের নিজস্ব সামাজিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ অনুসারেই প্রচলিত হয়েছে। এই সূত্রে যথাক্রমে পর্য্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, নিম্নলিখিত দেশগুলিতে এই শিক্ষা-প্রচলনের ধারা ও আদর্শ অবিকল অনুরূপ হয়নি।

রাশিয়া—এই দেশে বিদ্রোহাত্মক সমাজ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মস্কো সহরে মিসেস শ্লেগার ও আলেকজাণ্ডার জোলেস্কো কর্ত্তৃক প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শ্রীমতী ভেরা ফ্রেডিয়েস্কির মতে, ১৯৩৭ সালে ইউ. এস. এস. আর. (U.S.S.R) কর্ত্তৃক যে সকল শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল :—

(১) কাজের কিম্বা পড়ার সময়ে মেয়েদের শিশুপালনের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে, তাঁদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগসাধনের সুবিধা দেওয়া।

(২) নবপরিকল্পিত সমাজশিক্ষায় শিশুদের প্রথম হতেই শিক্ষা দেওয়া। (১৮)

ইংলণ্ড—বুয়র-যুদ্ধের সময় (১৮৯৯—১৯০২) সৈনিকদের শোচনীয় স্বাস্থ্য দেখেই এদেশে শিশুসন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ সচেতনতার সৃষ্টি হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, লণ্ডনের ডেপ্‌টফোর্ড অঞ্চলে ম্যাকমিলান ভগ্নীদ্বয় এদেশে প্রথম আধুনিক প্রথায় প্রাক্-প্রাথমিক শিশু-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে ৭ বৎসরের মধ্যেই এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি দেশের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং সমগ্র জগতে অনতিবিলম্বেই প্রচারিত হয় যে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতা এবং তাদের অবহেলিত শিশুসন্তানগণের পক্ষে এই শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অভাবনীয় সৌভাগ্যের সৃষ্টি করে সমগ্র দেশ ও জাতিকে কল্যাণমণ্ডিত করেছে। (১৯)

(১৮) Adolph E. Meyer—The Development of Education in the Twentieth Century National System ; pp. 282—898.

(১৯) Report on Infant and Nursery Schools, 1988—H. M. S. O. London.

যুক্তরাষ্ট্র—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর হতে এই দেশে অসংখ্য নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের নানাবিধ উদ্দেশ্য ছিল। কেবল নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নস্তরের জনসমাজেই এগুলির প্রসার আবদ্ধ রাখা হয়নি। এই শিক্ষাকেন্দ্র-গুলির নানারূপ নাম দেওয়া হয়েছে যথা:—play centres (ক্রীড়াকেন্দ্র), play-groups (ক্রীড়াসঙ্ঘ), Day-Nurseries (দৈনিক শিশুপালন কেন্দ্র), Child-development groups (শিশু-বিকাশ সঙ্ঘ), Child-care centres (শিশুপরিচর্য্যা-কেন্দ্র) ইত্যাদি। সমাজের সর্ব্বস্তর হতেই এই সব শিক্ষায়তনগুলিতে শিশুর সমাগম হয়। দুঃস্থ পিতামাতার শিশুসন্ততি, চাকুরিজীবি জননীর অপত্যবর্গ, পুনর্বসতি কেন্দ্রের শিশুবৃন্দ, লোকসমৃদ্ধ সহর ও সহরতলী থেকেও শিশুরা এবং ধনীর দুলালও এই সব নার্সারী স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য অবাধে যোগদান করে। (২০)

চীনদেশ—নানাপ্রকার দুর্বিপাক ও দুরবস্থা সত্ত্বেও চীনদেশে শিশুসন্তান এবং তাদের জননীগণের যুগপৎ শিক্ষার জন্য নানারূপ সুব্যবস্থা আছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কিয়াংসু সহরে অনুষ্ঠিত শিক্ষাসম্পর্কীয় কর্তৃপক্ষের সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত যত বেশী সম্ভব 'কিণ্ডারগার্টেন' ও 'নার্সারি' স্কুলের শিক্ষিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (২১)

ভারতবর্ষ—আমাদের দেশও আজ এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। একটি ভারতীয় শিশুশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিশুদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও আনুভূতিক বিকাশগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুশীলনের আয়োজন এবং তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক শিক্ষাবিধির প্রয়োগ ও প্রসার সফলতর করার জন্য

(২০) A Cultural History of Education ; Butts—p. 628. "By the Middle of the Century it had become clear that public responsibility for education was being extended to include Nursery Schools for two and three year old children and Kindergartens for four and five year olds. The Nursery School movement was rather slow in developing until the depression years of the 1930's, when federally supported nursery schools were inaugurated by the WPA of the New Deal. By 1939, some 3,00,000 children had been enrolled in 1500 emergency nursery schools, most of which were housed in public school buildings".

(২১) China Today—Sundarlal.

তাদের পিতামাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন। (২২)

আজ দেশের পরিস্থিতিতে অসংখ্য শিশু-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা নিতান্তই প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু এই সকল শিশুপরিচর্য্যা ও শিক্ষায়তন খোলার উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত নয় যে কেবল চাকুরীজীবি জননীদের এই সুযোগে অনেকটা দায়িত্বভার লাঘব হবে। অনেক জননী শিশুর 'দুরন্তপনা' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কেউ বা আবার মধ্যাহ্ন-নিদ্রা অবাধে উপভোগ করবার জন্য শিশুসন্তানকে নার্সারি স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। এই কেন্দ্রগুলিকে গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাগার করে তুললে চলবে না। এগুলি গড়ে উঠবে শিশু-সন্তানকেই কেন্দ্র করে—তাদের শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, কর্ম্মীসংঘ এবং কার্য্যক্রমবিধির সুচিন্তিত সমাবেশ যাতে হয়, তাই আমাদের সর্ব্বৈব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে। মনে রাখতে হবে যে শিশুদের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই নার্সারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা, কেবলমাত্র পিতামাতার সুখ সুবিধার জন্য নয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেন যে, ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে শিশুমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন আছে। কেননা, যে গৃহে শিশুর মঙ্গলবিধান বয়স্কদের সুবিধা ও খেয়ালের খাতিরে উপেক্ষিত হয়, সেখানে সন্তান সহজ সুখাবেশ হতে বঞ্চিত হওয়ায় তার সম্যক পুষ্টি ও বিকাশগতি ব্যাহত হয়। প্রায়ই এমন হতে দেখা গেছে যে, ঐসব গৃহের সন্তানগুলির মধ্যে আজীবন বঞ্চনাক্লিষ্ট আত্মস্ফূর্ত্তির অভাব থেকে যায়। আবার যে গৃহে আদুরে ছেলের খেয়াল খুশিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়ায়, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই সব শিশুর মঙ্গল সম্ভব হয়না, কেননা সমবয়স্ক বা সমকক্ষ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সহজভাবে চলাফেরা করতে তাদের কষ্ট হয়। শিশু-জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি আজ আমাদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত নয়, অথচ সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব অনেকক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির সুস্থ শ্রীবৃদ্ধি

(২২) The Indian Council of Child Education—inaugurated in Dec., 1944; Office - 89, Edward Elliots Road, Mylapore, Madras, S. India.

নির্ভর করছে। আজ শিশু সন্তানের যথাযথ লালন-পালনের দায়িত্ব অক্ষম ও অসমর্থ গৃহস্থ একাকী বহন করতে পারছেন না ; সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা করা আধুনিক সামাজিক ও গার্হস্থ্যজীবনের পরিস্থিতির দরুণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেইজন্য মনে হয় প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির বহুলভাবে প্রতিষ্ঠা হলে এই সমস্যাগুলির আংশিকভাবে সমাধান হবে। তবে এ সকল ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত যাতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির আয়োজন ও শিক্ষাপ্রণালী শিশুর গৃহলব্ধ সুশিক্ষার পরিপোষক হতে পারে। গার্হস্থ্যাশ্রমের পরিবর্ত্তে এই ধরণের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা কদাচ উচিত নয়।

কিছুকাল ধরে বাংলা দেশের সহর ও শিল্পাঞ্চলে এইরূপ শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। নানাদিকে ছোট ছোট শিশু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব আছে দেখে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক কলিকাতার আলিপুর অঞ্চলস্থ "হেষ্টিংস হাউস"এ একটি প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক্-প্রাথমিক কিম্বা নার্সারী স্কুল কি ভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্বন্ধে শিক্ষিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন যে শিশু-শিক্ষায়তনটি আছে সেখানে দুই থেকে পাঁচ বছরের ৬০ জন শিশুর পক্ষে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। যে শিশুরা এখানে আসে তাদের মধ্যে অনেকেরই গৃহের ত্রিসীমানাতেও খেলাধূলা করবার মত স্থান একটুও নেই,—সঙ্কীর্ণ ইটবাঁধানো গলি, অথবা একান্ত অপরিসর 'বারান্দা' আশ্রয় করেই এরা খেলাধূলা করে, এবং অনেকেই শিশুজীবনের সহজ ও সুখময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। জন্মদিনের বাৎসরিক আনন্দায়োজনের বালাই এদের নেই, নূতন খেলনা পাওয়াও এদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে ওঠে না, জামাকাপড় জুতো এ-সব নিত্য নূতন কিনে এদের কেউ দেন না—দিতেও হয়ত পারেন না। এরা যখন প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রে আসে, অধিকাংশ ছেলেরই দেখা যায় শারীরিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শৈশব থেকেই স্বাস্থ্য হয়ে পড়েছে ক্ষীণ ও বিকল এবং প্রায়শই নানাবিধ অসুখবিসুখ নিয়েই তারা উপস্থিত হয়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, কোন কোন শিশুর জননী সন্তানের খাদ্য ও পুষ্টিবিধানের ব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ, অমনোযোগী,—এমন কি উদাসীনও।

তবুও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অধিকাংশ পিতামাতাই সন্তানদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং যথাসম্ভব ভাল ভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখতে সর্ব্বতোভাবেই সচেষ্ট। কিন্তু উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, ঘোর সাংসারিক অসচ্ছলতা, আর্থিক অবস্থার অনিশ্চয়তা ও সঙ্কুচিত জীবনযাত্রার ফলে জীবনে একান্ত ভাবেই সামাজিক সম্প্রীতির বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার দরুণ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, পিতামাতা সন্তানদের সামান্যতম প্রয়োজন মেটাতেও অসমর্থ।

"হেষ্টিংস হাউস্" এর এই শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুজীবনের এই সকল সমস্যা সমাধানের যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। যাতে শিক্ষানুকূল পরিবেশের সঙ্গে তাদের ক্রমশঃ সহজ পরিচয় হয় এমন আয়োজন ও ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। সকাল ১০টার শিক্ষায়তনের দৈনিক কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু ৯টা থেকেই ছেলেমেয়েরা সকলে আসতে সুরু করে। শিশুদের এই আগ্রহ ও উৎসাহে বাধা দেওয়া হয় না, কেননা প্রাকৃতিক শ্যামসমারোহের মধ্যে তাদের অবাধ খেলাধূলার সুযোগ যতই দেওয়া যায়, ততই মঙ্গলজনক। শিক্ষায়তনটির কার্য্যকারিতার পরিচয় দিতে গেলে, এখানে দৈনিক কার্য্যক্রমের কিছু মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

বেলা ঃ ১০-১১—ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে, অবাধে খেলাধূলা করে এবং ঘণ্টার শেষে খেলার সমস্ত জিনিষপত্র আবার গুছিয়ে তুলে রেখে দেয়। এরই মধ্যে, এক সঙ্গে ৫ জন করে দল বেঁধে, পরিচর্য্যাকারিণী-ধাত্রীর (Nurse) কাছে যায়।

বেলা ঃ ১১-১১।৩০—সকলে সমবেত হয়ে একটি গান করে। সহজ ও সরল যে কোন ধর্ম্মোপদেশাত্মক একটি গান গাওয়া হয়। তারপর, স্কুলের রোজ-নামচায় প্রত্যেকের নাম ডেকে হাজিরার বিবরণ লেখা হয়। বাদবাকি সময়ে 'ভিটামিন্ ট্যাব্লেট' বিতরণ, জলপান এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন হয়।

দল বেঁধে কাজকর্ম্মের পদ্ধতি

১১।৩০—১২।১৫ ঃ—২ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুর দল—দিন ভাল থাকলে, খোলা জায়গায় খেলনা, বল, দড়ি, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি দৌড়ঝাঁপের

খেলার সরঞ্জাম নিয়ে নানারকম খেলা, আমোদ ইত্যাদির পর গান, বাজনা, ছড়া বলা এবং গল্প শোনা।

৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুর দল—ছন্দ জ্ঞানের জন্য নাচগানের আসর, গল্প শোনা ও গল্প বলা, ছবি আঁকা, মাটির জিনিষ তৈরী করা এবং ঐ ধরণের নৈপুণ্যবিকাশাত্মক অপরাপর কার্য্যাবলী।

৪ থেকে ৫ বছরের শিশুর দল—লেখাপড়া ও গণনা শিক্ষার জন্য নানারকম সৃজনাত্মক কাজ; খেলার মধ্য দিয়েই বর্ণাক্ষর পরিচয় ও গণনা শিক্ষা; ছবি আঁকার ছলে লিখতে শেখা। গল্প বলা ও শোনা ও তদ্বারা ভাষা শিক্ষা।

১২।১৫—১২।৩০ ঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন; এই সময়ে ছেলেমেয়েরা সকলে হাতমুখ ধুয়ে নেয় ও শৌচাগারে যায়।

১২।৩০—১ ঃ মধ্যাহ্ন ভোজন।

১—২।৩০ ঃ ২ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুরা সকলে ঘুমায়। এই সময়ে পালা করে একজন শিক্ষিকা শিশুদের কাছে থাকেন। অন্য শিক্ষিকাগণ আধ-ঘণ্টা করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

২—২।৩০ ঃ বড় ছেলেমেয়েরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘর, দ্বার পরিষ্কার করে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মাটির জিনিষ রঙ করে; খুব সোজা বোনার কাজ, ছবি-আঁকা, নাট্যচর্চ্চা ও নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে সুকুমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ও সক্রিয় স্ফূর্ত্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়।

২।৩০—৩ ঃ বাড়ী যাওয়ার পালা।

শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্যক্রমের সময়-তালিকা সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কথাটি এই যে, সময়ের নিয়ম সম্বন্ধে কড়াকড়ি বাধন থাকা উচিত নয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কেও অবস্থানুযায়ী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার সুযোগ-সুবিধা শিক্ষিকাদিগকে গ্রহণ করতেই হবে। কার্য্যক্রমের সময়-তালিকাটি করা হয়েছে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার সুবিধার জন্যই, কিন্তু এই সময়-তালিকাটির কার্য্যক্রমের অমোঘ শাসনের জন্যই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—এমনতর ধারণা ভুল। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, যেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছে সেদিন দল-বেঁধে কাজ করার সময়টি একটু কমিয়ে বিরাম-বিশ্রামের অবকাশ ছেলেমেয়েদের বেশী

দিতে হবে; কার্য্যগতিকে আবার, কোন কোনও দিন অপরাপর কার্য্যক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থার চেয়েও খেলাধূলার মাধ্যমে সৃজনাত্মক কাজের উপরই ঝোঁকটা বেশী দিতে হয়। শিক্ষাগ্রহণের যে দায়িত্ব শিশুর উপর দেওয়া হয়েছে সেটা যাতে সাধ্যমত সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে ওরা গ্রহণ ও পালন করতে শেখে, এই-ই হল শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য—একথাটি সদাসর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত "প্রজেক্ট্ মেথড্" (Project Method) বা সমস্যামূলক পরিকল্পনানুযায়ী সুকুমারমতি শিশুগণের শিক্ষাবিধান সহজ নয়। ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের পক্ষে ঐ প্রণালীটি বিশেষ অপ্রযোজ্য বলেই বোধ হয়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র সু-অভ্যাস গঠনের দ্বারা কিংবা গানবাজনা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুসকলের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। 'কিণ্ডারগার্টেন' স্কুলের এই-ই ছিল প্রধান অসুবিধা। সেখানে শিশুকে অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়া হতো ঠিকই, কিন্তু তার খেয়ালখুশি, তার মনোগত অভিপ্রায়, তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহকে ঘিরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ বিকাশের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই করা হতো না—অথচ, শিশুগণের জ্ঞান সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও স্ফূর্ত্তি বর্জ্জন করার বিধি সমীচীনও নয়, সম্ভবও নয়। এই কারণে শিশুচিত্তে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় শিক্ষাবিদগণ তা লক্ষ্য করে শশব্যস্ত ও শঙ্কিত হলেন এবং কিভাবে শিশুকে তার জীবনের সহজ অভিজ্ঞতার সূত্রেই শিক্ষাদান করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হলেন। ফলে, Activity Method—অর্থাৎ, কর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান, এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে কোন কোন শিক্ষায়তনে সুরু করা হলো। স্ফূর্ত্তিদায়ক পরিবেশে শিশুমন সহজেই স্বকৃত কার্য্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টিলাভ করে এবং এইজন্যই শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবস্থা করা গেছে যাতে প্রত্যহ, অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময়ের জন্যও, নানাবিধ খেলনার সরঞ্জাম নিয়ে অবাধে স্বেচ্ছামত শিশুরা ব্যাপৃত থাকতে পারে। এই সময়ে তারা প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনমত খেলার আয়োজন করে; এবং খেলতে খেলতে যখন কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় তখন শিশুরাই সকলে মিলে তার সমাধানের চেষ্টা করে। শিক্ষিকাও এই বিষয়ে ওদের সাহায্যে তৎপর থাকেন। এই ভাবে, আত্মভোলা খেয়ালখুশিমত খেলাধূলার গুণে শিশুশিক্ষা

রীতিমত কল্যাণপ্রদ হয় এবং এইভাবে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের সুমঙ্গল সূচনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এই শিক্ষায়তনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে শিশুরা সহজ আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীন আত্ম-অভিব্যক্তির অনুপ্রেরণায় প্রাণবন্ত হতে পারে। প্রত্যহ সকালে, ৯-৩০ এর মধ্যে, তাদের জন্য নানারকম খেলার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়—যেমন, ঠেলে-নেওয়া কি টেনে-তোলার উদ্যম যাতে লাগে সেই রকম সব খেলনা, চাকা-দেওয়া কাঠের বাক্স, বল (ball), বাইসিকেল, "স্কুটার" (scooter), বালতি, মাটি, বালি, ইঁট, নানাধরণের কাঠের টুক্রো, দড়ি, হাতুড়ি, পেরেক, পুতুল, পুতুলের জামাকাপড় (যা খুলে আবার পরানো যায়), বিছানা, তোষক, বালিশ ইত্যাদি; রান্নার বাসনপত্র, ঝাঁটা, চায়ের সরঞ্জাম, বাগানের সাধারণ যন্ত্রপাতি, খড়ি, রং, কাগজ, রঙ্গিন কাগজ, গুণসুঁচ, সূতা ইত্যাদি; নানা আকারের বুরুশ, ঝাড়ন, কাঁচি; অভিনয়ের জন্য সাজবার কাপড়, গহনা ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য খুব বেশী দামের খেলনা বা খেলার সরঞ্জাম কোন কিছু দেওয়া হয় না; তবে নানারকম প্রয়োজনোপযোগী সুলভ, সাধারণ জিনিষই জুগিয়ে দেওয়া হয়। যাতে সৃজনাত্মক কার্য্যাদি দ্বারা শিশুগণের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যথাযথরূপে সমসাময়িকভাবে বিকশিত হতে পারে, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রচলিত কার্য্য-ক্রমের তাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ, শিশুদের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলি পৃথকভাবে, এক একটি করে বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক।

ছেলেমেয়েরা ভর্ত্তি হলেই তাদের বলা হয়, "এই খেলনা নিয়ে যেমন খুশি খেলা কর।" কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, এইরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত বলে শিশুগণ রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রায় সকলেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, খেলনাগুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতেও ভয় পায়। অনেকে আবার অবাধ স্বাধীনতার মর্য্যাদা সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ বলেই চুরি করতে সুরু করে। পুঁতি, পেন্সিল, কাঁচি, প্রভৃতি প্রায়ই মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হয়েছে দেখা যায়। ক্রমশঃ কিন্তু ওদের এই অভ্যাস চলে যায় এবং স্বাধীন ও অবাধ খেলাধূলায় তারা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হয়। কয়েকজনের চুরির বদ্ অভ্যাস সহজে যায় না। তাদের প্রত্যেককে সস্নেহে শাসন করা হয় এবং কি কারণে চুরি করে, তারও খোঁজ নেওয়া হয়। যেমন, ৪ বছরের উমাকে প্রায়ই দেখা

যেত স্কুল থেকে চক্, খড়ি, অন্যের চুলের ক্লিপ বা ছবি উঠিয়ে নিতে। এতে সমস্যা দেখা দিল, বিশেষ করে এইজন্য যে, উমাদের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল, মা-বোনেরাও সুশিক্ষিতা, তবুও কেন এই বদ্ অভ্যাস? খোঁজ করে জানা গেল যে, রমা ও উমা—জ্যেঠ্‌তুতো-খুড়তুতো বোন—দুজনেই আমাদের স্কুলে আসে। রমার পিতা সঙ্গতিপন্ন ডাক্তার; উমার পিতা সামান্য শিক্ষক। একান্নবর্ত্তী পরিবারে একসঙ্গে তারা বড় হচ্ছে কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে। রমা নানারকম সৌখীন জিনিষ পায় এবং যথেচ্ছভাবে নষ্টও করে; উমা সেরকম ভাবে কিছুই পায় না, ফলে—চুরি করে অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করে। উমার মাকে ডেকে পাঠান হলো এবং নিভৃতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এই রকমে জিনিষ নেওয়ার ফলে কি দুঃখের পরিণাম ঘটতে পারে। কিন্তু উপায় কি? উমার মা তো একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙ্গে পৃথক করে নিজের সংসার পাততে পারেন না! আর, উমাকে চুলের 'ক্লিপ্' বা রঙীন ফিতেও তো প্রত্যহ কিনে দেওয়া সম্ভব নয়! তখন উমার মাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, রঙীন ফিতে বা চুলের ক্লিপের চেয়েও চিত্তাকর্ষক জিনিষ তিনি বাড়ীতে বসেই তৈরী করে উমার তৃপ্তিসাধন করতে পারেন। প্রথমতঃ, উমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আদর যত্ন তাঁকে করতে হবে; তাকে কাছে নিয়ে পুরানো কাপড়চোপড় দিয়ে পুতুল, পুতুলের কাঁথা, তোষক, বালিশ তৈরী করে পুতুলখেলার যাবতীয় উপকরণ জোগাড় করে দিতে হবে। উমার মা বল্লেন, "দিদি, ঘর-করণা করব, না মেয়ের জন্যে পুতুল সেলাই করব?" উত্তরে তাঁকে বলা হলো, "বেশ তো, উমাকে রান্নাঘরেই না হয় খেলার সরঞ্জাম জুগিয়ে দিন; আপনার সঙ্গে বসে ছোট বঁটিতে তরিতরকারি কাটুক, রুটি বেলুক, কড়াইয়ে তেল দিক, সে-ও তো বেশ মজার খেলা। তারপর, বেড়াতে যাওয়ার সময়, কি স্কুলে আসার সময়, বেশ করে চুল আঁচড়ে, টিপ পরিয়ে, যত্ন করে পাঠিয়ে দেবেন।" এর পর থেকেই দেখা গেল, উমার চেহারায় বেশ যত্নের আভাস এবং স্কুলেও তাকে বেশ করে নজর দেওয়ার ফলে ওর বদ্ অভ্যাসও ছেড়ে গেল। আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি এই যে, সহজ উপায়ে, স্বচ্ছন্দ পরিবেশে, শিশুদের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে, স্নেহের দ্বারা শিশুচিত্তকে জয় করে শিশুর সু-অভ্যাস, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, গড়ে তোলা যায়।

আর একদিন, সাড়ে-তিন বছরের মিণ্টু বাবুর দেখা গেল, বাড়ী যাওয়ার সময় ভুঁড়িটি অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত। "ভুঁড়িতে কি ভরেছিস্ রে, মিণ্টু ?"—জিজ্ঞাসা করায়, সে বললো—"বল্"। এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলটি বের করে সে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিল। এই ছেলেটি নিতান্ত গরীব ও অশিক্ষিত ঘরের সন্তান। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওর বুদ্ধিমত্তা সাধারণ স্তরের চেয়ে অনেক উচ্চতর। মিণ্টুও আজ তুই বৎসর আমাদের কাছে আছে। সস্নেহ লালন-পালনের গুণে তার শরীর ও মনে নানাভাবে উৎফুল্ল বিকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

দেখা গেছে, খেলাধুলার অবাধ স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হওয়া ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রথমে খুব সহজ হয় না। অনেকের আড়ষ্ট ভাব কাটে না, ভয়ও থাকে সর্ব্বদা,—"কি জানি, কি করতে কি করে বসবো, তখন কী হবে ?" তারপর আবার যখন তারা সহজ ভাবে খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়ে, তখন অনর্থক জিনিষপত্র তছ্‌নছ্ করা, ইচ্ছা করে জিনিষ নষ্ট করার প্রবৃত্তিও ধরা পড়ে। অনিল নামে একটি ছেলে, সাড়ে-তিন বছর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হয়। সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে সে, কিন্তু সারাদিন অশিক্ষিত ভৃত্যবর্গের সঙ্গেই দিন কাটে তার। স্কুলে এসেই সে এমন দৌরাত্ম্যপণা সুরু করে দিল যে তাকে সামলানো দায়। ওকে তখন দেওয়া হলো—"ভাঙ্গাচুরোর খেলা"। কাঠের বাক্‌স কেটে কাঠের টুক্‌রো জোগাড় করা, বাসি পাঁউরুটি কেটে গুঁড়ো করে বাগানের পাখীগুলোকে খেতে দেওয়া, বাগান কোপানো, হাতুড়ি পিটিয়ে বেঁকা-পেরেক সোজা করে কাঠে সেই পেরেক মারা, ফুটবল খেলা, গাড়ী টানা, বাগানের শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে ময়লা-ফেলা ঠেলা গাড়ী (wheel-barrow) করে সেগুলো এক জায়গায় জমা করা, ইত্যাদি নানাবিধ হলো তার কাজ। ক্রমশঃ দেখি সে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলার সুযোগে কাঠকুটো দিয়ে বেশ বড় একটি পুতুলের বাড়ী তৈরী করেছে। বাগানের কাজেও তার খুব উৎসাহ, চমৎকার একটি ফুলের কেয়ারি বেশ তৎপরতা এবং নিপুণতার সঙ্গেই তৈরী করেছিল। অনিল সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা প্রথমে বলতো যে, ওর মত তুষ্ট ছেলে আর হয় না। এই নিয়ে কৌতুকজনক একটি ঘটনাও একদিন ঘটে, যে দিন সাড়ে-চার বছরের "বাবুয়া" তার মাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—"মা, পাপী কাকে বলে ?" বাবুয়ার মা বল্লেন, "খুব তুষ্টু লোককে পাপী

বলে।" তৎক্ষণাৎ বাবুয়া বলে উঠ্‌লো,—"ওঃ! তাহ'লে আমাদের মধ্যে পাপী হলো ঐ অনিল।" অনিলের বয়স এখন সাড়ে-পাঁচ বৎসর। লেখাপড়ায় যদিও সে এখনও অন্যদের তুলনায় পিছিয়েই আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি গুণতে এবং মৌখিক যোগ-বিয়োগ করতে ওর সমকক্ষ নেই। এখন সারা নার্সারি স্কুলটির মধ্যে অনিল আমাদের বেশ একটি বাধ্য, চট্‌পটে এবং স্নেহপ্রবণ শিশু।

ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দমত খেলনা বেছে নেয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে অনেকেই হয়তো একটা পুতুলও তাড়াতাড়ি সরিয়ে তার ওপরই চেপে বসে পড়ে। উদ্দেশ্য, যদি এক খেলা ভাল না লাগে, তখন পুতুল খেলা চালানো যাবে। এই অভ্যাসটাও ক্রমশঃ কেটে যায়, যখন তারা বুঝতে শেখে যে, যখন যা ইচ্ছা খেলনা নিয়ে খেলার অবাধ অধিকার তাদের আছে, খেলনা লুকানোর প্রয়োজনই কিছু নেই। গড়ে তোলার খেলায় ছেলেরা প্রথম থেকেই আগ্রহশীল। হাতুড়ি-পেটানোর খেলাই বেশীর ভাগ ছেলেকে আকৃষ্ট করে। সের কয়েক পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকির পর যখন ওদের হাতুড়ি-পেটানোর ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, তখন শিক্ষয়িত্রী ধীরে ধীরে ঐ সব সরঞ্জাম দিয়ে কার্য্যোপযুক্ত জিনিষ তৈরীর শিক্ষা দেন। একবার এদিকে মন বসে গেলে ওরা উঠে পড়ে লেগে যায় এবং একান্ত অভিনিবেশ সহকারে কর্ম্মনিরত থাকে। পুতুলের খাট, ছোট ছোট চেয়ার টেবিল, ইত্যাদি তৈরী করে পুতুলের বাড়ী সাজানো হয় এবং বৎসর খানেক আগে যারা হাতুড়ি কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় জানতো না, যারা অবদমিত প্রবৃত্তিমূলে ঈর্ষা, ক্রোধ ও দুঃখের বশবর্ত্তী হয়ে জিনিষপত্র ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলতো—তারাই এখন নিজেদের চেষ্টা ও বুদ্ধিবলে যে সব জিনিষ তৈরী করে সেগুলো সর্ব্বত্রেই প্রশংসার যোগ্য।

আঁকার কাজেও এই রকমই কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়। প্রথমতঃ কত যে রং এলোমেলো ভাবে নষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না; তখন সত্যিকার ছবি কিন্তু একটিও আঁকা হয় না। ক্রমে রঙের বাহারে শিশুচিত্ত সহজেই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অনাবিল আনন্দের অনুভূতি ওদের অভিভূত করে ফেলে, আত্মহারা হয়ে ওরা অনবরত কাগজে রঙের আঁচড় কেটে চলে। তারপর, ধীরে ধীরে শিক্ষিকা তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন ফুলবাগানের রঙের ছটায়, নীল আকাশের নীলিমায় ও চোখ-জুড়োনো শ্যামশোভাময় প্রকৃতির দিকে। ক্রমে

শিশুমনেও শিল্পীসুলভ সৃজনশীলতার গভীর আবেগ উন্মেষিত হয় এবং আত্ম-অভিব্যক্তির এই পথে সানন্দে ওরা অগ্রসর হয়। প্রায়শঃ একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে : আমাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ছবি এঁকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না কেন? তার উত্তর এই যে, তাদের গৃহ-পরিবেশে সুন্দর, রঙীন ছবির একান্তই অভাব; তাছাড়া, হরেকরকম রং নিয়ে মনপ্রাণ ভরে খেলা করার সুযোগই বা তারা পায় কোথায়? লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, শিশু খুব সহজেই রং তুলি নিয়ে বসে যায় এবং কাগজে আঁচড় কাটতেও তার দ্বিধা বা বিলম্ব হয় না। ছবি আঁকা মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। সভ্যতার প্রথমাবস্থায় মানুষ ছবি এঁকেই নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। লেখা ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল (complex process); কিন্তু খুব সহজেই শিশুরা ছবি এঁকে নিজের মনের ইচ্ছা জানাতে পারে। শিক্ষিকাও এই সুযোগে. বাক্যের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে চিত্রের সাহায্যেই আরও সহজ ও চিত্তাকর্ষক ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। সুব্রত—৪ বছরের একটি ছেলে, তার তোৎলামির দোষ আছে। তাই সে অনেক সময়, গল্প বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে চায় না, অথচ ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান। নার্সারিতে বেশীর ভাগ গল্পই ছবির সাহায্যে বলা হয়। অন্য শিশুরা যখন সেই গল্প ভাষায় পুনরাবৃত্তি করতো, সুব্রত ব্ল্যাকবোর্ডে সঙ্গে সঙ্গে ছবি এঁকে গল্পটি বুঝিয়ে দিত। ওর দেখাদেখি, অনেকেই এই নূতন খেলায় সাগ্রহে যোগদান করে এবং নিজেদের শ্লেটে, খাতায়, আমাদের আশাতিরিক্ত সাফল্যের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের নিপুণ বিকাশের পরিচয় দেয়। এইভাবে, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিশুচিত্ত সহজেই আত্ম-অভিব্যক্তির সহজ পথ খুঁজে পায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্থাপিত এই নার্সারি স্কুলটি ৩ বৎসরেরও বেশী কার্য্যরত রয়েছে। খুব ছোট বয়সে যেসব শিশু এখানে এসেছিল, এখন তাদের বয়স ৫ বছর হয়ে গেছে। শীঘ্রই ওরা এই শিশুসদন ছেড়ে অন্য বিদ্যালয়ে যাবে। এদের বিষয় দুটি' কথা বিশেষভাবে মনে হয়। প্রথমতঃ, এত যে যত্ন করে এদের সবাইকে পাঁচ বছরেরটি করলাম, এখন কোন্ গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীর যাঁতাকলে এদের সুকুমার-চিত্তবৃত্তিগুলি পিষ্ট হবে? ঐ ভয়াবহ পরিণাম থেকে এদের রক্ষা করার কি কোন উপায় নেই? দ্বিতীয় কথা যেটি মনে পড়ে, তা এই—

যখন প্রথম এই নার্সারি স্কুলটির কাজ আরম্ভ করি, প্রায়ই মনে হতো "সব আশা প্রচেষ্টা বুঝি পণ্ড হয়ে যায়, কেননা এই সব দুরন্ত ছেলেমেয়েরা সবাই এক একটি মূর্ত্তিমতী .সমস্যা—এদের দিয়ে কোন-কিছু গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব!" এজন্য, মাঝে মাঝে অশান্তিতে আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো, ভাবতাম—"হায়রে, আমাদের শিশুরাজ্যে স্বর্গপ্রতিষ্ঠার আশা ও কল্পনা বুঝি বা আকাশকুসুমই থেকে গেল!" আজ কিন্তু এইসব কথা মনে হলে, নিজেদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাসহারা আকিঞ্চনতার কথা ভেবে লজ্জা হয়। প্রথম প্রথম, বাস্তবিকই যেন গোলকধাঁধায় পড়ে দিশাহারার মত লাগতো, কিন্তু অনতিবিলম্বেই শান্তি, শৃঙ্খলা ও সজীব কর্ম্মতৎপরতার কল্যাণস্পর্শে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। অবশ্য, আমাদের সব সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই করে নিতে হয়েছে। আমাদের বহুমুখী জটিল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই মন খুলে পরস্পরের সঙ্গে অনবরত আলোচনা ও পরামর্শ করেছি, নানারকম পরীক্ষা করেছি—ভুলও করেছি, ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে বহু আলাপ ও আলোচনা করেছি, যাতে সত্যের ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারি। এই ভাবে ধীরে ধীরে আমাদের কর্ম্মধারা নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কয়জনে মিলে এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, তার সাফল্য সূচিত হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে। আজ আমাদের এখানে "অবাধ খেলাধূলায় চিত্তস্ফূর্ত্তি"র সময় যে-দৃশ্য চোখে পড়ে, তা নিতান্তই মনোরম এবং আশাপ্রদ। এতেই আমাদের গৌরব ও সান্ত্বনা।

খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুচিত্তের প্রকৃষ্ট বিকাশ-সম্ভাবনা কিভাবে ও কতদূর হতে পারে তা বিচার করতে গেলে, আমাদের অভিজ্ঞতা আরও সুসম্বদ্ধ-ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত। সেইজন্য শিশুরা সচরাচর যে সকল খেলা ভালবাসে তারই একটা মোটামুটি বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

পেশী-সঞ্চালক খেলা—প্রথম একদল মই-এ চড়েছে, কেউ সিঁড়ি থেকে লাফাচ্ছে, কেউবা "স্লাইড্"-এ (slide) গা ভাসিয়ে দিচ্ছে—সব খেলাতেই একটা শারীরিক সজীবতা, প্রাণচঞ্চল উদ্দমতা লক্ষ্যণীয়। ছোট শিশুদের পক্ষে এই ধরণের খেলাই স্বাভাবিক—কেননা, তখন তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির স্বেচ্ছাধীন

চালনার উপায় আয়ত্ত করার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত এবং তাই তারা নানারকম আনন্দদায়ক কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে নিজেদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখছে নানা উপায়ে। এই সব খেলার জন্য বহুমূল্য সরঞ্জামের কোনও প্রয়োজন নেই। দোলনা, কাঠের তক্তা, বাক্স, পিপে, গাছের গুঁড়ি, গাছপালা—এই সবই ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সব নিয়েই অবাধে খেলাধূলার স্বযোগ দিলে শিশুগণ মনের আনন্দে অফুরন্ত ক্রীড়াসম্ভারের অনবদ্য আয়োজন অনায়াসে নিজেরাই করে নেয়।

পরীক্ষা-মূলক খেলা—অনেক ছেলেমেয়ে হাতের কাছে, আশেপাশে যা পায় তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালবাসে। জল, বালি, কাদা ও মাটি এই সবের সম্পর্কে ওদের আগ্রহ অফুরন্ত। এই সব সরঞ্জাম দিয়ে কি করতে হবে, ছেলেমেয়েদের সে সম্পর্কে উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ছোট বালতি, কোদাল, ছাঁক্‌নি, বিভিন্ন আকারের খালি শিশি-বোতল, রবারের নল, সোলা (cork), ঝিনুক, জলে-ভাসা সেলুলয়েডের (celluloid) হাঁস, ব্যাঙ এই সব, কখনও বা একটুক্‌রো কাগজ বা সাবান, পুতুলের কাপড়, কখনও বা ছোট এক বাটি তেল—এই সব জুগিয়ে দিলেই তারা রীতিমত অনুশীলন স্বরু করে দেয় ঐসব প্রাকৃতিক উপকরণগুলির স্বরূপ ও ব্যবহার জানবার জন্য, এবং এই ভাবে সচেষ্ট অনুশীলনের মধ্যেই ওরা অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বাস্তব জ্ঞানশিক্ষার প্রভাব ওদের মনে সঞ্চারিত হয়।

সৃজন-মূলক খেলা—তৃতীয় স্তরের খেলাকে বলা যেতে পারে, "সৃজন-মূলক"। এই ধরণের খেলার জন্যে শিশুরা চায় এমন সব উপকরণ যা দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা নানাবিধ বাস্তব দ্রব্য প্রস্তুত করে। যেমন, "রেলগাড়ী", "বাড়ি বাড়ি", "ট্রাম গাড়ী" এমন কি "চাষবাস"-এর খেলাও খুব সাধারণ তৈজস-পত্র দিয়েই ওদের অপার আনন্দদান করে।

আর একটি শ্রেণী দেখা যায়, যারা হিজিবিজি আঁকতে, আঠা দিয়ে কাগজ সাঁটতে, পছন্দমত ছবি বা কাগজ কেটেকুটে ব্যবহার করতে খুবই ভালবাসে। দেখা গেছে যে, ধৈর্য্যসহকারে যদি ওদের এই কাজে অবাধে স্বযোগ দেওয়া যায় তা হ'লে ওদের জিনিষপত্র তছ্‌নছ্‌ বা অন্যভাবে নষ্ট করার প্রবৃত্তি ক্রমশঃই কমে আসে। এই খেলার সরঞ্জাম জোগানো খুব শক্ত নয়—নানা

রঙের কাগজ, খড়ি, রং আর তুলি, বুরুশ, কাঁচি এই সব চাই। খুব বেশী পরিমাণেও এসব সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় না, কারণ ঐ সব ক'টি জিনিষ এক সঙ্গেই সকলে ব্যবহার করে না।

হাত-পা আর আঙ্গুল খেলিয়ে ঘরোয়া গোছের খেলা খেলতে ভালবাসে অনেক ছেলেমেয়ে। এই ছেলেমেয়েগুলি সচরাচর একটু শান্ত স্বভাবের। তারা স্বচ্ছন্দমনে ও ধীরগতিতে নিজেদের কাজে মেতে থাকে। সাধারণতঃ পুঁতি, সুতো, ঝিনুক, নুড়ি, তেঁতুল বীচি এবং ফলের শুকনো বীজ প্রভৃতি নিয়ে এরা খেলা করে। এই সব দিয়ে প্রথমে ওরা নানারকমের ছোট ছোট জিনিষ তৈরী করে; তারপর সেইগুলি দিয়ে সাজাবার জন্য অন্যান্য জিনিষ তৈরীর কাজে লেগে যায়। এই সব খেলার দরুণ, হাতের কাজে ওরা খুব দক্ষতা লাভ করে।

কল্পনা-মূলক খেলা—অনুকরণপ্রিয়তা শিশুস্বভাবে অপরিহার্য্য। এই প্রকৃতির বশেই ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় আমোদ হলো "বড় হওয়ার" খেলা। শিশু কি না হতে চায়? শিশুকে ক্রমাগত অভিভাবকগণ তার দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়ে তাকে তার আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেন। শিশু অসহায় বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণ নয়; সর্ব্বদাই তার মনে সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা ভীড় করে আসে এবং শিশু সেগুলিকে বাস্তবরূপ দিতে চায় কিন্তু ক্রমাগতই বাধা পেয়ে তার চিত্ত ও মন প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যর্থতায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাই সে তখন বাধাপ্রদানকারী পূর্ণবয়স্কদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করে এবং যথাসম্ভব নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগে "বড়দের সমান" হওয়ার প্রচেষ্টা করে। কখনও সে "মাষ্টার-মশাই" সেজে যে কর্ত্তৃত্ব ও শাসনের অভিজ্ঞতা সে মাষ্টারের কাছে পেয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতাসূত্রে, তারই ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়; কখনও বা তার মনে ধারণা হয় যে সে ছোট বলেই তার উপর অযথা অবিচার ও অত্যাচার যা চেলেছে তার প্রতিশোধ সে ভবিষ্যতে নেবেই নেবে। কখনও সে নিজেকে মস্ত বড় বীর পুরুষ বলে প্রকাশ করতে চায়; কখনও বা নৌকার মাঝি, কখনও বা ডাকপিয়ন, ট্রাম কণ্ডাক্টার, পুলিশ, সিপাহী, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার, ইঞ্জিন চালক ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় না। মন দিয়ে শুনলে ছেলেমেয়েদের খেলার মধ্যে তাদের মায়েদের গলার সুরটি পর্য্যন্ত ধরা যায়। মা-কে ঘিরেই বড় হওয়ার সামর্থ্য-সার্থকতা-ভরা রঙীন ভবিষ্যতই শিশুমনের প্রথম স্বপ্ন।

রবীন্দ্রনাথের "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথ" শিশুমনেরই নিখুঁত পরিচয়-মাধুর্য্য জানায়।—

"মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

* * *

এমন সময় 'হারে, রে, রে, রে, রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।—
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুরদেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো,
আমি যেন তোমায় বল্‌ছি ডেকে,—
"আমি আছি, ভয় কেন মা, কর।"

* * *

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে,
ভাবছ, খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌ছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে ;
বলছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দ্দশাই হ'ত তা না হলে।"

এ-হেন "বীরপুরুষ" হওয়ার লোভ শিশু কি কখনও ছাড়তে পারে?

"বৌ-বৌ" খেলায় দেখা গেল, একটি মেয়ে তার পুতুল-মেয়েকে বলছে, "কতবার বলেছি, চামচ দিয়ে দুধ নেড়ে নেড়ে খানিকটা দুধ ফেলে দিও না ; কথা কী কাণে যায়?"

সব সময়েই যে শিশুরা "বড়"দের অনুকরণ করে চলে তা নয়। নিজেরাই মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, ঘোড়া কিংবা পাখী সেজে কেবল যে প্রচুর আমোদ উপভোগ করে তাই নয়—যা কিছু ওদের নাগালের বাইরে বা তাক্ লাগিয়ে দেয় ওদের মনে, সেটাই ওরা কল্পনার দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে এনে নিজেদের মন হাল্কা করে।

তিন বৎসর ক্রমাগত ছোট ছেলেমেয়েদের অবাধ খেলাধুলার সযত্ন পর্য্যালোচনার পর আমাদের শিশুপুষ্টির প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণা হয়েছে। প্রত্যহ সকালে ওদের যে খেলনাগুলি দেওয়া হয়, সেগুলিকে মনোরম ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। এমনও দেখা গেছে যে কোন কোন শিশু একই খেলনা নিয়ে অনবরত দিনের পর দিন খেলা করে চলেছে। যেমন, আমাদের শিপ্রা—বছর আড়াই তখন তার বয়স, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মায়ের হাত ধরে নার্সারি স্কুলে এল। শিপ্রা একেবারেই কথা বলত না, কাঁদতো প্রায়ই, কি করব তাকে নিয়ে, সে এক মহা সমস্যা। আড়াই বছরের এই মেয়েটি ক্রমে যখন আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলো, তখন নার্সারিতে এসেই একটি পুতুল বেছে নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিত, ঐ একটি পুতুল নিয়েই। অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও জানত যে, এটি শিপ্রার পুতুল, সেটি নিয়ে তারা কাড়াকাড়ি করত না। শিপ্রার যেন এটি আত্মরক্ষার একটি অস্ত্র। ক্রমশঃ পুতুল থেকে পুতুলের বাড়ী, রান্নাবাড়ি ইত্যাদির কাজে তার আগ্রহ হলো। শিপ্রা আজ ৫ বছরের মেয়ে, এখন সে সহজভাবে সবার সঙ্গে মিশতে শিখেছে। কথা এখনও সে খুবই কম বলে, এবং তার প্রকৃতি আজও অপেক্ষাকৃত শান্ত।

পৃথক পৃথক ভাবে যতটা পারা যায়, শিশুদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্য্যালোচনার বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করে রাখি। তার একটি বিশেষ উপকারিতা এই যে, অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ শিক্ষিকা তাহলে সহজেই শিশুবর্গের ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা ইচ্ছা থাকলেও এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলতে হবে কিন্তু সোনামণির তথ্য না বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সোনা আমাদের কলেজের পিয়নের মেয়ে। বাবার সঙ্গে, আমাদের নার্সারি স্কুলের এলাকাতেই থাকে। ১০ মাসের সোনা একদিন বিজয়গর্ব্বে

স্কুলে ভর্ত্তি হতে এল। তার বাবা সঙ্গেই ছিল ; তার কচি মেয়েটিকে অপরাপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দেওয়ার অনুমতির জন্য সে অনুরোধ জানাল। অনুমতি দেওয়ার আগেই, শিশুর দলই রায় সাব্যস্ত করে দিল। লিপিকা বল্‌ল, "তোমার নাম কি ?"—সোনা বলল, "ছো—না।" বাবলু বললে, "না, তুই আমাদের সোনামণি।" সেই থেকে সোনা আমাদের সকলেরই "সোনামণি।"

সোনামণি এখন তিন বছরে পড়েছে। এই "হেষ্টিংস্ হাউস্"-এর এলাকাতেই তার জন্ম। আজীবন সে এই অপরূপ শ্যামল শোভা ও সৌন্দর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছে। প্রথম থেকেই দেখা গেল যে, তার মন খুবই সপ্রতিভ। কখন কি করবে না করবে, ঠিক করতে তার কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় না। পছন্দসই কাজ বেছে নিতেও তার দেরী হয়নি কোনদিন। কচি বয়সেই তার দেহের ও মনের গড়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আভাস সুস্পষ্ট। সতেজ মননশীলতায় সে আমাদের মুগ্ধ করে। খুব অল্প দু' একটি কথা আর অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় সুব্যক্ত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার, লক্ষ্য করা গেল। ভয় কাকে বলে আদৌ সে জানে না, মাত্র অল্প কয়দিন আগেই লক্ষ্য করেছি একটি ২-বছরের শিশু খেলতে খেলতে ঘন উঁচু ঘাসের মধ্যে ঢুকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে ; সোনা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে হাত ধরে বের করে আনলো এবং যাতে সে অযথা ভয় না পায় সেজন্য অনবরত নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাকে আশ্বস্ত করতে লাগলো। আমাদের শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রটির মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সুস্থ, সবল ও নিরাপদ পরিস্থিতি দ্বারা তাদের মনকে সতেজ ও সবল করে তোলা। সেদিন দেখলাম আমাদের "সোনামণি" স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

তিন বৎসর পরে, আজ আমাদের নার্সারি স্কুলের পরীক্ষামূলক কার্য্য-বিধির হিসাবনিকাশ দাখিল করা অসঙ্গত হবে না। ১৯৪৯ সাল থেকেই আমাদের এখানে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য অনেকেরই সমাগম হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা অনুসারে এঁরা বহু বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন আমাদের কাজের বিষয়ে। তবে মতের বিভিন্নতা যতই থাক, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে—এখানকার ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই সুখে, আনন্দে ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় বাস করে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সজীবতা

আর স্বাধীন ব্যবহার, তাঁদের সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের কাজকর্ম্মের ধারায় আছে মননশীল কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় এবং যে যার কাজ শিক্ষিকার সাহায্য না নিয়েই করতে পারে দেখে সকলেই প্রীত হয়েছেন। আমাদের কর্ত্তব্য সমাধানে সাফল্যের জয়টীকা এই শিশুরাই আমাদের দিয়েছে।

অনেকে হয়তো বলবেন, সরকারী প্রতিষ্ঠান না হ'লে কি আর এতটা সম্ভব হতো? কথাটা সম্পূর্ণ অলীক না হলেও, আমাদেরও নানাবিধ বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঘোর বর্ষার সময় একদিন ২০টি ছেলেমেয়ে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে এসে উপস্থিত। স্কুলের পথে রওয়ানা হওয়ার পর ঝম্ ঝম্ করে যখন বৃষ্টি নেমেছে, তখন শিশুরা স্কুলের ফটক পর্য্যন্ত পৌছে গেছে। তখন আর তাদের বাড়ী ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি কলেজের 'হষ্টেল' থেকে ২০টি ব্লাউস চেয়ে এনে ওদের কাপড় জামা ছাড়িয়ে দিলাম। শুক্‌নো, পরিষ্কার জামা পরে ওদের বেশ আরাম হলো বটে, কিন্তু যা চেহারা হয়েছিল এক একজনের! ওরা নিজেরাই হেসে আকুল। তখন থেকেই, চেয়ে চিন্তে, অনেক ফ্রক, বেনিয়ান, পায়জামা, পুরাণো শাড়ী (নাট্যায়োজনে এগুলি অত্যাবশ্যক) তাছাড়া পুরানো ছবির বই, পশমের টুকরো (wool), নানারকম বাক্‌স প্যাঁটরা, পুরানো খবরের কাগজ আর নানা খেলনার সামগ্রীও সংগৃহীত হয়েছে।

এছাড়া যে বাড়ীতে এই শিক্ষায়তনটি খোলা হয়েছে সেটি আগে সরকারী কর্ম্মচারীর বাসভবন ছিল। বাড়ীটি বেশ বড় ও সুন্দর হলেও শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী নয়। বাড়ীটিও মধ্যে মধ্যে আমাদের কাজের বাধাস্বরূপ মনে হয়। পায়খানা বয়স্ক লোকের ব্যবহারের উপযোগী এবং কক্ষগুলি ও শ্রেণী-কক্ষের উপযোগী নয়। কিন্তু চারিপাশে উন্মুক্ত স্থান থাকায় স্কুল গৃহের অসুবিধাগুলি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে মিটে গেছে। শিশু শিক্ষায়তনের দরজা, জানালা শিশুর নাগালের ভিতরে থাকা চাই, প্রত্যেক শিশুর জন্য ১৫ হতে ২০ বর্গফুট স্থান চাই—এসবের ব্যবস্থা আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। এর চেয়েও বড় অসুবিধা যে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে ছেলেদের আনন্দময় পরিবেশ গঠন করতে ও স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যাতে বদ্ধমূল হয় সে বিষয়ে আমরা যতই সচেষ্ট হই না কেন—স্কুলের বাইরে গিয়ে ওরা যে আবহাওয়ায় পড়ে তা আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাড়ীতে

কোন সংক্রামক ব্যাধি হলে খুব কম পিতামাতাই আমাদের সেই সংবাদটি পাঠিয়ে দেন। আমাদের স্কুলের সুযোগ্যা শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) নিয়মিত ভাবে শিশুদের বাড়ীতে যান এবং মায়েদের সঙ্গে আলাপাদি করে এ বিষয়ে তাঁদের সতর্ক করে দেন। তিনমাস অন্তর চিকিৎসক মহাশয় শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমত সদাসর্ব্বদাই দেখাশুনা করেন। তাঁর উপদেশমত ঔষধপত্র কেনা অনেকেরই সামর্থ্যের বাইরে। সহৃদয় বন্ধুবর্গের এবং কয়েকটি সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠানের কৃপায় শিশুদের নিয়মিত ভাবে কডলিভার অয়েল, (Cod-liver Oil) মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট (**multi-vitamin tablets**) ও খাঁটি দুধ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মনে হয় এই শিশুদের ঔষধপত্র দিয়ে আরও কিছু সাহায্য করতে পারলে তাদের প্রকৃতভাবে উপকার করা যেতে পারতো। কিন্তু এ সমস্যা আজ এই একটি ক্ষেত্রে নয়, ভারত বিচ্ছেদের ফলে ভারত সরকারকে যে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে কেবল সরকারী সাহায্যের উপরে নির্ভর করে আমাদের নিরাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এইরূপ অসুবিধা ও বাধা আমাদের সামনে আসবেই এবং সেগুলি যদি আমরা নিজেরাই দূর করতে চেষ্টা না করি তাহলে সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষে শুধু ক্ষতিজনক নয়, বিপজ্জনকও বটে। শিশু সন্তানগণের সুকুমার সাহচর্য্যে আমরা শিক্ষাব্রতী সকলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করি, তাই-ই আমাদের পরম পুরস্কার। *তাদের লালনপালন, তাদের শিক্ষাদীক্ষার* সাধনা, তাদের নিরাপদ শ্রীবৃদ্ধির সম্যক ও সমূহ সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য সকলকেই আত্মত্যাগ এবং স্বার্থত্যাগ করতে হবে। এতেই শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশ ও দশকে সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ

অবাধ খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ

শিশুশিক্ষা সম্পর্কে আজকাল সকল শিক্ষাবিদ এ কথাটি সহজেই বোঝেন যে, আমাদের দেশের শিশুশিক্ষা বিধানে শিশুজীবনের প্রত্যেকটি দিকের সম্যক, সুসঙ্গত ও সমসাময়িক বিকাশ—ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি harmonious development—অত্যন্ত গুরুতর রূপে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে, শিশু তার সহজ ও বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তাতে সে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি। শিশুশিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যালয়ে গড়া কৃত্রিম সামগ্রীবিশেষ করে তোলা হয়েছে। এতে শিশুর মন ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে এতে নষ্ট হয় তার হিসাব আমরা দেখতে পাই না বলেই বুঝতে পারি না। বাস্তবিকই, আমাদের শিশুশিক্ষা প্রণালী শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ; তার স্বাভাবিক প্রয়োজন, তার সহজ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা কিম্বা তার সহজাত ক্ষমতার প্রতি লেশমাত্র দৃষ্টি আমরা দিই না। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণ এখন শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলকে বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শিশুশিক্ষায় শিশুস্বভাবকে আর উপেক্ষা করলে চলবে না। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল—উদ্দাম, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস। জন্মের পর হতেই সে তার সজীব প্রাণের সাড়া জানায় বিভিন্ন ও বিচিত্র খেলাধূলা, ছুটাছুটি ও অন্যান্য কর্ম্মপ্রবণতার অদম্য উৎসাহের ভিতর দিয়েই। সুতরাং শিশুশিক্ষা প্রণালী শিশুস্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন খেলাধূলা ও কর্ম্মোদ্যমের মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডিউই (Dewey) বলেছেন—"খেলাই শিশুর জীবন"—"It is the serious business of his life"।

শিশুর জীবনে খেলার স্বভাবসিদ্ধ প্রাধান্য দেখে এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর মনে করে, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ কলড্ওয়েল কুক (Caldwell Cook) শিশুশিক্ষার জন্য "Play-way Method"—অর্থাৎ খেলার দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেন। এই প্রণালীর

সাহায্যে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষকবর্গ ক্রমশঃ কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই শিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট ও উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। এই লীলাপ্রবণ শিক্ষাপদ্ধতি—"Play-way Method"—যে বাস্তবিকই নানাভাবে উপকারী, একথা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও চিন্তাশীল শিক্ষকগণ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, কর্ম্মপ্রবণতায় যদিও শিশুদের ইন্দ্রিয় ও মনের যথেষ্ট তৎপরতা লাভ হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওদের জীবনে বাস্তবের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় ঘটে ওঠে না। নিজস্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটবার পূর্ব্বেই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা শিশুমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, লক্ষ্য করে এমনতর বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। তাই, প্রতিদিন অল্প কিছু সামান্য উপকরণ—যা সহজে হাতের কাছেই পাওয়া যায়—তাই দিয়েই সৃষ্টির বা সৃজনশীলতার সহজ আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যাতে হয়, তারই নিরলস সাধনায় আজ শিক্ষাবিদগণ কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে অনুশীলন করছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ক্রমশঃ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করাই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য। শিশুর চারিদিকেই বৈচিত্র্যময় পরিবেশের যে সমারোহ, সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতেই তার শৈশব অতিবাহিত হয়। এই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব-ক্ষেত্রজ জ্ঞানাহরণকালে পরোক্ষ জ্ঞানের স্থান কোথায়? তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, "হে দেবগণ, আমরা কাণ দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি।" ("জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা"—৮০ পৃঃ)। গান্ধীজীও জোর করে বলেছেন, "কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে শিশুর বুদ্ধিকে দ্রুত বিকশিত করা সম্ভব।"—("হরিজন পত্রিকা"—৮ই মে, ১৯৩৭)।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে বোঝায়, বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা হাতে-কলমে শিক্ষাদান। নানারকম খেলাধূলা ও কাজকর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে একদিকে এই ব্যবস্থা যেমন শিশুস্বভাবোপযোগী হলো, তেমনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য সব দিক গুলিরই সহজ ও সম্যক বিকাশের সুযোগ সুবিধাও ঐ সঙ্গে প্রকৃষ্ট ভাবে বিহিত করা হলো। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—কর্ম্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে নানারকম কাজকর্ম্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান তো হয়ই, তবুও কেন আবার শিশুর জন্য অবাধ ও স্বাধীনভাবে খেলাধূলার ব্যবস্থা অবশ্যকর্ত্তব্য বলা হয়েছে? শুধু তাই নয়, শিশু পরিচর্য্যা

ও শিক্ষাকেন্দ্রের পদ্ধতি প্রকরণে অবাধ খেলাধূলার স্বাধীনতা দৈনিক শিক্ষা-প্রণালীর প্রথম ঘণ্টাতেই শিশুদের দিতে কেন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়? এ প্রশ্নও মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। "খেলাই শিশুর জীবন", তাই শিশুশিক্ষায় খেলার স্থান অনস্বীকার্য্য—শুধু এই বলাতেই কিন্তু প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হলো না। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে, শিক্ষিকার নির্দ্দেশের সাহায্যে, হাতে-কলমে শিক্ষালাভ কালে ঘরের মধ্যে বদ্ধ না থেকে যদি উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুগণ সুনির্দ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কর্ম্মপ্রবণ থাকে, তাহলে ওদের দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধন প্রকৃষ্টতর হতে পারে—কিন্তু শিক্ষা যে পূর্ণাঙ্গ হলো, একথা বলা চলে না। কারণ, শিশুর আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনাশক্তির বিকাশলাভের বিশেষ কোন সুযোগই ঐ ব্যবস্থায় দেওয়া হয়নি।

শিশুর আবেগ-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের উপরই শিশুর সমগ্র ভবিষ্যৎ ও জীবনগতি নির্ভর করে। তার বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিকতা ও নৈতিকবোধ, তার সম্পূর্ণ বিকাশধারা মূলতঃ তার আবেগ-অনুভূতির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রসারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অতি বুদ্ধিমান শিশুও যদি তার সহজাত আবেগ-অনুভূতির প্রকৃষ্ট স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের সুযোগ না পায়, সে neurotic—বা, মানসিক বিকার-গ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং সুস্থ মননশীলতার পরিবর্ত্তে অসুস্থ উত্তেজনাগ্রস্ত স্বভাবাপন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যদেশীয় মনঃসমীক্ষক (psychiatrist) ও শিশু-মনস্তত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করেছেন যে, শিশুস্বভাবে আমরা যত মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থা দেখতে পাই তার মূলগত কারণই হলো, শৈশবকালে তাদের সহজ আবেগ ও অনুভূতির অন্যায়ভাবে অবদমন। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, অবাধভাবে খেলাধূলার সুযোগে শিশু সহজেই তার সুতীব্র ও নিরুদ্ধ আবেগসকল প্রকাশ করতে পারে এবং ক্রমশঃ সেগুলিকে সে সংযত ও সঙ্গতভাবে বিকশিত করতে শেখে। একথা ভুললে চলবে না যে, শিশুর জীবনস্ফূর্ত্তির প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সূচনা ও পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও নিবিড় পরিচয়ের একমাত্র উপায় হলো—শিশুর স্বাভাবিক লীলাপ্রবণ চাঞ্চল্য। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের পরিবেশের সত্তা খুঁজে পায় ও জীবনক্ষেত্র হতে সাক্ষাৎ জ্ঞান সঞ্চয় করে' জীবনযাত্রা পথে প্রাথমিক নিপুণতা লাভ করে।

পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নিজের চিত্তবৃত্তিসুলভ মনোভাব ও অভিলাষ প্রকাশেরও উপায় শিশুগণ উদ্ভাবন করে খেলার সাহায্যেই। কাজেই, অবাধ খেলাধূলার সুযোগ শিশুচিত্তের সহজ আবেগ-অনুভূতির যথাযথ বিকাশ ও বিন্যাসের সহায়ক তো বটেই, উপরন্তু এরই মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, নৈতিকবোধ, সামাজিকবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

খেলাধূলার সূত্রে শিশুর আনুভূতিক জীবন কি ভাবে বিকাশ লাভ করে জানবার আগে, আমাদের জানা প্রয়োজন—আবেগ ও অনুভূতি কি? শিশুর আবেগ-অনুভূতির প্রকৃতি কি? বয়স্কদের সঙ্গে কোথায় এর সাদৃশ্য, কোথায় বা পার্থক্য?—এবং, শিশুর জীবনে তার সহজাত আবেগ-অনুভূতির প্রভাবই বা কি?

ইংরাজি "emotion" কথাটির অর্থ আবেগ-অনুভূতি বললে ঠিক বোঝা যায় না। "Emotion" বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে একটা গতি (motion), একটা চঞ্চলতা আছে। বাংলার "প্রক্ষোভ" শব্দটিকে এই হিসাবে আমরা "emotion-এর বাংলা অর্থে ব্যবহার করতে পারি। প্রবল আবেগ-অনুভূতির সময়ে কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন মানুষমাত্রেই দেখা যায়। এই সময়ে visceral glands (আন্ত্রিক গ্রন্থিসমূহ)-এর nerve (স্নায়ুবন্ধন) গুলি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলে আমাদের শরীর যন্ত্রে দেখা যায় বিরাট পরিবর্ত্তন, কেননা বিভিন্ন গ্রন্থি-প্রসূত রসায়ন পদার্থ তখন আমাদের রক্তে মিশ্রিত হয়ে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। আমাদের শরীরযন্ত্রে এই যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তার ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কাজ দ্রুত হয় এবং তাতে রক্ত সঞ্চালনও দ্রুততর হয়। তাই, প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের রক্তে অম্লজান-বাষ্প মিশ্রিত হয়ে রক্তে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত হয়। Adrenal ও Suprenal glands (অগ্নি গ্রন্থিসমূহ) থেকে রস নির্গত হয় এবং সেই রস রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, রক্তে sugar (শর্করা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীরে শর্করার পরিমাণ এইভাবে বেড়ে যাওয়ায়, আমাদের বল ও শক্তি বেড়ে ওঠে, কারণ শর্করা শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। দেখা গেছে যে, এইজন্যই মানুষ ও জীব মাত্রেই প্রবল আবেগ-অনুভূতির প্রভাবে অসাধ্য সাধন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রাণভয়ে ভীত হরিণশিশু যত জোরে

ছুটে যায় অন্য সময়ে সে এমনভাবে ছুটতে পারে না। আদিম মানুষের জীবনে এবং তথাকথিত সভ্য মানবের জীবনেও, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রবল আবেগ উচ্ছ্বাসের সময়ে আমাদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই সময়ে আমরা শান্ত থাকতে এবং কোনও রকম চিন্তামূলক কাজ করতে সমর্থ হই না। সুতরাং, দেখা গেল যে, আবেগ-অনুভূতির বিকাশ একদিকে যেমন ছোট বড়, ভাল মন্দ সকল কাজেই প্রচুর শক্তি জোগায়—তেমনি আবার আমাদের নানা কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটায়। এখন প্রশ্ন এই উঠতে পারে যে, আমাদের এই আবেগ অনুভূতি সকল কি জন্মগত, না অর্জ্জিত? ছোট শিশুর মধ্যে ঠিক কোন্ কোন্ আবেগ-অনুভূতি আছে, তা সঠিক বলা শক্ত, যেহেতু শিশু তার মনের কথা বলতে পারে না। এই সূত্রে বৈজ্ঞানিক ও শৈশববিকাশ পর্য্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে তাঁদের নিজস্ব মত বা মনের ভাবও শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শিশুজীবনের বিশেষত্ব বিচার করা কঠিন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, কতকগুলি প্রক্ষোভ শিশুর মধ্যে জন্ম হতেই বিদ্যমান। এই আবেগ-অনুভূতির মধ্যে রাগ, ভয়, দুঃখ বা ব্যথাকে বলা হয়—আদিম প্রক্ষোভ। জীবজগতে এই আদিম আবেগ ও অনুভূতির সূচনা বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেকটি আবেগ-অনুভূতির পিছনে রয়েছে একটি করে আদিম সহজাত প্রবৃত্তি। কুকুর, বানর ইত্যাদির জীবনে বুদ্ধি অপেক্ষা প্রবৃত্তির প্রাধান্যই বেশী। আদিম মানব যখন জীব-জন্তর পর্য্যায় থেকে ক্রমশঃ সভ্য মানবে রূপান্তরিত হচ্ছিল, অনুমান করা যায় যে তখনকার মানুষের জীবনেও বুদ্ধির অনুপাতে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রাধান্যই ছিল খুব বেশী। শিশুর জীবনকে মানব-জাতির ক্রমবিবর্ত্তমান ধারার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে, শিশুজীবনে বুদ্ধি অপেক্ষা প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির প্রভাবই অনেক বেশী।

আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও আমরা ক্ষুদ্র শিশু থেকে আরম্ভ করে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জীবনেও সহজাত আবেগ-অনুভূতির সক্রিয় প্রভাব দেখতে পাই। তবে বর্ত্তমান সভ্যজগতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে অনেকটা স্বায়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয়েছে দেখা যায়—কিন্তু শিশুগণের আবেগ-অনুভূতির সঞ্চার ও প্রাবল্য আদিম যুগের মানবের অনুরূপই রয়ে

গেছে। তারা তাদের সহজাত আবেগ-অনুভূতিকে সংযত করতে পারে না এবং প্রবল উচ্ছ্বাসের সময় তাদের বিচারবুদ্ধি আবেগ-অনুভূতির অন্তরালে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সেইজন্যই শিশুজীবনে এগুলির অদম্য প্রভাব সময়ে সময়ে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে। এই সময় শিশু তার নিজস্ব সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। স্বল্পাভিজ্ঞ শিশুর পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় যে, এই উদ্দাম আবেগ-অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী। সে নিজেকে এর থেকে পৃথক করতে পারে না; আবেগ-অনুভূতির প্রাবল্যে যে নূতন অভিজ্ঞতা সে লাভ করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে সে মিলিয়ে ফেলে এবং এই অবস্থাই তার কাছে চিরন্তন সত্য বলে মনে হয়। পরিণতবয়স্ক মানব, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শ লাভ ক'রে তার আবেগ-অনুভূতিগুলিকে সংযত ও উন্নততর সংস্কারের পথে ক্রমাগত পরিচালিত (sublimate) করবার উপায় বা পথ খুঁজে পেয়েছে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ, আলোচনা, গল্প, কিংবা গান-বাজনার মাধ্যমে সে তার সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের অদম্য বন্ধনপাশ থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে;—ক্ষুদ্র, অসহায় শিশু এরূপ মুক্তির সন্ধান তো পায় না, জানেও না। ভাষায় সে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, অপরের মনোভাবের সঙ্গে আপন মনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায় কি ভাবে, তাও সে বুঝতে পারে না। অনভিজ্ঞ শিশুমন তাই ক্ষণিক ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে বা প্রাবল্যে সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে, আত্মহারা হয়। এই জন্যই শিশুশিক্ষাবিদগণ আজকাল শিশুমনের সহজ চাঞ্চল্যের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল এবং এই নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ যে অবাধ খেলাধূলার স্বাধীনতা—সে সম্বন্ধে এখন তাঁদের কোনও মতদ্বৈধ নেই।

নিজের খেয়াল ও খুশিমত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সাহায্য নিয়ে—কিম্বা, না নিয়েই—তার নিজের সহজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রেরণায় শিশু যে খেলা করে, বা কাজ করে, তাকেই আমরা স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলা বলি। খেলার এই রকম সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞ বলেন—"It is the spontaneous expression according to the necessity of its own nature", অর্থাৎ যে কোনও কাজই শিশুগণ স্বকীয় অন্তর্নিহিত কামনা ও ইচ্ছার প্রেরণায় এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসাহের সঙ্গে, নিজেদের আনন্দলাভের জন্য করে থাকে—তাই-ই

স্বাধীন খেলা। প্রকৃতপক্ষে, শিশুর কাজ ও খেলার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশুসুলভ কাজের ও খেলার পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, কাজ মাত্রেরই পিছনে থাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়—ইংরাজিতে যাকে বলে, "ulterior motive"। অনেকে আবার বলেন যে, কেবলমাত্র নিছক আনন্দলাভই হলো একমাত্র লক্ষ্য। এই মতবাদ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বহু মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। তবে খেলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাবিদই সন্দিহান নন এবং একথা সকলেই বলেছেন যে, শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলতে দিতেই হবে এবং সে সময়ে পরিণত বয়স্কের খেয়াল-খুশিমত বাধা নিষেধের বেড়াজালে শিশুর ক্রীড়াক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা কণ্টকিত করা চলবে না।

খেলা সম্বন্ধে এখনকার প্রচলিত মতবাদ ও অভিমতগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা মোটামুটি ভাবে এইরকম বলতে পারি:

১ম—কার্ল গ্রুস্ (Karl Groos) বলেন, ছেলেদের খেলাধুলা হলো তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি; যেমন, বিড়ালছানা 'বল' (ball) নিয়ে খেলা করে—ইঁদুর ধরবে বলে।

২য়—কার্ল গ্রুস-এর (Karl Groos) মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে স্ট্যানলী হল (Stanley Hall) বলেন যে এই মতবাদে গোড়ার কথাটাই উপেক্ষা করা হয়েছে। খেলার প্রেরণার উৎস অতীতে নিহিত (Recapitulatory Theory), ভবিষ্যতে (Anticipatory Theory) নয়। খেলা মানব জাতির অতীত জীবনের স্মারক, ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস নয়। অনেক খেলারই স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গেলে পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

৩য়—খেলা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ হলো, খেলা "বিশোধক" (catharsis)। এই মতানুসারে খেলার একটি ভাব-বিরেচক প্রভাব আছে। যেমন, বিয়োগান্ত নাটিকা দর্শন ও উপভোগ কালে আমাদের নিরুদ্ধ মানসিক ভাবাবেগ মুক্তি ও প্রকাশের সুযোগ পায়। করুণ রস আমাদের চিত্তের দমিত অনিষ্টকারী ভাবাবেগকে প্রকাশের সুবিধা দিয়ে অন্তর ও মনকে পরিমার্জ্জিত করে। এতে আমাদের হৃদয়ের গুরুভার লাঘব হয়। কেবল করুণ রস নয়, ব্যঙ্গ-কৌতুক, রঙ্গরস, হাস্যরসের দ্বারাও এই পরিমার্জ্জক ও পরিশোধক কাজটি হয়। আমাদের

জীবনে যে ভাবের দ্বন্দ্ব ও দমন চলে, যে কাজ করতে আমরা দ্বিধা ও ইতস্ততঃ করি তা আমরা গল্পের, খেলার ও নাট্যের নায়ক-নায়িকার জীবনের, কাজের ও অনুভূতির মাধ্যমে চরিতার্থ করবার সুযোগ পাই। তাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তাদের হাস্যকর কিম্বা দুঃখময় ব্যবহারে এবং সে সকলের পরিণতিতে পরোক্ষে নিজের মনের তৃপ্তিসাধন করি।

৪র্থ—ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) বলেন—জীবমাত্রেরই কর্ম্মপ্রবণতার ভিতর আমরা যে সকল আবেগ-অনুভূতির পরিচয় পাই, সেগুলি এক একটি বিশিষ্ট এবং মূলতঃ সহজ প্রবৃত্তির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। যথা, পলায়নের প্রবৃত্তির মূলে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং জীবের মনে যখন বিপদের আশঙ্কা জাগে তখনই সে পলায়নোদ্যত হয়। কিম্বা, ধরা যাক্—যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি। যখন জীবনক্ষেত্রে কোন জীব কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বা অপর কোনও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, তখন তার ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং ক্রোধপরায়ণ হয়েই সে যুদ্ধ করে বাধামুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুদের খেলার মধ্যে এরূপ কোন তাৎপর্য্যগত ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার-প্রচেষ্টা বা প্রকাশ আমরা খুঁজে পাই না। কোন একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই কেউ খেলে না, একই ধরণের খেলাতেও কেউ সারাক্ষণ মেতে থাকে না। অধিকন্তু, ঘটনা-সংঘাতের তাগিদেই যে শিশুর খেলা বিশেষ কোন ধরণের রূপ নেয়, তাও নয়। খেলায় উচ্ছ্বসিত শিশুর ব্যবহারে নানা কর্ম্মপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। নিছক খেলার আনন্দেই শিশুরা খেলা করে, তার পিছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই—এই কথাই ম্যাক্‌ডুগাল বলেন।

নিছক আনন্দলাভের জন্যই জীবশিশুর খেলার স্ফূর্তি হয় বটে, কিন্তু অফুরন্ত উল্লাস অভিব্যক্তির অবিরত শক্তি-সামর্থ্য আসে কোথা থেকে—এ প্রশ্ন মনে জাগে। উত্তরে শিলার (Schiller) ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি ও বিকাশ লাভ করে জীবদেহে স্বভাবতই অতিরিক্ত শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চিত হয় এবং সেই অতিরিক্ত শক্তি-সামর্থ্য (surplus energy) খেলার হয়রাণিতে ক্ষয় পায়। (২৩)

২৩। (ক) Social Psychology—by McDougall—Sec. I, Chapter IV, pp. 91—99.

(খ) Child Treatment and the Therapy of Play—by Lydia Jackson and Kathleen M. Todd,—pp. 1—7.

(গ) An Introduction to Child Study—Strang.

মতের হেরফের থাকলেও, আজ পৃথিবীর সকল দেশেই—যেখানেই শিশুশিক্ষা নিয়ে গবেষণা চলেছে সেখানে—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শিশু অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, সে নিজের জন্য একটি পৃথক জগতের সৃষ্টি করে। তার দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণবয়স্কের থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি শিশুসুলভ অভিব্যক্তিতে সে নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্য এবং আবেগময় পার্থক্য বজায় রেখে চলে। জীবন পথে সে যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় শিশুকে তার নিজের পরিবেশের সঙ্গে সেই নবজাত অভিজ্ঞতার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান বারবার ক'রে নিতে হয়। ভাষার সাবলীল গতি তার নেই ; কিন্তু এই সব পরিস্থিতির মধ্যে সে প্রায়ই নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান পায়, অথচ ভাষায় তা' প্রকাশ করতে সে পারে না—অগত্যা খেলার মধ্য দিয়েই এই সব প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে সচেতন হতে শেখে এবং সেই পরিবেশে তার নিজস্ব সত্ত্বা কি, তারও একটা যথাযথ বিচার ও ব্যবস্থা করতে শেখে। ইংরাজীতে যাকে বলে "coming to terms with reality"—অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র রক্ষার প্রচেষ্টা—শিশুজীবনের একটি জটিল দায়িত্ব। সতত পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার ফলে, শিশুকে তার জীবনের শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যানধারণা অনবরতই পরিবর্ত্তন করতে হয় এবং এই জন্যই তাকে খেলার সাহায্যে ঐসব পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে নিতে হয়। এইখানেই আমরা শিশুজীবনে খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করি।

পারিপার্শ্বিকের বন্ধনে জীবনযাপন সূত্রে যা কিছু শিশুমন অত্যাবশ্যক ও শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করেছে, তারই অভিব্যক্তি সে দেয় তার দৈনিক, নিত্যনৈমিত্তিক খেলাধূলার আয়োজনে। যেমন, ছোট মেয়ে যখন পুতুলকে ঘুম পাড়ায়, আনন্দজনক পরিস্থিতির দ্বারা আমোদ প্রমোদের আনন্দলাভই তার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য নয়,—মাতা ও সন্তানের সহজ সম্বন্ধ ও ব্যবহার সম্পর্কে তার সমস্ত জ্ঞানটুকু সে ঐ খেলায় উজাড় করে দিয়ে তার মাতাপিতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যে সম্বন্ধ, সে তা'ও সহজ করে নিয়েছে। এইজন্য এই ভাবে খেলার মধ্য দিয়ে বাস্তব পরিচয় ও নিজস্ব আবেগ অনুভূতির সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা যখনই ব্যর্থ হয়, তখনই শিশুর জীবনে ঘটে বিপর্যয়। শৈশবের এই সঙ্কটকাল যাতে শিশু সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারে তারই জন্য 'নার্সারি' স্কুলে শিশুকে

অবাধভাবে খেলতে দেওয়া হয়। যেখানে স্বগৃহে, পরিস্থিতির আনুকূল্যের অভাবে, শিশুর পক্ষে সহজ ও স্বাধীনভাবে খেলাধূলার মাধ্যমে আত্মপ্রশস্তির সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কোন পথ থাকে না, সেখানে তার ঐ অভাব মোচনের জন্যই 'নার্সারি' স্কুল বা শিশুশিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এইবার যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো—নার্সারি স্কুলের প্রথম ঘণ্টাতেই শিশুকে অবাধভাবে খেলতে দেওয়া হয় কেন? একটি উদাহরণ দিলে হয়তো সহজেই এই প্রশ্নের সমাধান হয়। ৩ বৎসর বয়সের কানু আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হলো। কানুর পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, মাতাও সুশিক্ষিতা; কাজেই কানুকে নিয়ে আমাদের যে কোনও বেগ পেতে হবে, একথা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কানু আসায় আমাদের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিকোণ যেন খুলে গেল। কানুকে খেলার মাঠে রেখেই তার মা, বাবা যেই চলে গেলেন, কানুও আকুল হয়ে কান্না সুরু করলো। এটা নূতন ব্যাপার নয়, প্রায় সব ছেলেই অল্পবিস্তর কাঁদে—কিন্তু সমানে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে কানু না থামালো কান্না, না করলো কোনরূপে খেলায় চিত্তবিনোদনের চেষ্টা। তার মার সঙ্গে তারপর অনেক আলাপ আলোচনা হলো। কানুর মা বল্লেন, "বাড়ীতে ত কানু কাঁদে না। স্কুলে যখন ওর মন বসছে না তখন থাক না হয়—নামটা কেটেই দিন।" কি রকম যেন পরাজয়ের ক্ষোভে অভিভূত হলাম, কানুর মাকে বল্লাম—"আর কিছুদিন দেখি, না?" দু' সপ্তাহ পরে একদিন লক্ষ্য করলাম যে, কানু বাড়ী থেকেই কান্না সুরু করে; কিন্তু পথে ভীতত্রস্ত ভাব নিয়ে ওর কান্না ক্ষণিকের জন্য বন্ধ থাকে, তারপর স্কুলে এসে যেই তার বাবা অফিসের দিকে রওনা হলেন, অমনি কানুও চালালো অবিরাম ক্রন্দন। আমার মনে প্রশ্ন এলো, কানু বাড়ীতে কাঁদে কেন? তারপর দিনই বেলা ন'টার কিছু পরেই আমি ওদের বাড়ী গিয়ে দেখি—সে এক পর্ব্ব! কানুর বাবা খেতে বসেছেন, সঙ্গে কানু; কানুর মা তখন কানুর বাবার খাওয়া-দাওয়া দেখতে ব্যস্ত থাকায় কানুর প্রতি সেরূপ মনোযোগ দিতে পারছেন না। কানুকে পৌণে দশটায় স্কুলে পৌছে দিয়ে কানুর বাবা অফিস যাবেন। কানু কিন্তু তার বাবার মত তাড়াতাড়ি ভাত-তরকারি খেতে পারছে না বলে অনবরতই তাড়া খাচ্ছে এবং তারই ফলে বাপ মায়ের বিরক্তি এবং কানুবাবুর

রোদন! শেষে কানুর বাবা কানুকে প্রায় একরকম টেনে নিয়েই গাড়াতে তুল্‌লেন।

এখন, এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে যে শিশু স্কুলে আসে, সে কি করে স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠ হতে পারে? অতি পরিচিত পরিবেশেও সে স্বচ্ছন্দ মনে, আপন গতিতে চলতে ফিরতে পারে না—অপরিচিত পরিবেশে সে যে নিজের স্থান খুঁজে নিতে, নিজের সত্তায় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ হ'তে, ভয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি তখন কানুর সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাব জমিয়ে তুললাম। দেখলাম, কানু বুদ্ধিমান ছেলে এবং অত্যন্ত সুকুমার তার চিত্তবৃত্তি। সে প্রায় প্রথম আলাপেই বল্লে, "তোমরা আমায় মারবে না তো?"—"কেন, কানু, আমরা কি কেউ তোমাকে মারি? তুমি তো আজ কতদিন থেকে স্কুলে আসছো, তোমাকে কি কেউ মেরেছে?" কানু বল্লে, "না, কিন্তু ধর যদি কোনও খেলনা ভেঙ্গে ফেলি?" আমি বল্লাম, "খেলনা ভেঙ্গে ফেললেও মারবো না। তবে তুমি এক কাজ কর, বালি নিয়ে খেলবে এসো আমার সঙ্গে—বালি তো আর ভেঙ্গে যাবে না।" কানু রাজি হয়ে বালির গাদার মধ্যে এসে পা ছড়িয়ে বসলো। এটা-ওটা খেলনা জুগিয়ে দিতে দিতে আমি একটা সেলুলয়েডের পুতুল এগিয়ে দিলাম। কানু সেটিকে হাতে নিল এবং কতক্ষণ পরেই দেখি, কানু পুতুলের মুখে অবিরত বালি ঠুসে দিচ্ছে। আমি বল্লাম, "কানু, তোমার খোকার চোখমুখ যে সব বালিতে ভরে গেল।" কানু বল্লে, "না, না, খোকাকে ভাত খাওয়াচ্ছি।" এর পরে আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। কানুর মায়ের সঙ্গে আবার আলাপ করে কানুর সকালে খাওয়ার সময় বদলানো হলো এবং কানুবাবু মায়ের কোল ঘেঁসে বসে স্বচ্ছন্দ মনে গল্পগাছা করে খাওয়াদাওয়া সেরে বহাল তবিয়তে স্কুলে আসতে সুরু করলো। কোন কোন দিন, ওর মাকেও সে বালির মধ্যে বসে তার সঙ্গে খেলতে ডাকতো। মাতা ও শিশু একত্রে বসে কতদিন কত খেলা খেলেছেন, আজও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। স্নেহের এই সহজ পরিবেশে কানু ক্রমশঃ নিজের সত্তা-প্রতিষ্ঠা খুঁজে পেল। তার কিছুদিন পরেই আমাদের স্কুলের সকলেই একবাক্যে কানুকে আমাদের স্কুলের জনৈক শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে স্বীকার করেছেন। কানুর এইভাবে নিজেরও শিক্ষালাভ হলো, এবং শিক্ষাদানের পথে নূতন আলোকেরও সন্ধান সে আমাদের দিল।

এইভাবে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কতদিন কত শিশু—নবাগত এবং পুরাতন, মনে একটা ক্ষোভ কিম্বা কোন অশান্তি নিয়ে স্কুলে এসেছে। বিশেষতঃ, সোমবার দিন সকাল বেলায় এই অবস্থা খুব বেশী চোখে পড়ে। কারণ, পূর্ণবয়স্কদের সঙ্গে শিশুর যে দ্বন্দ্ব, শনি-রবিবারই তা প্রকট হয় খুব বেশী করে। ছোট বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে শিশু স্বভাবতঃই অস্বস্তি বোধ করে; তারপর, মায়ের প্রতি কাজে সে বাধা দেয় নানাভাবে; বাবার কাজকর্ম্মেও সে হয়ত হয়ে ওঠে মূর্ত্তিমান বিঘ্ন। তার যে নিজস্ব একটা সত্ত্বা আছে, দাবী আছে, স্বাধিকার বিকাশের প্রয়োজন আছে—সেকথা বোধ হয় কারুরই মনে জাগে না। কিন্তু শিশু তার দাবী ছাড়বে কেন? এতেই লাগে সংঘাত এবং শেষে শিশু অবদমিত হলেও পরাস্ত হয় না। তখন সে তার অভিযোগ প্রকাশ করে জিনিষপত্র ভেঙ্গে চুরে, কান্নাকাটি করে, বিছানা ভিজিয়ে, চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে। অথচ আমরা সকলেই জানি যে, শিশুর সুসামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। এইজন্যই নার্সারি স্কুলে প্রত্যহ অতি যত্নের সঙ্গে দৈনিক কার্য্যপদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়। প্রতিদিনই যদি শিশুগণ সেই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্যক্রম অনুসরণ করে চলতে পারে, তাহলে তাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য আমাদের সযত্ন আয়োজন-সম্ভার সার্থক হয়ে উঠবে, এমন আশা করা খুবই সঙ্গত। কিন্তু মনের মধ্যে রাগ, দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ এ সব পুঞ্জীভূত হয়ে থাকলে, কোনমতেই শিশু স্বচ্ছন্দমনে কোন কাজই করতে পারে না। কাজেই প্রথম ঘণ্টাতেই স্কুলে পৌছানোর মুহূর্ত্ত থেকেই—ওদের মনে পুঞ্জীভূত অবসাদ ও ক্ষোভের নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ পেলেই ওরা খেলাধূলার মাধ্যমে আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে শান্তমনে ও স্থিরচিত্তে গঠনমূলক কার্য্যক্রমের দ্বারা শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে। এরই জন্য নার্সারির কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে শিশুকে প্রথম ঘণ্টাতেই অবাধভাবে খেলাধূলা করতে দেওয়া হয়।

অনেক সময়ে মায়েরা এসে বলেন, "দিদি, আমার এ ছেলেকে আপনাদের স্কুলে নিতেই হবে। কি দৌরাত্ম্য যে করে, আমি আর সামলিয়ে উঠতে পারছি নে।" এই অভিযোগ এতজন মায়ের মুখে শুনেছি যে, ৺সুকুমার রায়ের "ডানপিটের" কবিতাটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে।

"বাপ রে, কি ডানপিটে ছেলে!
কোন্ দিন ফাঁসি যাবে, নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙ্গে, শ্লেট্ দিয়ে ঠুকে।
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে
খাট থেকে রাগ করে ছুম্‌দাম্ পড়ে।"—ইত্যাদি।

ছেলের "দৌরাত্ম্যপনা" সারাবার জায়গা নার্সারি স্কুল নয়, সহজবুদ্ধিতেই সে কথার সত্যতা মেনে নেওয়া কষ্টকর নয়। শিশু দৌরাত্ম্য করে কেন, তাই সর্ব্বপ্রথম বিবেচ্য। এইজন্যই শিশুর মাতাপিতাকে সর্ব্বাগ্রে সন্ধান নিতে হবে, ছেলে "দুরন্ত" হয় কেন? মায়েদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বোঝা গেছে যে, সহজ কারণটা তাঁদের অজানা নয়। স্বল্পপরিসর স্থানে এবং গৃহের সমস্ত ঝামেলা-ঝঞ্জাটের মাঝে শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য ব্যাহত হয় বলেই সে "দস্যি" হয়ে "দৌরাত্ম্যপণা" সুরু করে। তার উপর অজস্র বাধাবিপত্তি, বিধিনিষেধের কড়াকড়ি শাসনে শিশু মনে প্রাণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নার্সারি স্কুলে সেজন্য বাধানিষেধের কোনও শাসনবিধি নেই। ওদের "দৌরাত্ম্যপণা" ঐ পথে সারানোর ব্যবস্থা নার্সারি স্কুলে একেবারেই অগ্রাহ্য। উদাহরণ—আমাদের "শিবলাল"। প্রথম যেদিন সে এল আমাদের স্কুলে—বলা নেই, কওয়া নেই—সোজা গিয়ে সে একটা গাছের মগডালে চড়ে বসলো। শিবলালের বয়স তখন চার বৎসর। স্কুলের পরিচারক 'অমিয়দাদা' তাকে গাছ থেকে নামাবার চেষ্টা করতেই, শিবলাল আরও ওপরে চড়তে লাগল। অমিয়কে মানা করে আমি বললাম, "থাক। ওখান থেকেই ও আমাদের কাজকর্ম্ম দেখুক। শেষে, পছন্দ হলে—নিজেই নেমে আসবে।" সকলের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থেকে নিশ্চিন্তভাবে শিবলাল তখন আমাদের পরীক্ষক হয়ে বসলো। শিবলালের বাবাকে বললাম শিবলালের কীর্ত্তিকাহিনী। হাত-পা ভাঙ্গার ভয় আছে, সে কথাও জানানো হলো। শিবলালের বাবার জবাব পাওয়া গেল,—"বাড়ীতেই ও একদিন না একদিন হাত-পা ভাঙ্গতই; তা এখানেই ভাঙ্গুক।" ক্রমশঃ, শিবলাল নীচের দিকে নেমে এলো এবং বালির দিকে তার নজর গেল।

শিবলালের বাবা কুস্তি করেন। শিবলালও এবার তার বাবার মত কুস্তিপ্রিয় হয়ে উঠলো—ফলে, স্কুলের অন্যান্য সব ছেলেমেয়েরা ওর ঘুঁসির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো। ক্রমে বিশ্বনাথ, জহরলাল, নিত্যানন্দ ইত্যাদি সমপাঠী শিবলালের অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে, তারাও শিবলালের কুস্তির পাল্টা জবাব দিতে সুরু করলো। তাতে শিবলাল ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এলো এবং তার যে অপরিমিত সঞ্চিত সামর্থ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সহজ ও অবাধ স্ফূর্ত্তিবিকাশের সুযোগ পেয়ে এখন থেকে শিবলাল সংযম ও সমাজশিক্ষার কল্যাণ-ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে শিখলো।

তীক্ষ্ণধী ছেলেমেয়েদের বিশেষত্বই এই দেখা গেছে যে, অপূর্ব্ব ওদের উদ্ভাবনী শক্তি। দুষ্ট ছেলেমেয়ে নিত্য-নূতন দুষ্টামির কৌশল যখন আবিষ্কার করে, তখনই বুঝতে হবে যে তাদের বুদ্ধিও ধারালো। উপযুক্ত উপকরণ হাতের কাছে পাচ্ছে না বলেই তাদের মৌলিক চিন্তার ধারা ব্যাহত হয়ে, অসামাজিক ব্যবহারের রূপে প্রকাশ পায়। যদি শিশুদের অভিভাবকবর্গ এই দিকে লক্ষ্য রেখে শৈশব থেকেই তাদের কোনও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করেন, তবে তারাই হয়ত একদিন সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির বলে প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক, যশস্বী শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়ে দেশের ও দশের গৌরব অর্জ্জন করবে—এমনতর ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটে গেছে, আমরা জানি। "ডানপিটে" ছেলেই, শৈশবে যদি শাসনের ঠেলায় তাদের সুকুমার চিত্তবৃত্তি অবদমিত হয়ে না পড়ে, কালক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুসন্তান হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে আশা করা যায়। ইতিহাস এ-যুগেও সাক্ষ্য দেয় যে, পরাধীন ভারতের বুকে এই রকম ছেলেমেয়েরাই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ "লোভীর নিষ্ঠুর লোভ" সশঙ্ক হয়ে পড়েছিল এইসব ছেলেবেলা থেকে ডানপিটে ছেলেমেয়েদের বীরদর্পে।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে লুকিয়ে আছে, সৃষ্টি করবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই অনুপ্রাণিত করে গায়ককে গান গাইতে, শিল্পীকে ছবি আঁকতে। সুকুমার শিল্পবৃত্তির অনুশীলন যাঁরা করেন, তাঁদের সকলেরই সার্থকতা হয় সৃষ্টি করেই। তাই যুগে যুগেই দেখি, স্রষ্টার অবিরত সাধনা। কিন্তু শিশু—ক্ষুদ্র তার জীবন—কি সৃষ্টি করবে সে? এই-ই ছিল এতদিন আমাদের প্রশ্ন। সে ভুল, কিন্তু, আজ আমাদের ভেঙ্গে গেছে। যখন দেখি, আমাদের স্কুলে কমল, বিতান,

চঞ্চল, উজ্জ্বল, মঞ্জু—সবারই ৪ থেকে ৫ বছরের ভিতর বয়স—মাথা নীচু করে', কাঠের ওপর কাঠ ঠুকে, পেরেক গেঁথে, 'ইঞ্জিন' তৈরী করছে, 'রেল-লাইনের' উপর দিয়ে অনায়াসে চলছে ওদের গাড়ী—ওরাই কি তখন সৃজনশীল নয়? শিল্পসাধকের সৃষ্টির সাধনায় যে আনন্দ, তার চেয়ে কোনও অংশে এই সব শিশুর নিরলস প্রচেষ্টা-সাফল্যের আনন্দ কি কিছু কম? শিশু যে চিরন্তন আনন্দের জীবন্ত প্রতীক! গৃহের শান্তি, সুখ, আনন্দ, সমাজ, সংস্কৃতি সবেরই প্রাণকেন্দ্র —এই চিরন্তন শিশুদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আমাদের কেবল দিতে হবে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি—যেখানে তাদের স্বাভাবিক আনন্দময় অভিযানে কোন প্রকার বাধা বা বিঘ্ন ঘটবে না। তারই জন্য নার্সারি স্কুলের এত প্রয়োজন।

আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বয়সের তারতম্য অনুসারে শিশুদের খেলাধুলারও তারতম্য হয়। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সময় যে জীব যত বেশী অপরিণত অবস্থায় থাকে, সে জীব তত বেশীই খেলাধুলার সাহায্যে আপন পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, বিড়ালছানা কি বাচ্চা-কুকুর—জন্মাবার পর বহুদিন পর্য্যন্তই চলে এদের খেলাধুলার পর্ব্ব; কিন্তু মুর্গীর বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের সঙ্গে ঘুরে খুঁটে খুঁটে খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবশিশুও খুব অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। নবজাত শিশুদের বিবিধ ও বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তি (instincts) থাকে, কিন্তু কোনরূপ অভ্যাস থাকে না। এই সহজ প্রবৃত্তি গুলির মধ্যে, একটি প্রবৃত্তি থাকে বেশ সুপরিণত। সেটি হলো—চুষে খাওয়ার প্রবৃত্তি। শিশু যখন চুষে খাওয়ার কাজে প্রবৃত্ত থাকে তখন সে তার নূতন পারিপার্শ্বিকে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। তার জাগ্রত জীবনের বাকী অবসরটুকু একটা অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্যতার মধ্যে কাটে; এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে অধিকাংশ সময়টা ঘুমিয়ে কাটায়। পক্ষকাল পরে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আসে, কেননা নিয়মিতভাবে তার অভিজ্ঞতার যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, তারই ফলে শিশু প্রত্যাশা করার অভ্যাসটিকে আয়ত্ত করে। এবং অবিলম্বেই এমনি নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে তার ক্ষুদ্র জীবনে অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার কোনো বিচ্যুতি বা পরিবর্ত্তন হলেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। শিশুগণ যেরূপ

দ্রুতগতিতে অভ্যাস আয়ত্ত করে নেয়, দেখলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। এইরূপও দেখা গেছে যে, এই সময়ে শিশু যে সকল মন্দ অভ্যাস আয়ত্ত করে, তার প্রত্যেকটিই ভবিষ্যতে তার সু-অভ্যাস গঠনের অন্তরায় স্বরূপ হয়ে ওঠে। তাই, প্রথম থেকেই যদি সু-অভ্যাসগুলি আয়ত্তাধীন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পরবর্ত্তীকালে অনিবার্য্য অনেক গোলযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শিশুর প্রথম বৎসরটি প্রায় বাস্তব সংশ্লিষ্টতাশূন্য, তার জগতে তখন বস্তুর বিশেষ কোন তাৎপর্য্যই নেই। জগতকে তখন তার জানবার, চেনবার জন্য প্রয়োজন হয় পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং এই সূত্রেই, বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে চিনে নিলে তবে, বাস্তব-সম্পর্কিত ধারণার সঞ্চার শিশুমনে হয়ে থাকে। এই পরিচয়টি ঘটে খেলাধূলার মাধ্যমে। এইজন্যই শিশু স্বাভাবিক গতিতে খেলাধূলা করে ক্রমশঃ অক্ষম অবস্থা থেকে সক্ষমতার দিকে এগিয়ে চলে। খেলাধূলাতেই শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনবিকাশ-গতি।

বিছানার স্পর্শ, মায়ের স্পর্শ ও গন্ধ এবং কথাবার্ত্তার সঙ্গে শিশুরা খুব শীঘ্রই পরিচিত হয় এবং সংস্পর্শজাত অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে তার স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্বাদ গ্রহণের শক্তি একত্রিত হয় ও ঐগুলি একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এমনি করেই বস্তু-সত্ত্বা সম্পর্কে শিশুর বাস্তবিক জ্ঞান ও ধারণা গড়ে ওঠে। এরই পরে, একটি বস্তু পেয়ে অপর একটি বস্তু পাওয়ার প্রত্যাশা জন্মায় এবং ক্রমশঃ যখন তার শরীরের পেশীসমূহ স্ব ইচ্ছার আয়ত্তাধীন হয়, তখন সে দৃষ্ট বস্তুকে হাতে ধরতে শেখে এবং সেটিকে ছুঁয়ে, শুঁকে, চেখে, নাড়াচাড়া করে অপার ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। এই সময় অকস্মাৎ শিশুজীবনে যেন অফুরন্ত বিস্ময় ও আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিছুদিন ধরে, অনবরত জিনিষপত্র ধরবার এবং ব্যবহার করবার ক্রিয়া কৌশলের অনুশীলনে সে এমনি মেতে থাকে যে, জাগ্রত অবস্থার সমস্ত সময়টুকুই তার বেশ আনন্দেই কাটে। তারপরে, যখন সে হাঁটতে শেখে, তখন এই নূতন ক্ষমতাটি আত্মগুণাত্মক অনুশীলনের আনন্দে তার পুলক নিবিড়তর করে তোলে, এবং নাগালের মধ্যে জিনিষ পেলেই সে তাই নিয়ে খেলা সুরু করে দেয় মনের আনন্দে। এই খেলাই হলো তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করে দেখা ও জানার একমাত্র পথ ও উপায়। এইভাবে প্রতিদিনই তার জীবনে নিত্যনূতন সমস্যার

উদ্ভব হয় এবং নিজেই সে ঐ সমস্যাগুলি নিত্যনূতন প্রণালীতে সমাধান করে।

পৃথিবীতে যে জীবের বুদ্ধি বা মেধার অনুক্রম যত বেশী, সেই জীব তত বেশী চঞ্চল ও লীলাপ্রবণ। কেননা, বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যহই নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবন করে' সে অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় পৌছায়। উন্নত জীব এই ভাবে সর্ব্বদাই নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবন করে কেন? কারণ, তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে জীবনযাত্রাপথে একটা ব্যবস্থামূলক সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়। সেই সামঞ্জস্য যদি সে রক্ষা করতে পারে তবেই সে বাঁচে, নতুবা অবদমিত হয়ে সে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাণীজগতে নিম্নস্তরের জীবগুলির আচরণ লক্ষ্য করে' জানা গেছে যে, এদের আচারব্যবহার বৈচিত্র্যহীন, এবং নিতান্তই নির্দ্দিষ্ট ধরণে হয় ওদের জীবনবিকাশ। তাই, ওদের জীবনে বিবিধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, খেলাধূলার রকমারি ব্যবস্থা উদ্ভাবনেরও চেষ্টা ওদের বেশী করতে হয় না। সুতরাং জীবনের প্রারম্ভ হতেই, মানবশিশুরই লীলাপ্রবণ চঞ্চলতা সুস্পষ্ট এবং ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু—নিম্নস্তরের জীবের নয়।

বয়স্ক ব্যক্তিগণ শিশুর এই স্বাভাবিক লীলাপ্রবণতাকে কেবলমাত্র খেলা—অনর্থক চাঞ্চল্যের বিকাশমাত্র—মনে করেন। কিন্তু শিশুজীবনে খেলা ও কাজের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। তার ঐ খেলার মধ্যেই খুব বড় একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে উদ্দেশ্যটি শিশুর কাছে সুস্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু মাতাপিতা বা শিক্ষক শিক্ষিকার মনে এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন বার্ণাড শ (Bernard Shaw) দেখেছিলেন, সেখানে "Work is play and play is life, three in one and one in three"—অর্থাৎ, "কাজই তো খেলা এবং খেলাই তো জীবন; এই তিনই এক, এবং সেই একেই এই তিন।" ফ্রোবেল (Froebel)ও শিশুর খেলা সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন যে, কেবল সাময়িক আনন্দলাভের জন্যই শিশুরা খেলা করে না, তাদের জীবনের গোপন উৎস ও কর্ম্মপ্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের খেলার ভিতরে; খেলাই তাদের জীবনে পরম গুরুত্বপূর্ণ ও চরম তাৎপর্য্য সম্বলিত। ফ্রোবেল বলেন—"Play begets joy, freedom, contentment, repose within

and without and peace with the world"। (২৪) খেলার সঙ্গে শিশুজীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরিণত মানব তার কাজকর্ম্মের জন্য নানারকম উপকরণ চায় এবং কাজ সুসম্পন্ন করতে হ'লে তার পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু শিশুর তো বস্তু সম্পর্কে কোন পরিষ্কার জ্ঞান নেই এবং সে কোন বিমূর্ত্ত বস্তু ধারণা করতে পারে না। একথা পূর্ব্বেই এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কাজেই, আমরা যদি শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সুপরিচিত করতে চাই, তাহলে তার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের অনুরূপ উপকরণই তাকে জুগিয়ে দিতে হবে।

এইবার প্রশ্ন হলো খেলাধূলার সরঞ্জামের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা উপযুক্ত, কোন্‌টা বা অনুপযুক্ত—কি করে আমরা জানবো? আজকাল বাজারে কত রকমেরই খেলনা পাওয়া যায়! যাঁদের অর্থের অভাব নেই, তাঁরা অবলীলাক্রমে শিশুর ঘর খেলনা দিয়ে বোঝাই করে দিতে পারেন। কিন্তু তাতেই কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? খেলনা নির্ব্বাচনের সময় শিশুদের স্বাভাবিক কার্য্যকলাপ বেশ ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বলতে হলে এই বলা যায় যে, শিশুর পরিবেশটি আগে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একবার সেবাগ্রামে (ওয়ার্দ্ধায়) কয়েকজন ইংরাজ মহিলা এসেছিলেন। সেখানকার ছেলেমেয়েরা (বয়স, ৫-৭ বছর) তাঁদের সম্বন্ধে নানারকমের প্রশ্ন করেছিল আমাকে—যথা, "তাঁদের গায়ের রং কেন এত লাল্‌চে ও ফর্সা? তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন? কি ভাবে এসেছেন?"—ইত্যাদি। এই ছেলেমেয়েগুলিকে "জাহাজ" সম্বন্ধে ধারণা দিতে কত যে উপকরণ ও সরঞ্জামের আয়োজন করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তাদের দেশে, সমুদ্র তো দূরের কথা—সবচেয়ে কাছের নদীটিও ৫ মাইল দূরে। কাজেই নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই ছিল না। এখন এইরকম সব ছেলেমেয়েদের সামনে হঠাৎ একটি কলের জাহাজ উপস্থিত করলে তারা কিছুটা কৌতুক ও আনন্দ পাবে ঠিকই, কিন্তু খেলার প্রকৃত যেটি উদ্দেশ্য তা পূর্ণ হবে

(২৪) (ক) The Education of Man—Froebel ; p. 55.

(খ) A History of Infant Education—R. R. Rusk ; p. 60.

না। বরঞ্চ তারা যখন জল নিয়ে খেলছে এমন সময়ে শিক্ষিকা তাদের সামনে নানা মাপের কাঠের টুক্‌রো, ইঁট, লোহা ইত্যাদি যদি জুগিয়ে দেন তাহ'লে তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে বুঝবে যে কোন্ কোন্ জিনিষ জলে ভাসে এবং কোন্ কোন্ জিনিষ ডুবে যায়; তারপরে ক্রমশঃ নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির সঙ্গে ওদের পরিচয় সাধন করান যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শিশুরা কোন্ বয়সে কি ধরণের খেলা করে, তাও লক্ষ্য করা উচিত। আমরা দেখেছি যে, ১ বৎসরের শিশু সোনামণি এবং ১ বৎসর ৭ মাসের শিশু আশীষ, যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ কখনই চুপ করে বসে থাকে না; অথচ খুব বেশী দৌড়াতেও পারে না। তারা টলে' টলে' হাঁটে এবং প্রায় সর্ব্বদাই একাকী খেলে। অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলবার বয়স বা মনের পরিণতি তাদের হয়নি। তাদের জন্য এমন খেলনা দিতে হবে যার দ্বারা তাদের পেশীসমূহ আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে, যেমন কাঠের ঠেলাগাড়ী—যা ঠেলে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শিশুর হাঁটা-চলার ক্ষমতা বাড়বে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন কখনও তার মনে আত্মবিশ্বাসের অভাব না ঘটে। কেননা, আত্মবিশ্বাসের অভাবেই পরবর্ত্তী বয়সে, বিশ্বজগৎ এবং জীবনের প্রতি শিশুর একটা আস্থাহীন নেতিভাবমূলক মনোভাব—**negative attitude** হ'তে দেখা দেয়, যার ফলে শিশুর জীবন হয়ে ওঠে দুর্ভর সমস্যাসঙ্কুল। এইজন্যই শিশুর বয়স অনুসারে, ওদের খেলনা ক্রমশঃই জটিলতর করে দেওয়া উচিত, যাতে সমস্যাসমাধানের আগ্রহ ওউৎসাহ যুগপৎ সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ খেলনার দ্বারা শিশুর মন যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। একটি স্প্রিংএর মোটরগাড়ী দিলে, সে কিছুক্ষণ খুব খুসী হয়েই খেলবে; তারপর, স্প্রিংটি কেটে গেলেই, সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণ টানাটানি করবে, তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে। এতে শিশুর মন অশান্ত হয়ে পড়ে। সেইজন্য তাদের মামুলী ও সাধারণ জিনিষই জুগিয়ে দেওয়া ভাল, যেমন—কাঠের টুক্‌রো, হাতুড়ী, পেরেক, কাপড়ের টুক্‌রো, রঙীন কাগজ, দেশলাই-এর খালি বাক্‌স—এইসব, আর মাটি, জল, বালি ইত্যাদি পেলে শিশু খেলার আনন্দে তো মেতে থাকেই, উপরন্তু এগুলির সাহায্যে তার পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা, বিচারশক্তি, কল্পনা ও সৃজনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি

ও মনোযোগের অখণ্ডতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও আবার মনে রাখতে হবে যে, শিশুর বয়স অনুসারে তার খেলনা নির্ব্বাচন করতে হবে—২ বৎসরের শিশু হাতুড়ি-পেরেক নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে মাত্র, কিন্তু ৫ বছরের শিবলাল এক টুক্‌রো কাঠ অপর একটি কাঠের উপরে পেরেক দিয়ে ঠুকে এরোপ্লেন তৈরী করে, মনের সুখে প্রকৃত এরোপ্লেনের মূলতঃ জটিল সমস্যার সমাধান করে। এছাড়াও, সে যে জয়ের আনন্দ এতে অনুভব করে তাতেই তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

চতুর্থতঃ, যে সব খেলনার সাহায্যে শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এমন খেলনা তাকে দিতেই হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এইজন্য আমরা শিশুকে পুতুল, পুতুলের বাড়ী, রান্নাঘরের জিনিষপত্র দিয়ে থাকি। ২।৩ বছরের শিশু পুতুল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে, কখনও বা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে—তার কাছে এটা হলো পরীক্ষামূলক খেলা। কিন্তু ৪।৫ বছরের শিশু এগুলি নিয়ে এমন খেলা ফেঁদে বসে যে, বিস্মিত হতে হয়। একদিন পুতুলখেলা নিয়ে সুরু হলো, পুতুলকে স্নান করান, কাপড় পরান, শোওয়ান ইত্যাদি। তারপরে, সমু বল্লে,—"এবার খুকুর ঘুম ভেঙ্গেছে, ওকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" কাঠের গাড়ীতে পুতুলকে শুইয়ে, গাড়ী ঠেলে সমু গেল পুতুল নিয়ে বেড়াতে। এদিকে উজ্জ্বলা বসলো রান্নাবান্না করতে; সন্ধ্যা, সিণ্টু, তপন তখন ছোট ঝুড়ি করে বাজার করে নিয়ে এলো; লিপিকা কুলোয় করে চাল ঝাড়্‌লো, আর বাব্‌লু ও কানাই মনের সুখে শিলনোড়ায় বাটনা বাটলো। তারপর, চাকি-বেলুনের সাহায্যে কিছু কাদার রুটিও বেলা হলো এবং গাছের পাতায় করে মঞ্জু ও শিবানী সকলকে খেতে দিল। নেমন্তন্ন খাওয়ার সে কি ঘটা! এই সময় চুপ করে বসে শিশুদের কথাবার্ত্তা শুনতে হয়। উজ্জ্বল বল্লে, "আমরা আজ সন্ধ্যের সময় 'কেলাবে' যাব, সেখানে 'ফিষ্ট' হবে।" সঙ্গে সঙ্গে তপন বলে উঠ্‌লো, "আমরাও যাব, ডিম আর লুচি খেতে দেবে।" বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ওরা ওদের 'ছোটকাকার' কথাই আওড়াচ্ছে। এদিকে সবিতা ছোট্ট মায়ের মত, "তোমাকে আর ডাল দেব?"—বলে পরিবেশন করছে। শেষ পর্য্যন্ত "নেমন্তন্ন-বাড়ী"র মতই বেশ একটা হৈ চৈ বেধে গেল। এমন সময় দেখা গেল যে, লিপিকা তার পুতুলকে আর একদিকে খাটে শুইয়ে তার দাঁত তুলতে

ব্যস্ত। প্রশ্ন করে জানা গেল যে, লিপিকার "বাপি" (বাবা) দাঁত তুলতে হাঁসপাতালে গেছেন এবং লিপিকা রোজ বিকেলে তার বাবাকে দেখতে যায়। কাজেই এখন পুতুলের দাঁত তোলার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ। এখানে মনে রাখতে হবে, এইসব খেলার জন্য আমরা সত্যিকারের ছোট, ছোট শিলনোড়া, কুলো, চাকি, বেলুন, ঝাঁটা, হাঁড়ি, হাতা, খুন্তি, বেড়ি ইত্যাদি দিয়ে থাকি। কেননা, এই সকল জিনিষপত্রই তারা বাড়ীতে দেখে এবং নেড়েচেড়ে খেলতে গিয়ে মাতাপিতা ও অভিভাবকগণের কাছে বাধা পায়। পিতামাতা যে সকল জিনিষ ব্যবহার করেন, সে সম্বন্ধে তাদের মনে যে অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মস্পৃহা জাগে, তার সামাধান হয় নার্সারি স্কুলে এসে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলার মধ্যে। এই অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মস্পৃহার অবদমন যাতে না হয়, সেই বিষয়ে সযত্ন ও সচেষ্ট থাকাই শিশুর গৃহ-পরিবেশভুক্ত পূর্ণবয়স্কগণের পক্ষে সমীচীন। কেননা, মনীষা-বিকাশের এই-ই প্রথম সোপান।

পঞ্চমতঃ, শিশুকে এমন সব খেলার উপকরণ দিতে হবে যাতে তার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গগুলি সম্পূর্ণভাবে সঞ্চালিত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন শিশুর কোনরূপ বায়না নেই, সে বেশ শান্ত হয়ে খেলা করছে, কিন্তু তার খেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখলে দেখা যাবে যে এই ধরণের শান্ত শিশু সচরাচর এক জায়গাতেই বসে থাকে এবং একই খেলা দিনের পর দিন খেলে। যেমন শিপ্রা, ২½ বছর বয়সে আমাদের স্কুলে আসে। দেখা গেল, প্রায় তিন মাস ক্রমাগত সে একই পুতুল নিয়ে খেলা করতো। কোন মতেই তাকে অন্য কাজে বা অন্য খেলনা দিয়ে মন ভোলানো যায়নি। এইরূপ ব্যবহারের নানা কারণ আছে। একটি কারণ হলো—শিশুর নিরাপত্তা বোধের অভাব। স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে, শিশুর মন এতই অশান্ত হয়ে পড়ে যে, শিশু যখন বোঝে যে সে নিরাপদ স্থানে এসেছে, তখন আর কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তার পছন্দ হয় না। শিপ্রার জন্মের পরেই বঙ্গবিচ্ছেদ হয়। এবং সে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম ছেড়ে আসে। কলকাতা আসার পর, সে নানা বাসা বাড়ীতে থেকেছে, নানা পাড়ার নানা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার ফলে ওর মনে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল। স্কুলে ওর ব্যবহারে তারই অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা গেছে।

সব ছেলে মেয়েদেরই যাতে বেশ সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্যে শিশুকে দিতে হবে দোল্‌না, চড়বার জন্য মই, লাফাবার দড়ি (skipping rope), দু' এক ধাপের কাঠের সিঁড়ি, ইত্যাদি। এইভাবে সর্ব্বাঙ্গিক ব্যায়ামের ফলে, শিশুর আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও বাড়ে। এবং তার শরীরের পেশীসমূহের দৃঢ় সমন্বয় হয়, দেহ সবল ও সুস্থ হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার ভাব জাগাবার জন্য শিশুদের খেলাধূলা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, খেলাধূলার মাধ্যমেই শিশুর সামাজিক বোধ ক্রমশঃ জেগে উঠে। নবজাত শিশুটি হলো একেবারেই অসামাজিক জীব। ধীরে ধীরে সে তার মা-বাবাকে প্রথম চিনতে শেখে। তারপরে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি—মোট কথা, তার সমগ্র পরিবেশটির সঙ্গে সে পরিচিত হয়। অতঃপর সে কেবল নিজের গৃহটিকে কেন্দ্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—পথে, পাড়ায়, মাঠে, বেড়াতে ও খেলতে যায়, সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মিশতে শেখে, তাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে খেলাধূলা করে। নার্সারি স্কুলেও শিশু প্রথমে একাকী খেলে, ক্রমে ৪।৫ বছর বয়স থেকে সে দলবদ্ধভাবে, সুষ্ঠু শৃঙ্খলায় খেলাধূলা করে। নিঃস্বার্থপরতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, উদারতা, ইত্যাদি যে গুণগুলির দ্বারা মানুষ জগতে অন্যকে সুখী করে ও নিজে সুখী হয়, তারই গোড়াপত্তন হয়—শৈশবে দলগত খেলার মধ্য দিয়ে।

নার্সারি স্কুলের শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক প্রবৃত্তিমূলক অসামাজিক ভাবটি বেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়। ছোট্ট 'সোনামণি'—৩ বছর বয়স তার, একটি বড় টিফিন কৌটা ভরা খাবার নিয়ে খেতে বসেছে। তার পাশেই বসেছে ওর মামাতো ভাই, সে এনেছে একটি মাত্র কলা। সোনামণিকে বলা হলো, "তোমার খাবার থেকে ভাইকে একটু দাও না",—সোনামণি তাড়াতড়ি নিজের কৌটো-ভরা খাবার নিয়ে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে বসলো। অবশ্য, খাওয়ার জিনিষ—অনেক ছেলেমেয়েই অন্যকে দিতে পারে না; কিন্তু খেলনা সম্বন্ধেও দেখা গেছে যে, স্কুলে নূতন এসে অনেক ছেলেমেয়ে ২।৪টি খেলনা দখল করে বসে থাকে। আমাদের নার্সারি স্কুলের জন্য একটি সাইকেল জোগাড় করা হয়। প্রথম যেদিন সাইকেলটি আনা হলো সেদিন সকলের সে কি উৎসাহ—কেউ একবার সেটি দখল করতে পারলে আর ছাড়তে চায় না।

উৎসাহের আতিশয্য এমন দাঁড়ালো যে, নির্ম্মলকে যখন গাড়ী থেকে নামতে বলা হলো সে গায়ে খানিকটা থুথু দিয়ে দিল। কিন্তু সেই নির্ম্মলকে এখন যদি বলা যায় যে, "তুমি তো অনেকক্ষণ গাড়ী চড়লে, এবার বন্দনকে দাও,"— নির্ম্মল প্রায় বিনা আপত্তিতেই সাইকেল ছেড়ে দেয়। সাইকেলটির অভিনবত্ব কেটে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ নয়, অন্যেরাও যে খেলনাটি ব্যবহার করতে চায় একথাও নির্ম্মল উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয়।

ইংরাজিতে প্রচলিত একটি বাক্য আছে—"Health is wealth," অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পদ। "Health" কথাটির ব্যুৎপত্তি এ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ, "wholth," থেকে। ঐ "wholth" কথাটির মানে—পরিপূর্ণতা (completeness)। স্বাস্থ্য বলতে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য বুঝলে চলবে না—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের কথাও ধরতে হবে। দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ হলে শিশুবর্গের আনুভূতিক, আত্মিক ও সামাজিক বিকাশও সুন্দর এবং যথোপযুক্ত হয়। সম্পূর্ণতর এই বিকাশধারা হয় শুধু খেলাধূলার মাধ্যমেই, তাও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। কাজেই খেলার যে উপকরণ—খেলনা, তার গুরুত্ব শিশুজীবনে কম নয়। যিনি শিশুর জন্য খেলনা নির্ব্বাচন করবেন তাঁর দায়িত্ব যে কত, একথা মনে রাখতে হবে।

ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা পছন্দ করে কেনা বেশ সুখের কাজ। তার চেয়েও সুখের কাজ হলো—খেলনা নিজে হাতে তৈরী করে ওদের হাতে তুলে দেওয়া। অনেক সময় অনেকজনকেই বলতে শোনা যায়, ভাল একটি নার্সারি স্কুল স্থাপন করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ; বিশেষ করে খেলনা ও অন্যান্য জিনিষপত্র প্রায় প্রত্যেক মাসেই কিছু কিনে, কিছু মেরামত করে না দিলে নার্সারি স্কুলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেন। কিন্তু যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায়, শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকেই তাদের বহু প্রকারের খেলনা সামগ্রী জোগাড় করে দেওয়া যায় নীচে তারই কিছু বিবরণ দেওয়া গেল।

উন্মুক্ত স্থানে খেলার উপকরণ	মন্তব্য
কাঠের ঘোড়া, see-saw, slide, ট্রাইসাইকেল, ফুটবল, ক্রিকেট্ বল ও ব্যাট্ ইত্যাদি।	See-saw, slide, tricycle এবং কাঠের ঘোড়া ভিন্ন অন্যান্য উপকরণগুলি যে খুব মহার্ঘ্য, তা নয়।

উন্মুক্ত স্থানে খেলার উপকরণ	মন্তব্য
এক হাত অন্তর গেরো বেঁধে গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা ঐ দড়ি ধরে গাছে চড়তে পারে। ভারসাম্যের জন্য কয়েকটি ৬″ (ইঞ্চি) এবং ১২″ (ইঞ্চি) চওড়া কাঠের তক্তা (ইঁটের ওপর বসানো), দোলনা, কাঠের বা বাঁশের মই, ঠেলাগাড়ী, ঠেলে বেড়াবার জন্য কাঠের ছোট পিপে, কিছু মোটা দড়ি—	See-saw, slide ইত্যাদি যদি কেনবার সামর্থ্য প্রথমে না থাকে, তাহলে কাজ চালাবার মত সেগুলি তৈরী করেও নেওয়া যেতে পারে। তবে কোন জিনিষই যে ছেলেদের কিনে দেওয়া হবে না, এমনতর মনোভাব না থাকাই ভাল।
জল, মাটি, বালি, কিছু ইঁট—খুরপি, ছোট বালতি, ফুলগাছে জল দেওয়ার জন্য ফুলের ঝারি, ছোট কোদাল, ঝাঁটা, এক হাত লম্বা রবারের নল ; কয়েকটি সেলুলয়েডের (celluloid) পুতুল, হাঁস, মাছ ইত্যাদি।	বেশ রং চং-এর জমকালো জিনিষ, যাতে দোকানের নতুন-নতুন গন্ধ আছে, এমনও দু'-একটি জিনিষ ছেলেদের মধ্যে মধ্যে দিতে হয়। নতুবা তাদের বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ কাটে না।
কাঠে লাগাবার রং, তুলি ও তেল ইত্যাদি।	**ঠেলাগাড়ী**—বেশ মজবুত প্যাকিং বাক্স কেটে, চাকা লাগিয়ে রং করে নিলেই চলে। ছেলেরা যেন ভিতরে চড়ে বসতে পারে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে।
ছেলেমেয়েরা যাতে বাগানের গাছে চড়ে এবং ডাল থেকে নামতে, ডাল ধরে ঝুলতে ও উঠতে পারে—তার ব্যবস্থা রাখা উচিত।	**বালতি**—"দাল্‌দা" বা অন্য কোন জিনিষের খালি টিন্‌-এ হাতল লাগিয়ে নিলেই চলে।
পোষা পাখী, কচ্ছপ, বিড়াল, কুকুর, ইত্যাদি পোষা জন্তু-জানোয়ার।	পশু পাখীদের জন্য জল ও খাবারের যেন ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘরে বসে খেলবার উপকরণ

পুতুল—নানা মাপের এবং নানা জিনিষের তৈরী ; যেমন—কাপড়ের, কাঠের, মাটির, সেলুলয়েডের, কাঁচের ইত্যাদি।

পুতুলের কাপড়, জামা, শয্যাবস্ত্র, তোয়ালে, সাবান, চিরুণী, মাদুর, বালিশ, তোষক, মশারি, খাট, চেয়ার, টেবিল, জলচৌকি, আয়না, মেজ ইত্যাদি।

রান্নার সরঞ্জাম—যা কিছু আমরা নিজেদের বাড়ীতে প্রত্যহ ব্যবহার করি, সে সবই দেওয়া ভাল। কেবল শিলনোড়া, চাকিবেলুন, যাতা, কুলো ইত্যাদি যা তারা উঠাতে ও নাড়াচাড়া করতে পারে এমন হওয়া চাই। থালা, বাটি, হাঁড়ি, কড়াই বেশ বড় মাপের হলে সেগুলো ছেলেমেয়েরা মাজতে ঘসতে পারে ; খুব ছোট হলে ঠিকভাবে কড়াই বা হাঁড়ির মধ্যে হাতা খুন্তি নাড়তে পারে না বলে শিশুরা খুশি হয় না। ঝাঁটা, ঘর-মোছার ন্যাতা এবং কাচা কাপড় শুকোতে দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাদিও রাখতে হবে।

কাঁচি, কাগজ, আঠা, রঙ্গীন কাগজ, পুরোনো সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কার্ড বোর্ড, কাপড়ের ছিট, সূঁচ-সূতা, নানা

মন্তব্য

পুরোণো শাড়ী, জামা, চাদর, তোয়ালে, শাল, শাড়ির পাড় ইত্যাদি দিয়ে নানা রকমের খেলার উপকরণ তৈরী করে নেওয়া যায়। এই সব খেলনা তৈরী করার সময় শিশুগণকে সাহায্য করতে দেওয়া উচিত এবং তারা নিজের চেষ্টায় যে-সব খেলার জিনিষ তৈরী করবে সেগুলো দেখতে সব সময়ে ভাল হয় না বটে, কিন্তু ঐসব নেড়েচেড়ে শিশুরা যে আনন্দ পায় তার তুলনা নেই। তাছাড়া, এই সব খেলার মধ্য দিয়েই ওদের কল্পনা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সৃজনাত্মক কাজে শিশু ক্রমশঃ আত্মনিয়োগ করতে শেখে।

শিশুকে আমরা সর্ব্বদাই দুর্ব্বল এবং কাজকর্ম্মে অসহায় এবং মূর্ত্তিমান বাধা-বিঘ্নস্বরূপ মনে করে ওদের দূরে দূরে রাখি। এটা খুবই ভুল। কারণ এতেই ওদের মনে মনে আক্রোশ বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও হীন মানসিক ভাব ও বিকারের সৃষ্টি হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সঙ্গে শিশুর যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-বোধ আছে, এই সব খেলার সাহায্যেই তা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। এই সকল খেলনার ব্যবহারে ওদের পর্য্যবেক্ষণের

ঘরে বসে খেলবার উপকরণ	মন্তব্য
রং-এর পশমের টুক্‌রো, কিছু ভাল পশম, কাঁটা, চট ইত্যাদি ; সাদা কাগজ, ক্রেয়ন্ (crayon), গুঁড়ো রং, তুলি, রঙ্গীন চক্ (খড়ি), সাদা চক্ (chalk), কিছু গোলা চক্ (আলপনা দেওয়ার জন্য)।	ক্ষমতা বাড়ে এবং ক্রমশঃ ওরা স্বাবলম্বী হতে শেখে। তাছাড়া, এতে ওদের সংখ্যাজ্ঞান, কথা ও শব্দের বোধ ও শব্দ-সম্ভার ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়। সামাজিক সদ্‌গুণাবলীরও ক্রমবিকাশ হয়।
নানা রঙের কাঁচের ও কাঠের পুঁতি, মাটির পুঁতি, সরু দড়ি, সূতা, ছোট কাঠের চৌকো টুকরো, (blocks), বড় কাঠের চৌকো টুক্‌রো যা দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে পারে ছোট ছোট সীসের তৈরী মানুষ, জন্তু, জানোয়ার ; ছোট ছোট মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী ইত্যাদি বিবিধ সামগ্রী, যা বাড়িতে বসে অথবা বাইরে, বালির ওপর বসিয়ে, গ্রাম বা শহরের পরিকল্পনার রূপ দিতে পারে।	প্রত্যেক শিশুই ভাঙ্গতে-চুরতে ভালবাসে, কিন্তু এ কাজে নিজের বাড়ীতে সে বাধা পায় পদে পদে। স্কুলে এসে প্রথমতঃ তার ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হলে কাগজ, কাপড়, ছবি, এটা-ওটা কেটে, ভেঙ্গেচুরে, ক্রমশঃ তারপর তার সৃজনী-শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। তখন সে কাটা কাগজ, কাটা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে নানা রকমের জিনিষ তৈরী করে এবং তার প্রত্যেকটিই তার খেলায় ব্যবহার করে সে প্রচুর আনন্দ পায়।
খালি সূতার রীল্ (reel), দেশলাই-এর খালি বাকস, নানা মাপের পাউডার ও সাবানের খালি বাকস, খঞ্জনি, ঢোল, ট্যাম্বরিন্ (tambourine), বাঁশি, ছোট মাদল (মৃদঙ্গ), হারমোনিয়ম (harmonium), গ্রামোফোন, এবং শিশুর উপযোগী রেকর্ড, ছোট ছোট ঘণ্টা, নূপুর,	এই সকল খেলনার সাহায্যে শিশুর পেশীসমূহ আয়ত্বের মধ্যে আসে ও কল্পনাশক্তির বৃদ্ধিলাভ হয়। শিশুর আগ্রহ অব্যাহত রেখে, সংখ্যা ও ভাষা জ্ঞান দেওয়া সহজ ও সুন্দর হয়। ছন্দের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রেখে, তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য বোধের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন করা যায়।

ঘরে বসে খেলবার উপকরণ	মন্তব্য
পুরানো জমকালো শাড়ী, জামা ও নানা প্রকারের 'ঝুঠা' গহনা, ইত্যাদি। ছবির বই সহজ ভাষায় লেখা ছোট ছোট গল্প ও ছড়ার বই, "jigsaw puzzles" (হেঁয়ালির খেলা)।	শিশুদের অভিনয়ের জন্য এগুলি নিতান্তই প্রয়োজন। তাছাড়া ওরা নিজেরাই শিক্ষিকার সাহায্যে কিছু কিছু অভিনয়োপযোগী গহনা ও তৈজস পত্র, কাপড় চোপড় তৈরী করে নিতে পারে।
নানা মাপের কাঠের টুক্‌রো ও পেরেক, হাতুড়ি (দু'-মুখো, একদিক দিয়ে পেরেক ঠুক্‌বে, অন্য দিক দিয়ে পেরেক টেনে বের করা যাবে)। রঙীন চক্‌চকে কাগজ-আঁটা সিগারেট ইত্যাদির খালি টিন; তেঁতুল-বীচি, ছোলা বা মটর ভরা থলি (bean bags), কিছু কাঠি; প্যাঁচ-দেওয়া ঢাক্‌না সমেত নানা মাপের শিশি বোতল ইত্যাদি।	ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকেই খেলতে খেলতে দৈহিক ও মানসিক বিরাম বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে। অনেকের আবার বইয়ে কি লেখা আছে, ছবি কি বলে, ইত্যাদি জানবার সাগ্রহ কৌতুহলের উদ্রেক খুবই হয়। ঘরের কোণে পৃথক একটি জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে ওদের বসিয়ে দিলে, আপন মনে ওরা—শান্তভাবে বই, ছবি নিয়ে কাজ করতে পারে।

ঘরে বসে খেলবার উপকরণগুলি নিয়ে শিশুরা অনায়াসে উন্মুক্ত স্থানেও খেলাধুলা করতে পারে। তবে শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন যেন সারাদিন বাইরে থেকে শিশু রোদে ও বৃষ্টিতে, কিংবা অনর্থক ঠাণ্ডা লাগিয়ে কষ্ট না পায়। বাগানের মনোরম পরিবেশে, গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে খেলাধুলা করে' এবং চলে' ফিরে বেড়িয়ে যদি ওরা সহজ ও সাবলীল স্ফূর্ত্তিবিকাশের সুবিধা পায়, তার চেয়ে আর সৌভাগ্যের কথা কি আছে? যেখানে বড় গাছপালা নেই, সেখানে গোল- পাতার কি খড়ের চাল দিয়ে ছোট ছোট ছাউনী করে দিলেও বেশ হয়।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, খেলনার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ম্যাদাম মন্তেসরী কর্ত্তৃক প্রচলিত খেলনার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু তা হলেও, যেসব কাজ তিনি শিশুদের জন্য উপযুক্ত মনে করতেন তা সবই আধুনিক নার্সারি স্কুলে এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিশুরা অবাধে করে নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা পায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি খেলার উপকরণের কথা

উল্লেখ করা যায়। ফিতে-বাঁধার ফ্রেম আমরা দিই না বটে, কিন্তু প্রত্যহ শিশুরা সকালে এসে নিজেদের জুতাগুলি খুলে রাখে এবং বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময়ে নিজেরা জুতো পরে', ফিতে বেঁধে, তবে বাড়ী যায়। দেখা গেছে, নিজের জুতো খুলতে, পরতে, ও ফিতে বাঁধতে অধিকাংশ শিশুই প্রথম প্রথম পারে না—এবং যারা পারে, তারাও এতে এত বেশী সময় নেয় যে, মাতাপিতা ব্যস্ত হয়ে নিজেরাই ওদের জুতো পরিয়ে, ফিতে বেঁধে দিয়ে বেচারীদের কর্ম্মসাফল্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন। এতে শিশু স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা ও সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। শিশুশিক্ষার প্রধান প্রণালী—আত্মশিক্ষা (auto-education), নিজের কাজ নিজেই করে নেওয়ার শিক্ষা। প্রথমতঃ ভুল তো হবেই; কিন্তু ক্রমশঃ নিজেরাই ওরা নিজেদের ভুল শুধরে নেবে। জামায় বোতাম ওরা নিজেই লাগাতে চেষ্টা করে, বার বার ভুলও করে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, বোতাম লাগানো ওরা ঠিকই শিখবে, জুতোর ফিতে বাঁধতেও পটু হবে। এমনি করে চুল আঁচড়ানো, জামা কাপড় ছাড়া ও পরা, এ সবই নিজেরা করে নিতে শিখবে। শিশুদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে হলে চাই অসীম ধৈর্য্য, প্রগাঢ় স্নেহ ও দূরদর্শিতা। নিজেদের কাজ নিজেরা ঠিকমত করে নিতে পারার মধ্যে আছে জয়লাভের অসীম আনন্দ। সেই আনন্দেই ওদের শিক্ষা। এই শিক্ষাবিধানে পূর্ণবয়স্কের চাই সহযোগ ও সহানুভূতি—শিশুদের বিজয়োল্লাসে ও সাফল্যের গর্ব্বে তখন মাতাপিতা, অভিভাবক ও শিক্ষিকা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন।

খেলনাগুলিকে কেবলমাত্র নির্ঝঞ্ঝাটে সময় কাটাবার সামান্য সামগ্রী মনে করলে চলবে না। পূর্ণবয়স্ক লোকের যেমন পুস্তকের ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে, তেমনি শিশুর পক্ষেও ঐসব খেলনার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। ডাঃ শার্লট্ বুহ্লার (Dr. Charlotte Bühler) বলেছেন যে শিশুর খেলার সামগ্রী ব্যবহারের সঙ্গে তার চারিত্রিক পরিবর্ত্তনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। শিশু ক্রমে বৈশিষ্ট্যবিহীন উপকরণ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপকরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেইজন্যই খেলনা নির্ব্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন—

(১) খেলনাটি শিশুর বয়স ও সামর্থ্যের উপযোগী হয়;

(২) ঐ খেলনার দ্বারা শিশু কোন বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে পারে;

(৩) খেলনা যেন অযথা ব্যয়সাপেক্ষ না হয় ;

(৪) খেলনা যেন বেশ মজবুত হয় ;

(৫) খেলনার রং যেন পাকা হয় ;

(৬) খেলনায় যেন কোন খোঁচ বা পেরেক ইত্যাদি, উঁচু হয়ে বেরিয়ে থেকে শিশুদের আঘাত না দেয় ;

(৭) খেলনা যেন মাঝে মাঝে ধুয়ে-মুছে নেওয়া চলে।

খেলার মাঠে যে সব সরঞ্জাম থাকে, যথা—দোলনা, ইত্যাদি, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দড়ি পচে গেলে কিংবা ছিঁড়ে পড়বার মত হলে, বদলে দেওয়া হয়। অকর্ম্মণ্য বা ঘুণে-ধরা বাঁশ, কাঠ—মরচে-ধরা লোহার পাত, স্ক্রু, পেরেক, ইত্যাদি যাতে অবিলম্বে বদলানো হয় সে সম্পর্কে শিক্ষিকার যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক পুষ্টিসাধনের জন্য খেলার প্রয়োজন আমাদের দেশের অনেক মাতাপিতারই জানা নেই। খেলার ভিতর দিয়েই সুরু হয় মানবের দুর্গম জীবনযাত্রা—একথা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে। নাচ, গান, হাসি, খেলা, এগুলি যদি শিশুর জীবনে স্থান না পায়, শিশুর অন্তরের ক্ষুধা থেকে যায় অতৃপ্ত এবং শিশুজীবনে এই ব্যর্থতার কারণেই ঘনিয়ে আসে বিষম সঙ্কটময় পরিস্থিতি। শৈশবের এই সঙ্কটজনক বিপর্য্যয়—সমগ্র সমাজের পক্ষে,—নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আজ উপেক্ষা করা অন্যায়। এই সত্য উপলব্ধি করেই আধুনিক শিক্ষাবিদ, ও জাতিভাগ্য-নিয়ন্ত্রকবর্গ শিশুকল্যাণের জন্য প্রাক্‌প্রাথমিক শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রের ব্যাপকতর শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। শিশুমনের বিকাশগতি লক্ষ্য করে তাঁরা বুঝেছেন যে, শিশুর মনোমত করেই যদি তার শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলা না হয়, তাহলে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এইজন্যই শিশুগণের আত্মবিকাশ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রত্যেক শিশুশিক্ষকেরই শিশুমনস্তত্ত্ব জানার প্রয়োজন। বিস্তৃত জগত-ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিশুজীবনের বিকাশব্যঞ্জনা শিশুর পক্ষে শুধু রহস্যজনকই নয়, রীতিমত সমস্যাসঙ্কুল—একথা দেশের গৃহস্থ মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। শিশুর জীবনবিকাশ হয় তার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়েই। সুতরাং তার জীবনগতিপথে যেটা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে, তাকে উপেক্ষা করা শিশুকল্যাণের—বস্তুতঃ সমগ্র মানব-কল্যাণেরও—পরিপন্থী। যেটুকু অত্যাবশ্যক কেবলমাত্র সেটুকুর

মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকা মানবজীবনের ধর্ম্ম নয়। যতটুকু খাওয়া-পরা ও স্বাচ্ছন্দ্য শিশুর জন্য অত্যাবশ্যক সেটুকুও আজ আমরা আমাদের সন্তানসন্ততিকে দিতে পারি কিনা, সন্দেহ ;—কিন্তু অত্যাবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা না দিলে বয়ঃপ্রাপ্তি হলেও মানুষের দেহমনের পুষ্টিবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

শৈশবের সঙ্কটের মূলকথা এই যে, শিশু যেমন নিজের কথা আমাদের বোঝাতে পারে না, আমরাও শিশুর কাছে অনেক সময়েই হয়ে পড়ি নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য। ১০।১২ বছরের না হওয়া পর্য্যন্ত ছোট ছেলেমেয়েদের যে সেজন্য কত মনঃকষ্ট এবং দুর্ভোগ সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এই দুর্ভোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ; এবং শিশুজীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে যাতে ওদের জীবনযাত্রা সহজতর ও সাফল্যমণ্ডিত হয় তাতে আমাদের সর্ব্বৈব সাহায্যদান কর্ত্তব্য। পথের দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্নের জন্য যেমন যাত্রীদলের পক্ষে সেতু বন্ধন একান্তই আবশ্যক, সেইরকম শিশুদের মন-গড়া নিজস্ব জগত থেকে বাস্তব জগতের ব্যবধান ও বিঘ্ন দূর করতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলার আবশ্যক। সমাজকল্যাণপ্রসূ এই জ্ঞান লাভ করেই আমরা বিংশ শতাব্দীকে "শিশু শতাব্দী" আখ্যা দিয়েছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই, কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।" (২৫) নার্সারি স্কুলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হলো—শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধন করা। মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কিছু নেই। অতএব, শিশুকাল থেকেই চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করলে কাজের সময়ে যে ঠেকে যেতে হবে, সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। নার্সারি স্কুলে যেভাবে শিশুকে সযত্ন, সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে ও প্রশান্ত পরিবেশে অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে খেলাধূলার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়, তাতে শিশুর স্বাভাবিক চিন্তা ও কল্পনার ক্ষমতা সহজেই পরিস্ফুট এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। গাছে চড়ে', জলে ঝাঁপিয়ে, কাদামাটি মেখে, প্রকৃতি-জননীর উপর নানারকম দৌরাত্ম্য করে', শিশুসকলের শরীরপুষ্টি,

(২৫) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা—শিক্ষার হের-ফের ৩ পৃষ্ঠা।

মনের উল্লাস ও বাল্যপ্রকৃতির সহজ পরিতৃপ্তি হয়। গল্প, গান, ছড়া, ছবি-আঁকা, অভিনয় ও প্রকৃতি-পাঠের মাধ্যমে ওরা সাহিত্য এবং প্রকৃতি-রাজ্যে সহজে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়। এই স্কুলেই সে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ পায় এবং সেইজন্যই এখানে শিশুর জীবনবিকাশ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে না হয়ে—একটা পরিপূর্ণ, সমগ্র, এবং সংহত ঐক্যের কল্যাণস্পর্শ লাভ করে, এবং এতেই আসে শিশুমনের পরম ও চরম পরিতৃপ্তি।

আজ আমরা কেন নূতন করে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েছি? —এ-প্রশ্ন অনেকবার শোনা যায়। দুইটি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী পরিস্থিতি এবং বিশেষতঃ এদেশে ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে, লোকের মনে সর্ব্বত্রই আজ যে সমস্যা প্রবলতম হয়ে উঠছে তা' এই,—শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধান হয়নি বলেই আজ জাতির সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত; মানুষের সভ্যতা দিনে দিনে ক্রূর ও জটিলতর হয়ে পড়ছে, জীবনের আড়ম্বর বেড়েছে কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বর্য্য বাড়েনি, তাই সহজেই মানবের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ-সম্পর্কের বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে;—"অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বন্ধন আজ শিথিল হয়েছে," (রবীন্দ্রনাথ)—কিন্তু তাতে কি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েছি? আজ সমাজের মধ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাতের উৎপাত দেখতে পাই, যে সমস্যাসঙ্কুল অনিশ্চয়তার আশঙ্কাজনক চিত্র আমরা দেখি, তা' কোনমতেই তৃপ্তিদায়ক বা শান্তিজনক নয়। কাজেই, মুল গলদ যে কোথায় তারই সন্ধানে মানুষের মন আজ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যস্ত। এই গোড়ার গলদটি দূরীভূত করার একটিমাত্র উপায় আছে—আমূল শিক্ষা-সংস্কার। কিন্তু এই কর্ত্তব্য আমরা কোন-মতে জোড়াতালি দিয়ে সাধন করতে সমর্থ হব না এবং ঠিক সেইজন্যই আজ বিশ্বব্যাপী শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট বিধিপ্রচলনের প্রচেষ্টা চতুর্দ্দিকে আমরা দেখতে পাই।

অনেকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে, যে—"নার্সারি স্কুল"-এর ব্যবস্থা শুধু সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যদেশেরই প্রয়োজনানুসারে গড়ে উঠেছে। আংশিকভাবে কথাটি সত্য বটে, কিন্তু পশ্চিমের সমাজজীবনে যে তরঙ্গাঘাত অনবরত হয়েছে ও

হচ্ছে তার সুতীব্র প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও। এবং যে পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্যে আজ আমাদের সন্তানসন্ততিবর্গ প্রতিপালিত হচ্ছে, সেই অবস্থা দূর করা দেশের সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। এই অসহায় গৃহস্থ-পরিবারগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই প্রথমে নার্সারি স্কুল স্থাপিত হয়। তারপর, শিশুজীবনে 'নার্সারি' স্কুলের উপকারিতা ও উপযোগিতার মর্ম্মানুভাব করে' এখন সাধারণতঃ সকল ঘরের শিশুদের জন্যই নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতর হয়েছে। বাংলাদেশে, আমরাও, এই ধরণের স্কুলের প্রয়োজন ও বিশিষ্ট উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। স্থানে স্থানে তাই, এই ধরণের শিশুপ্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ গড়ে উঠছে। কিন্তু এই নূতন শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বিদেশের অন্ধ অনুকরণে—অথবা, নিছক অর্থোপার্জ্জনবৃত্তির উপায়মাত্র হয়ে—তাদের উপকারিতার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, এর জন্যে প্রত্যেক মাতাপিতা ও অভিভাবকের সতর্ক থাকা উচিত। যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও যেন তদনুকূল হয়; যে-গৃহে আমরা আমৃত্যু বাস করব, সে গৃহের উজ্জ্বল ও উন্নত ভবিষ্যৎ-চিত্র যেন আমরা মানস-নেত্রে সুস্পষ্ট দেখতে পারি; এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যকলাপ যেন আমাদের অন্তর্নিহিত জীবনশক্তির সহায়ক হয়—এই সম্বন্ধে আমাদের সকলের সজাগ হওয়া উচিত। একথা ধ্রুব সত্য যে, বিশ্বের সকল শিশুর মধ্যে একটা জগৎ-জোড়া মিল আছে; কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, রোগ, দুঃখ, আরাম ও আনন্দবোধের মধ্যে যে মিল আছে, সেটা বাহ্যিক মিল। এই প্রয়োজন মিটাবার জন্য সকল দেশেই যে ব্যবস্থা করা হয়, তার মধ্যে খুব বেশী তারতম্য ঘটে না। কিন্তু আমাদের জাতিগত অভ্যাস, আচার-পদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠা, উৎসব অনুষ্ঠান—আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সব ভুলে গিয়ে যেন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়ে না পড়ি, এই বিষয়ে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এবং তাতেই আমাদের মঙ্গল—যে মঙ্গলের দ্বারা আমরা অতীত যুগের সমস্ত আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেলে, নূতন ও সুমহান্ রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভবপর করে তুলতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যনীতি-শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি

স্বাস্থ্যনীতি-শিক্ষায় সামাজিক
পরিবেশ ও পরিস্থিতি

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥

* * *

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি,—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস্ আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি' ॥"

—রবীন্দ্রনাথ—

শুভ শঙ্খ দিকে দিকে ধ্বনিত হয়, উৎসবের কলরব বিমুগ্ধ করে সকলের মন ও প্রাণকে—অতিথিকে আহ্বান করে সমস্ত বিশ্বজগৎ। মাতৃক্রোড়ে যে শিশু আজ অসহায়, অক্ষম অবস্থায় আশ্রয় নিল তার লালন পালন ও পরিচর্য্যার জন্য অসীম দায়িত্ব ন্যস্ত হলো তার জননী, জনক ও আত্মীয় স্বজনের উপরে। মায়ের স্তন্যধারায় যেমন শিশু বাঁচে, তেমনি মায়ের শিক্ষা ও নির্দ্দেশ লাভ করেই শিশু ক্রমশঃ সমাজের একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের একজন বরণীয় নাগরিক

হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে কোথায় সেই জননী যাঁর মহৎ আদর্শে সন্তানসন্ততি শিক্ষাদীক্ষায় ও স্বাস্থ্যসম্পদে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে? যে দেশের নারী আজ সমাজে অবহেলিত—যাঁদের স্বাস্থ্য নেই, জ্ঞান নেই, কোন কাজে উৎসাহ নেই—সন্তানপালন এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে যাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে দেশে কেমন করে জাতির উন্নতি আশা করা যায়? কোনও দেশেই, বাস্তবিক পক্ষে মাতা ও শিশু এত লাঞ্ছিত হয় না যেমন হয় আমাদের দেশে। কোন্ দেশের শিশু মায়ের বুকে দুধ পায় না—কোন্ দেশের শিশু না খেতে পেয়ে মরে, চিকিৎসায় ঔষধপথ্য পায় না, কোন্ দেশে তার সামান্য গাত্রাবরণও মেলে না? কেবল বেঁচে থাকার মত খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ যে দেশের মা জোগাতে পারেন না, সে দেশের শিশুসন্তানের পরিণাম কি তা' চিন্তা করবার বিষয়। আজ রাষ্ট্র ও সমাজ এই দুর্গতির আশু প্রতিকারের প্রয়োজন বুঝেছে, তাই আজ ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিয়েছে; তাই আজ সমাজব্যবস্থা-মূলে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, খাদ্য ও লালনপালন সম্বন্ধে সচেতনতার আভাস দেখা যাচ্ছে। শিশু ও জননীদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সমগ্র দেশ ও জাতির পক্ষেই গ্লানিকর, এই সত্যটি আজ সমাজ চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বোধ হয়।

যে দেশে শিশুর সুখ, শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এবং রাষ্ট্রনায়কবর্গ সকলে সজাগ—সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি অদূর ও অনিবার্য্য। কবিগুরু সত্যই সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ-জ্ঞান নিয়েই দিয়েছিলেন—শিশুদের কল্যাণস্পর্শে সমাজোন্নতির আদর্শ ও উপায়ের ইঙ্গিত :

> "তোমার সৌন্দর্য্যে হোক মানব সুন্দর
> প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
> তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
> মানুষ মানুষে বাসে ভালো।"

যেদিন মানুষ মানুষকে যথার্থই ভালবাসতে পারবে, সেদিন শিক্ষারও সমগ্র উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু রোগে পঙ্গু, সঙ্কীর্ণতায় ক্লিষ্ট, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না। দেশপ্রেমিক মাত্রেই এ কথা জানতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শচিত্র দিয়ে গেছেন। তাঁদের ধ্যান ও জ্ঞানলব্ধ সেই আদর্শে ভারত গড়ে তুলতে হলে সর্ব্বব্যাপী ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ও দৈন্যের মূল যাতে আমরা খুঁজে বের করতে পারি, তার সাধনা করতে হবে; এবং সেই সর্ব্বনাশের মূলে আমাদের নির্ম্মম ও নিশ্চিতভাবে কুঠারাঘাত করতে হবে—যাতে অনিবার্য্য মৃত্যুর কবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে পরিপূর্ণ মঙ্গলের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। যে দেশে এই দুই কর্ম্মসাধনার মিলন ঘটেছে—যেখানে মানুষের আত্মিক ও শারীরিক বিকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করে পরস্পরাপেক্ষী কল্যাণসাধনায় নিযুক্ত করা হয়েছে—সেখানেই আসে প্রকৃত জীবনের আহ্বান, সেখানেই মানুষ "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। সদা দৈন্য-পীড়িত এই নির্জীব দেশকে অমঙ্গলের কবলমুক্ত করে সেই মহামাঙ্গল্যে প্রতিষ্ঠাবান করব—স্বাধীন ভারতের এই সঙ্কল্প। শরীর ও মন এই দুটিরই সমসাময়িক বিকাশ ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখলে সবল, সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর হবে দেশের মানুষ—মানব কল্যাণশিক্ষার এই-ই মূলমন্ত্র।

বিংশ শতাব্দীতে শরীর ও মনের দৈন্য দূর করার প্রচেষ্টায় যুগপৎ দুই প্রকার কর্ম্মসাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি—পূর্ণবয়স্কের পরিপূর্ণতর শিক্ষা; অপরটি—শিশু-পরিচর্য্যা ও শিশুশিক্ষা। এই দুটি কর্ম্মধারার মধ্যে একটি সহজ ও ঘনিষ্ঠ পরস্পরসাপেক্ষী সংযোগ আছে। এইজন্যই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যেদিন দেশের শিশুসকল শৈশবশিক্ষার গুণে সুস্থ দেহ এবং পূর্ণবিকশিত মন নিয়ে বয়স্কদের আসনে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক ভাবে আসীন হবে, সেদিন দেশে আজকালের মত প্রৌঢ়শিক্ষার মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন আর থাকবে না।

শিশুশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বর্ত্তমান। শিশুসন্তানের যা কিছু শিক্ষা সমস্তই তার গৃহের পরিবেশেই তাকে দিতে হবে, এই ধরণের যে অভিমত আজও শোনা যায়—সে অভিমত এ যুগে অচল। কিন্তু তথাপি, কতখানি শিক্ষাপ্রাপ্তি তাদের গৃহ-পরিবেশেই অবশ্য প্রাপ্য, এবং বিদ্যালয়ে ও শিক্ষায়তনে তাদের কখন, কি ভাবে, কোন অবস্থায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, এই সব জটিল প্রশ্নের সমাধান আমাদের এখনই করে নিতে হবে। কারণ, পরিপূর্ণ শিক্ষাবিধি এলোমেলো মন নিয়ে নির্দ্ধারিত হয় না। কোন্ বয়সে, কি অবস্থায় শিশু নার্সারি

স্কুলে আসবে, তা' সমস্তই নির্ভর করে আশৈশব তার স্বগৃহের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরেই। সে গৃহের নৈতিক ও মানসিক আবহাওয়ার উপর তো বটেই, উপরন্তু সেই গৃহের গঠন, অবস্থান, সংসর্গ প্রভৃতি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের পরিচয়ও এক্ষেত্রে বিচার্য্য।

যে-সব শিশু গ্রামে জন্মলাভ করে, তারা ক্ষেতখামারে, পিতামাতার কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভের পূর্ব্বাবধি সময়টা বেশ কাজে লাগাতে পারে। গ্রামের পরিবেশ এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সে তখন জীবজন্তুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে, ধান-কাটা, ফসল মাড়াই ইত্যাদি চাষবাসের কাজ দেখে, যথাসাধ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রচেষ্টাও হয়ত করে। পাখী কত রকমের এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কি সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, ফলফুলের গাছের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এইরূপ নানাভাবে তার শিশুজীবন কর্ম্মশূন্য থাকে না। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিবিধ বৈচিত্র্যের সংস্পর্শ না পেলেও, পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ার কথা নয়। উন্মুক্ত বায়ুসেবনে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে অনায়াসেই তাদের শরীর পুষ্ট হয়—তবে অজ্ঞতাপ্রসূত যে সকল ব্যাধিতে তারা ভোগে তার জন্য যথেষ্ট চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা নাই, সে কথাও মনে রাখতে হবে। কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য কার না দুঃখ হয়? স্বল্পপরিসর ঘরখানিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে, পালা করে শুয়ে, অবিশ্বাস্য সংখ্যক প্রাণীর একত্র বাসে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে কথা আজ অনেকেরই জানা আছে। সর্ব্বাগ্রে এদেরই জন্য নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন। কেননা, অন্যথায় শহরে শিশুজীবন শোভন ও সুস্থভাবে গড়ে তোলা অসম্ভব। সংসারজর্জ্জরিত পিতামাতাদের শিশুপুষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনার সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে না। নার্সারি স্কুলেই এসে শিশু শরীর ও মনের ক্রমবিনষ্টির সর্ব্বনাশ থেকে পায় রক্ষা, অবাধ খেলাধূলার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তির পরিবেশে শিক্ষালাভে পায় অপার মুক্তি ও আনন্দের আস্বাদন। এই সাংঘাতিক অবস্থা শুধু এদেশেই নয়, ইংলণ্ডেও ভীতিপ্রদরূপে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মহানুভবা ম্যাকমিলান (Macmillan) ভগ্নীদ্বয়—শ্রীমতী মার্গারেট ও শ্রীমতী রেচেল—অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় লণ্ডনের শিশুদের মুক্তির ব্যবস্থা সম্ভবপর করে তোলেন। লণ্ডনের "ইষ্ট এণ্ড" অঞ্চলে—অর্থাৎ বস্তী অঞ্চলে—যখন তাঁদের নার্সারি স্কুল তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন,

ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁরা একটি স্মরণীয় বিবৃতি প্রেরণ করেছিলেন। প্রণিধান যোগ্য সেই বিবৃতিটির ভাবার্থ এইরূপ ঃ

১। শিশুসদনে যে সকল শিশু আসে, তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় ও নির্জীব ;

২। উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে ঐ সব শিশুর দেহ ও মন হয়ে থাকে মৃতপ্রায় এবং মায়েদের অজ্ঞতা, সাংসারিক অভাব-অনটন—এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক আলস্যের—দরুণ শিশুরা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েই আসে এবং শিক্ষাসদনে নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য ফিরে পায় ;

৩। স্থানাভাব বশতঃ শিশুরা সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ গলি ঘুঁজিতে ও রাস্তায় খেলাধূলা করে, ফলে দুর্ঘটনাবশে প্রায়ই আহত হয়ে পড়ে, এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবননাশও ঘটে ; তাছাড়া, রাস্তার ধূলা আর আবর্জ্জনার জন্য নানারকম সংক্রামক রোগের আক্রমণেও পীড়িত হয়ে পড়ে ;

৪। স্বল্পপরিসর স্থানে শিশুরা মনের সুখে গোলমাল, দাপাদাপি কিংবা ইচ্ছামত খেলাধূলা করতে পারে না, উপযুক্তভাবে সমবয়সীদের সঙ্গলাভ থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে—ফলে, ওদের মানসিক ও আনুভূতিক দিকটাও পঙ্গু হয়ে থাকে ; এবং,

৫। মাতাপিতার অসাবধানতাবশতঃ তারা বয়স্কদের ব্যবহারাদি অবাধে দেখে। তাতে ফল ভাল হয় না, পরন্তু তাদের স্বভাবও অভদ্র তর্ক-কলহের দোষে দূষিত হয়, এবং মানসিক অবসাদ ও দুর্নীতিপরায়ণতা পরিলক্ষিত হয়। (২৬)

ম্যাকমিলান্-ভগ্নীদ্বয় তাঁদের বিবৃতির শেষে বলেন যে, ঐ সব অসুবিধা এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের দোষে সুকুমার শিশুগণ রুগ্ন, নিরুৎসাহ ও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে নার্সারি স্কুল ঐ শিশু সকলের উপযুক্ত ও শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ রচনা ক'রে ওদের সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করে।

(২৬) (ক) The Nursery School—By Margaret McMillan.
(খ) The Open-air Nursery School—By E. Stevinson.
(গ) Report on Infant Nursery School--H. M. S. O. London 1933 pp. 101—104.

ইংলণ্ডে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শিশু-মঙ্গল-নীতির যেরূপ শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যা ম্যাক্‌মিলান ভগ্নীদ্বয় করেছিলেন, আজ এই দেশে সে-কথার তাৎপর্য্য অবিলম্বে গৃহীত হওয়াই উচিত বলে বোধ হয়। দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে শিশুজগতে সর্ব্বত্রই—সেই সনাতন শিশু। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক, মনীষীবৃন্দ, সমাজসেবী ও শিক্ষিত গৃহস্থবর্গ এই বিষয়ে শিক্ষাব্রতীগণের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অক্লান্ত কর্ম্মোদ্যম করেছেন বলেই আজ সেদেশে শিশুজীবনের ঐ ঘোর বিপদগুলি প্রায় দূরীভূত হয়েছে। সেইজন্য আমাদেরও তাঁদের অনুসৃত পন্থা-পদ্ধতির বিশদ আলোচনা অত্যাবশ্যক কেননা, আমরাও অনুরূপ পথেই আমাদের শিশুগুলিকে রক্ষা করতে পারি।

নার্সারি স্কুল একটি স্বতন্ত্র, ক্ষুদ্র সমাজ। এখানে শিশুসকল উন্মুক্ত পরিবেশে হেসে খেলে, আনন্দে দিন কাটায়; নিয়মিতভাবে আহার, বিশ্রাম ও খেলার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ও সাবলীল গতিতে বৃদ্ধিলাভ করে। এখানে আক্ষরিক শিক্ষার বিশেষ কোন স্থান নেই, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ পরিবেশের ভিতর নানাবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুগণ নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে, সুস্থভাবে দেহ ও মনের বিকাশ এবং পুষ্টিসাধন করে। আমাদের দেশে, বর্ত্তমানে শিক্ষার্থিগণের সাফল্যহীনতার মূল কারণ তাদের আশৈশব স্বাস্থ্যহীনতা। চারাগাছের যত্ন নিলে গাছের ফল যেমন ভাল হয়—তেমনি শৈশব থেকেই শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিলে ভবিষ্যতে অনেক অমঙ্গল কেটে যায়। জাতির নৈতিক উন্নতি, ধর্ম্ম, সমাজ, পারিবারিক সুখশান্তি শিশুকে আশ্রয় করেই পূর্ণতা লাভ ক'রে। যা' কিছু সুন্দর ও মহৎ, তার প্রাণকেন্দ্র এই শিশুদের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই মনে হয় যে, যে-দেশ শিশুশিক্ষা বিস্তারের ও তাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিঃসঙ্কোচে অর্থব্যয় করে, সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি হতে বাধ্য।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতি বলতে কি বোঝায়? মানুষের শরীর যখন সুস্থ ও সতেজ থাকে, শরীর ও মনে যখন স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তখন আমরা তাকে বলে থাকি স্বাস্থ্যবান। যখন শরীর থেকে স্বাচ্ছন্দ্য চলে যায়, শরীর ও দেহের সুখ অদৃশ্য হয়, তখনই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ অবস্থায় দেহের এবং মস্তিকের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক কোষ দেহধর্ম্ম অনুসারে—বিনা কষ্টে, স্বীয় ছন্দে ও সুষ্ঠুভাবে—নিজ নিজ কার্য্য সাধন করে চলে। কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে কেবল দেহের

স্বাস্থ্য বুঝলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বাস্থ্য কেমন তারও সংবাদ রাখতে হবে, কারণ দেহ ও মনের মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রকৃত স্বাস্থ্য যার আছে সে সর্ব্বদাই সুখী। যার দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল, তার মনের স্বাস্থ্যও উজ্জ্বল—বুদ্ধিবৃত্তিও তাই তার স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। শিশুকে যখন স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে নিয়মপালন করতে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন তার দেহের ও মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেওয়া হয়। যে সমস্ত নীতি ও নিয়ম পালন করলে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, তাকেই আমরা স্বাস্থ্যনীতি বলি। সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করা সকলেরই জন্মগত অধিকার। অনেকের মনেই ভুল ধারণা আছে যে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ব্যাধি শরীরের বিকারমাত্র।

শিশুর সুখ ও স্বাস্থ্যের উপরে সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাই শিশুশিক্ষায় শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতির স্থান সর্ব্বোচ্চে। শিশুশিক্ষার মূল কথাই হলো শিশুর স্বাস্থ্য সুন্দর ও সবল করে তোলা, ও শৈশব হতেই শিশুর জীবনে স্বাস্থ্যনীতির মূল্য ও ব্যবহার বুঝিয়ে দেওয়া। বর্ত্তমানে যারা শিশু, ভবিষ্যতে তারাই জাতিতে পরিণত হবে—আজকের এই শিশুরা যদি অসুস্থ থেকে যায়, তবে ভবিষ্যৎ জাতি স্বাস্থ্যবান হবে বলে আশা করা বৃথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বুয়র যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের যুবকগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উপযুক্ত সৈনিক নির্ব্বাচনের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন। এই পরীক্ষার নৈরাশ্যজনক যে ফল পাওয়া যায়, তাতে ইংলণ্ডের বোর্ড অফ্ এডুকেশন (Board of Education) তৎক্ষণাৎ ছাত্রছাত্রীগণের প্রতি মনোযোগী হন। কয়েকটি বিভিন্ন দেশের মতামত আলোচনা করলে বোঝা যাবে, বর্ত্তমান শিশুশিক্ষায় শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি কতদূর দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তাতে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতির স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধেও কার্য্যকারী জ্ঞানলাভ হবে।

আর্জ্জেণ্টাইন, বেলজিয়ম, ব্রেজিল, হাঙ্গারী, নিউজিলাণ্ড, সুইডেন, সুইট্জারলাণ্ড এবং ব্রিটেন, শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করে গ্রহণ করেছেন, এবং সেইজন্য এই সকল দেশে প্রতি বিদ্যালয়েই শিশু ও বালকবালিকাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাদের যাবতীয় রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখবার প্রচেষ্টা আজকাল সব দেশেই করা হয়।

আর্জ্জেণ্টাইনের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন ভাবে শিশুকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শিশু সারাজীবন শরীরকে সুস্থ রাখবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। বেলজিয়ামে বলা হয়, স্বাস্থ্য রক্ষার অর্থ—যেন শিশু বুঝতে পারে কি ভাবে জীবনের নানা-ক্ষেত্রে সু-অভ্যাসগুলি পালন করতে হয় এবং কি ভাবে নানা-রূপ সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে নিজেকে এবং অন্যকে রক্ষা করতে হয়। চীনদেশে ও ফ্রান্সে বলে—স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা মানে শুধু নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষাই নয়, তার সঙ্গে সমাজগত স্বাস্থ্যকেও রক্ষা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবিদগণ বলেন যে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শুধু উপদেশ দিলেই চলবে না—শিশুরা উপদেশের মর্ম্ম বোঝে না—কার্য্যক্ষেত্রে তাদের সেই নীতি ও নিয়মপালন করতে শেখাতে হবে। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যনীতি পালন করা ছাড়া, শিশু যাতে নিজের বাসস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে শেখে সে-শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। কানাডায় স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাকে সমাজে মেশবার শিক্ষা বলেই গ্রহণ করা হয়েছে, এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষাকে সকল শিক্ষার "corner stone" বা ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যাদান কালে বলেছেন—সকল শিক্ষার সার শিক্ষা হলো "সাফাই" শিক্ষা। জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক একবার মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করেন "আমি রাষ্ট্র সেবক হতে চাই, আমার কি করা উচিত?" সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী জবাব দেন—"ভাঙ্গি বন্ যাও।"

শিশুদের "সাফাই" শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদের সব প্রথমে দেখতে হবে, অপরিচ্ছন্নতা-প্রসূত কি কি ব্যাধিতে আমরা ভুগে থাকি, কেননা অপরিষ্কার জীবনযাত্রার ফলভোগ করতে হয় সকলকেই, এবং এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ীও সকলেই। যেখানে সেখানে থুথু ও কাশ ফেলা, পানের পিক ফেলা, ফলের খোসা ফেলা, পোড়া সিগারেট ফেলা, রাস্তাঘাটে পায়খানা করা, মাছি-বসা কাটা ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়া—এসব বর্ত্তমান জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখতে পাই। বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার রাখা যে প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধেও আমরা অজ্ঞ। কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণকেই দোষ দেওয়া উচিত নয়, শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ অনেক গৃহস্থকেও এ সম্বন্ধে সাবধান হতে দেখা যায় না। এই সকল মন্দ অভ্যাসের মূলে কুঠারাঘাত না করলে আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাস্থ্য- শিক্ষার কোনই মূল্য নেই।

এই অধ্যায়ে শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতির উপায় আলোচনা কালে, নার্সারি স্কুলে তাকে কি ভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হবে। বেলা দশটার কিছু আগেই শিশুরা নার্সারি স্কুলে এসে উপস্থিত হয়। এসেই ওরা নিজের নিজের টিফিনের কৌটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখে, তারপরে জুতা খুলে পাটি মিলিয়ে তাকের উপর তুলে রাখে। অধিকাংশ পিতামাতা শিশুকে বৎসরে একবার মাত্র জুতা বা চটি কিনে দিতে পারেন। সেইজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুকে বেশ বড় মাপের জুতা কিনে দেওয়া হয়েছে এবং শিশু ঢিলা জুতা টানতে টানতে স্কুলে আসছে। বৎসরের শেষে দেখা যায়, হয় জুতা ছোট হয়ে গেছে কিংবা ছিঁড়ে, রং উঠে কুশ্রী হয়ে গেছে। সহরের রাস্তায় জুতা পরার নিতান্তই প্রয়োজন, তবে নার্সারি স্কুলের পরিবেশে সে প্রয়োজন নেই বলে শিশুকে ঢিলা বা ছোট মাপের, কিংবা নোংরা ও কদাকার, জুতো পরিয়ে কষ্ট দেওয়ার কোনই অর্থ হয় না।

জুতা খুলতে ও পরতে পারা, শিশুর পক্ষে একটা মস্ত বড় যোগ্যতা অর্জ্জন। প্রত্যহ জুতা খোলা ও পরার মধ্য দিয়ে শিশুরা ডান ও বাম পায়ের পার্থক্য এবং ঠিকমত জুতোর ফিতা বা বোতাম লাগানো ও খোলা, বেশ শীঘ্রই শিখে ফেলে। আমাদের স্কুলে, শিশুরা দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়ই খোলা মাঠে খেলাধূলা করে, সে সময় তারা যত মাটির সংস্পর্শ পায় ততই ভাল ; এবং যখন ঘরের ভিতর আসে তখন পা ধুয়ে আসে, যাতে বাইরের ময়লা মাটিতে ঘর অপরিষ্কার না হয়। তাছাড়া, ওরা নিজেদের ময়লা জুতো পরিষ্কার করে, রঙ লাগায় এবং বুরুশ করে। এই সুশিক্ষায় ওদের অনেক উপকার হয়।

বেলা ১০টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত শিশুরা অবাধে নিজের পছন্দমত খেলনা নিয়ে খেলাধূলা করে। এই সময় একজন শিক্ষিতা সেবিকা ওদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। তিনি নিজের কাছে একটি হাজিরা খাতা রাখেন এবং খাতা দেখে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ ১২টি করে শিশুকে পরীক্ষা করেন। ফলে, প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের ৬০টি শিশুর কোষ্ঠ, কাপড়চোপড়, নাক, কান, নখ, দাঁত, চুল, চোখ, ত্বক্ ইত্যাদি দেখে তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। শিশুদের কি ভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে একটি উদাহরণ দিলে হয়তো বোঝবার বেশ সুবিধা হবে। একদিন শিশুদের নখ কাটার সময়,

হাতে নখ বড় থাকলে কি বিপদ ঘটতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। আগেই বলা হয়েছে, শিশুরা বক্তৃতা ও উপদেশের মর্ম্ম বোঝে না। 'অসুখ' জিনিষটা যে কি তাও পেট-ব্যথা, ভাত-খেতে-না-পাওয়া ইত্যাদি বলে বোঝাতে হয়। যাই হোক্, সেদিন দেখা গেল অলকের আঙ্গুলে নখ বেশ বড় আর নখের ভিতর ময়লা জমেছে। তাকে বলা হলো—"এই যে দেখো, নখের ভিতর যে এই ময়লা আছে—যখন ভাত খাও তখন ভাতের সঙ্গে পেটের মধ্যে যায়। তাই পেট কামড়ায়। পেটব্যথা করলে মা তো স্কুলে আসতে দেবেন না, তখন কি হবে ?" স্কুলে আসতে না পাওয়া, আমাদের শিশুদের পক্ষে সব চেয়ে বড় সাজা। কাজেই এইভাবে কথার মধ্যে মূল তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় এক সূত্রে গাঁথা হলো—(১) আঙ্গুলে বড় নখ থাকলে নখের ভিতর ময়লা জমে; (২) ময়লা পেটে গেলে পেট ব্যথা করে; (৩) পেট ব্যথা করলে স্কুলে আসতে পাবে না। অলকের দুর্ভাগ্যই হোক কি আমাদের সৌভাগ্যই হোক, সেইদিনই অলক টিফিনের পর বমি করে শুয়ে পড়লো। তখনই শিশুর দল নিজেরাই মন্তব্য প্রকাশ করল যে, বড় বড় নখ থাকলে পেটে ময়লা যায় এবং বমি হয়। তার পরের দিন অলক স্কুলে আসে নি। পরের দিন যখন সে এল, চঞ্চল দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে আঙ্গুল পরীক্ষা করে দেখে বলল—"না, আজ অলকের বড় বড় নখ নেই; অলক আর বমি করবে না, স্কুলও কামাই হবে না।" কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল শিক্ষা চলচ্চিত্রের সাহায্যেও দেওয়া যেতে পারে।

অবাধ খেলাধূলার সময়ই শিশুরা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট পড়বার ঘরটি, যেখানে বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওরা শিক্ষালাভ করে—নিজেরাই ঝাড়পোঁছ করে, ফুলের ঘটিতে ফুল সাজায়, নিজেদের শ্লেট খাতা বইও বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে। প্রথম স্কুলে এসে শিশুরা অনেকেই খেলাধূলার পর জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে রাখতে চায় না। অন্যান্য বদ্অভ্যাসও থাকে, যেমন নালা-নর্দ্দমায় মলমূত্র ত্যাগ করা, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা। এই সব অসামাজিক ও হানিকর ব্যবহার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই সব ব্যবহার যে কোনরূপ মূলগত চারিত্রিক দোষ তা নয়। পিতামাতা ও অভিভাবকগণের অজ্ঞতা বা অসাবধানতার ফলেই শিশুরা যথাযথ ভাবে শৌচাগার ব্যবহার করতে শেখেনি।

অপরিষ্কার, অন্ধকার আর দুর্গন্ধের জন্যও ওরা পায়খানায় যেতে চায় না, নালা-নর্দ্দমাই ব্যবহার করে থাকে। প্রত্যেক পিতামাতা যদি শিশুসন্তানগণের এইসব ঘোরতর অসুবিধাগুলি দূরীভূত করেন তাহলে, যে-সব কু-অভ্যাস প্রায় মজ্জাগত হয়ে গেছে সেগুলি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও প্রতিরুদ্ধ হবে, আশা করা যায়। নার্সারি স্কুলে স্নানাগার, শৌচাগার এবং অন্যান্য কক্ষগুলিও শিশুদের ব্যবহারোপযোগী করেই তৈরী করা হয়; এবং সেইজন্য, প্রয়োজন বোধ হওয়া মাত্র শিশুরা স্বচ্ছন্দে শৌচাগারে যেতে পারে। খুব ছোট ছেলে মেয়েদের বেলায়, একজন শিক্ষিকা সঙ্গে থাকেন; কিন্তু ৩ বৎসরের ওপর ছেলেমেয়েরা এ-সব কাজে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যায়। নার্সারির কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে সকল শিশুই প্রত্যহ তিনবার নিয়মিত রূপে শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে স্নানাগার ও শৌচাগার ব্যবহার করে।

বেলা ১১ টার সময় শিশুদের স্বাধীন খেলাধূলা শেষ হয়। সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ১০ মিনিট আগে থাকতেই, ওরা খেলার সরঞ্জাম গোছগাছ করতে সুরু করে। এই সময়ে শিক্ষিকাকে ওদের সাহায্য করতে হয়, কেননা প্রায় ১ ঘণ্টা অবাধে খেলাধূলা করে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং সেইজন্য চারিদিকে ছড়ানো খেলনার জিনিষপত্র তুলে ঘরে গুছিয়ে রাখতে প্রায়ই ওদের ইচ্ছা হয় না।

এই সময় শিক্ষিকা যদি সহানুভূতিসম্পন্না হয়ে ওদের যথাযথ নির্দ্দেশ দেন, তবে শিশুরা সহজেই খেলনাগুলি তুলে গুছিয়ে রাখে, সেখানে রং বা মাটির কাজ হয়েছে সে সব জায়গায়ও মুছে পরিষ্কার করে, তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে নিজেরা হাত, পা, মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে স্কুল ঘরে আসে। তারপর বেলা ১১টার সময় সকলের সমবেত গানের পর প্রত্যেককে একটি করে multi-vitamin tablet বড়ি দেওয়া হয় এবং তারা প্রত্যেকে এক গেলাস করে জল পান করে।

১১।৩০—১২।১৫—এই সময়ে কর্ম্ম-পদ্ধতির নির্দ্দেশক্রমে, শিশুরা তিন দলে ভাগ হয়ে যায়, এবং প্রত্যেকে যে যার কাজে ব্যাপৃত হয়। ৪ থেকে ৫ বছরের শিশুরা এই সময় আর একবার সাফাই-এর কাজ করে। এইবার তারা নিজেরাই এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিজেদের মধ্যে নায়ক নির্ব্বাচন করে :

(১) ডেস্ক্ পাতা ও তোলা······················ ৪ জন ;
(২) যে ঘরে 'ক্লাস' বসে, সে ঘরটি ঝাড়া মোছা, ও ফুল সাজানো························ ২ জন ;
(৩) খাতা, পেন্সিল, রবার (eraser), শ্লেট, খড়ি, ঝাড়ন, ইত্যাদি দেওয়া············ ২ জন ;
(৪) মাদুর পাতা ও তোলা····················· ২ জন ;
(৫) খাওয়ার জায়গা ঠিক করা, ও খাওয়ার পর পরিষ্কার করা························· ২ জন।

এ-ছাড়া, নূতন ধরণের কাজ আরম্ভ হলে শিশুরা সেই কাজের জন্য নূতন দল ও দলপতি নিজেরাই নির্ব্বাচন করে। যথা, প্রকৃতি পাঠের জন্য ব্যাঙ বা গুটিপোকা রাখা হলে তার জল বদলানো, তাদের খেতে দেওয়া, ইত্যাদি কাজ বেড়ে যায়। শিশুরা মহা আনন্দে শিক্ষিকার সহায়তায় এসকল কাজ সমাধা করে, এবং এই সকলের মাধ্যমেই তাদের ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান কি ভাবে সমৃদ্ধ হয় সেকথা পরে আলোচিত হবে।

১২।১৫—১২।৩০—মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা মুখ, হাত, পা ধোয় এবং প্রত্যেক শিশুকেই নিয়মিতভাবে মলমূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস করান হয়।

নিজের জিনিষ চিনে পৃথক করে রাখা ও ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া হয় এই ভাবে—স্কুলের তিনটি ঘরে, মাটি থেকে ২½ ফুট উঁচুতে, ২ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া ও ১ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা কাঠ আঁটা আছে, এবং সেই কাঠের উপরে, ১ ফুট দূরে দূরে, পিতলের কিম্বা এলুমিনিয়মের তাবের 'হুক্' (hooks) লাগানো আছে। হুক্‌গুলি উপরের দিকে বাঁকানো, যাতে শিশুদের চোখে মুখে আঘাত না লাগে। ১ ফুট ব্যবধানের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে প্রত্যেক শিশুর নাম লেখা আছে এবং হুকেও সেই নামের শিশুটির তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখা থাকে। একটার সঙ্গে আর একটা তোয়ালের যাতে ছোঁওয়া না লাগে, তার জন্য প্রত্যেকটির মাঝে ১ ফুট ব্যবধান রাখা হয়। নাম লেখা থাকার দরুণ, শিশুরা অতি অল্পকালের মধ্যেই নিজের নিজের নাম চিনতে ও পড়তে শেখে এবং নিজের তোয়ালেটি ঠিক জায়গায় রাখতে এবং নিতে শেখে। এই তোয়ালেগুলি প্রত্যেক সপ্তাহেই ধোওয়া হয়।

হাতমুখ ধোওয়ার পর শিশুরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাদুরের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে। এই ধরণের বসাকে ওরা বলে "বাবু হয়ে বসা।" তারপর নিজেদের খাবারের কৌটা মেঝেতে রেখে খায়। প্রত্যেক শিশুকে আধ পোয়া করে গরুর খাঁটি দুধ দেওয়া হয়। পরিবেশনের ভার শিশুদেরই উপর থাকে। এই সময় ওদের থেকে দুজন "মা" হয়ে "এপ্রণ" (apron, বর্হিবাস) পরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আসে এবং দুধ নিয়ে অতি সন্তর্পণে পরিবেশন করে। খাওয়ার সময়টিকে নার্সারি স্কুলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেননা এই সময়েই শিশুরা নানাবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। প্রথমতঃ, ভদ্রভাবে বসে পরিষ্কার হাতে, পরিচ্ছন্ন ভাবে খেতে শেখা, পাশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অমায়িকভাবে গল্পগাছা করা, ছোট ছোট গ্রাস করে খাবার মুখে দেওয়া, মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে কথা না বলা, খাওয়ার পাতের ওপর দিয়ে হেঁটে না যাওয়া ইত্যাদি শিক্ষা তারা এই সময় পায়। খাওয়ার সময় কাউকে তাড়া দেওয়া হয় না, যে যার স্বচ্ছন্দগতিতে ভোজন সমাধা করে। বাড়ীতে বয়স্কদের সঙ্গে একসাথে খেতে বসলে শিশুদের মহা হাঙ্গামায় পড়তে হয়। নার্সারিতে লক্ষ্য রাখা হয়, যেন কেউ সে রকম মুস্কিলে না পড়ে। খাওয়া শেষ হলে শিশুরা নিজের নিজের কৌটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রেখে, হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে শুতে যায়। এখানেও কাজের পালা আছে। দু'টি শিশু মাদুরগুলি ঝেড়ে ঘরে তুলে রাখে, প্রয়োজন হলে রোদে বিছিয়ে দেয় ; খাওয়ার জায়গা ঝাঁট দেয়, দুধ কি জল পড়ে থাকলে পরিষ্কার করে নেয়। তারপর সকলে মিলে ঘুমাতে যায়।

১।০—২।৩০ : এই সময় ৪ থেকে কম বয়সের শিশুরা সকলেই ঘুমায়। শীতের দিনে ওরা গাছের নীচে মাদুর পেতে ঘুমায়, গরমের দিনে ঘরেই ঘুমায়। যতদূর সম্ভব তাদের দূরে দূরে শোওয়ানো হয়। ৪ বছরের বেশী বয়সেরও কেউ যদি ঘুমাতে চায়, এই সময় তারাও ঘুমিয়ে নেয়। যারা একেবারেই ঘুমায় না বা খুব কান্নাকাটি করে, তাদের শান্ত হয়ে ছবির বই দেখার কিংবা ছবি আঁকবার, অথবা নিজে নিজে খেলনা নিয়ে খেলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই সময় সমস্ত স্কুল বাড়িটিতে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। শিশুরাও বোঝে যে, এই সময় কোন রকম চেঁচামেচি বা গোলমাল করা, এমন কি চেঁচিয়ে কথা বলাও চলবে না। ঘুমন্ত শিশুকে কখনও আচম্‌কা ঘুম থেকে ওঠানো হয় না

এবং যতদূর সম্ভব তারা যেন আরামে ও নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারে তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক শনি ও রবিবারে ওদের শোওয়ার মাদুরগুলি রোদে দিয়ে সেগুলিতে "D.D.T." পাউডার ছড়িয়ে রোগ ও ব্যাধির বীজাণুমুক্ত করা হয়।

২।৩০—৩ঃ বেলা আড়াইটার পর হতেই শিশুরা একে একে ঘুম থেকে জেগে উঠতে সুরু করে। প্রত্যেকেই কিছুক্ষণ মাদুরের ওপর বসে ঘুমের আমেজ উপভোগ করে। তারপর শৌচাগারে গিয়ে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে আসার পর নিজের নিজের জুতা পরে নেয়। পরে আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়ায়, জামার বোতাম লাগায়। তারপর শিক্ষিকাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ওরা বাড়ী যায়।

নার্সারি স্কুলের এই কার্য্যপদ্ধতি থেকে বেশ দেখা যায় যে, শিশুরা সারাদিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচুর সুযোগ লাভ করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত আহারনিদ্রা এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মঙ্গলপ্রদ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের স্বাস্থ্যনীতি ও সহজ সৌন্দর্য্যবোধ লাভ করে।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একযোগে একাঙ্গীভূত। যখন মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও রুচিবোধের অভাব হয়, তখনই তারা অপরিষ্কার থাকতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। এখানে, অর্থের অভাব কোন প্রশ্নই নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খ'ড়ো ঘরে মানুষ, এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না। আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে।" (২৭) তিনি আরও বলেছেন—"দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড় বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে, সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া

(২৭) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষার বাহন

যাইবে।" (২৮) সাঁওতাল ও অপরাপর আদিবাসীদের গৃহে জিনিষের আড়ম্বরে দেওয়ালের গায়ে ঝুল ঝোলে না, মাকড়সা তাদের ঘরে দেওয়ালের কোণে জাল বোনে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সৌন্দর্য্যজ্ঞান কি ভাবে যুক্ত, সাঁওতাল-দিগের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনযাত্রাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সুন্দরের এই মহান আদর্শ নিয়েই শিশুর শিক্ষাদান সুরু করতে হবে, তার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে, তার স্বভাবকে সুন্দর করতে হবে, মধুর করতে হবে তার ব্যবহার। শিশুর জীবনে যেন কোথাও অস্বাস্থ্যের, অসুন্দরের বা অশান্তির ছায়া মাত্রও না থাকে, আমাদের এই বিষয়ে বিশেষরূপে সচেতন হতে হবে। শিশুর জীবনে থাকবে না কোন উদ্দামতা বা উন্মত্তভাব, শুধু যেন থাকে স্নিগ্ধ, পবিত্র শান্তি—সৌন্দর্য্যের উৎস পথেই যা' নেমে এসেছে ধরাতলে মানুষের মনে। শিশুর এই সৌন্দর্য্যপ্রীতি, তার শৈশব-লীলাতেই যেন নিঃশেষিত না হয়, শুধু যৌবনের আগ্রহেই যেন অবসন্ন না হয়,—জীবনের চিরন্তন ও চিরকালের আদর্শ-শিক্ষা তার সমগ্র জীবন পথই যেন উজ্জ্বল করে—শিক্ষার এই তো শাশ্বত আদর্শ।

শরীর ও মনকে একান্তরূপে সংযত করে এবং নিরাসক্ত, প্রশান্ত মনে অনন্ত সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করতে হলে—বিরাট সাধনার প্রয়োজন। জন্ম থেকে এই সাধনা যদি সুরু না হয়, মানুষ কখনও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ লাভ করতে পারে না। এই সাধনায় চিত্তবৃত্তির সুকোমল প্রকাশ-সম্ভাবনা কোথায়ও যেন সঙ্কুচিত বা অবলুপ্ত না হয়, প্রথম থেকেই সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বিলাসিতা তো শুধু ভোগীর ভোগোন্মাদনা মাত্র—সৌন্দর্য্যরসবোধ হলো একটি প্রবল ও প্রকৃত শক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই মানুষ স্বার্থের ক্ষতিকর সংঘাত থেকে আপনাকে ও অপরকে রক্ষা করতে পারে।

শিশু যখন প্রথম ধরণীর বুকে আসে, সে তখন সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ ও পবিত্র। ধীরে ধীরে সে চিনতে শেখে জগত এবং ধাপে ধাপে সে এগিয়ে চলে জীবনের পথে। এ সময় তাকে যে সকল ব্যবহার ও নিয়মে অভ্যস্ত করান হয়, তাই হয় তার জীবনের মূল ভিত্তি। এই জন্যই যাতে শিশুর জন্মের পরক্ষণ হতেই তার গৃহ-পরিস্থিতি, তার জীবন-পরিবেশ সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন হয়, তার

---

(২৮) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষার বাহন

জন্য ব্যবস্থাবিধান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশ হয় স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্য্যবোধে; এবং এই সৌন্দর্য্যবোধের অপ্রতিহত বিকাশের জন্য নার্সারি স্কুলে যেরূপ সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের সমাবেশ করা হয়, সামান্য গৃহস্থের পক্ষে তা' অসম্ভব। চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, ছন্দময় অঙ্গভঙ্গিমা, আলপনা, ফুল সাজানো ইত্যাদির দ্বারা পৃথিবীর রূপ রস ও গন্ধের সহিত সে পরিচিত হয়। স্নিগ্ধ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ চিনতে শেখে, এবং ক্রমে সে যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ভগবানের সত্বাকে উপলব্ধি করে। এমনি করেই শিশুর আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন সম্ভব।

নার্সারি স্কুলে শিশুর স্নানাদি এবং মলমূত্র ত্যাগের কাজগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় শিক্ষিকার সতর্কতামূলক কর্ত্তব্যের মধ্যে। কেননা, এইগুলির গোলমাল হলে কেবল যে শিশুসকলের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে তা নয়, মনও ওদের বিকার-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু মলমূত্র ত্যাগ করতে ভয় পায়। একদিন দেখা গেল, বিশ্বনাথ কয়েকটি কাঠের টুকরা খাটের উপর শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, ঐ কাঠের টুকরাগুলি তখন তার ছেলেমেয়ে। কিছুক্ষণ পরে একটি কাঠের টুকরো উঠিয়ে খুব জোরে মাটিতে ঠুকে বলল, "দুষ্টু ছেলে—আবার বিছানা ভিজিয়েছ।" এই ছেলেটি মাতৃহীন, এবং বাড়ীতে তার বিমাতা তাকে বিশেষ যত্ন করতেন না। ছেলেটি কোনমতেই ঠিক সময় পায়খানায় যেতে চাইতো না, অথচ যখন তখন জামাকাপড় ভিজিয়ে ফেলতো। কিছু দিন লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, ছেলেটি মূত্রত্যাগ করতে ভয় পায়। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে জানা গেল যে, তার মূত্রাশয় সুস্থ নয়, এবং অন্যান্য নানা কারণে মূত্রত্যাগ করতে তার কষ্ট হয়। চিকিৎসার গুণে ছেলেটি এখন নিরাময় হয়েছে। হঠাৎ কাপড়-জামা যদি নষ্ট হয়ে যায়, শিশুকে তখন কোন মতেই দুষ্ট মনে করা উচিত নয়। এসব বিষয়ে শিশুকে যন্ত্রণা দিলে তার ভয়প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এবং কোন কারণে ভীত হয়ে উঠলে বা নিরাপদ বোধ না করলে, শিশু তার নিজের শরীরের সংযম হারিয়ে ফেলে।

স্নানের ঘর ও পায়খানা, স্কুলের ক্লাস-ঘরের মত পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়া উচিত। শিশুর ব্যবহারের জিনিষপত্রাদি তার ব্যবহারোপযোগী হওয়া চাই, যাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে নিজের কাজ করতে পারে। শিক্ষিকা অবশ্য নিকটেই

থাকবেন, এবং যখন শিশুর সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন তাকে তিনি সাহায্য করবেন। স্নানের জল পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্নানের পূর্ব্বে শিশু দেহে তৈলমর্দ্দন করতে শিখবে ও স্নানের সময় তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর মার্জ্জনা করবে। স্নানে দেহের রক্ত চলাচল ভাল ভাবে সক্রিয় হয় এবং শিরা-উপশিরাগুলি তখন মৃদু উত্তেজনা লাভ করে, তাই শরীরে ও মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়, দেহ স্নিগ্ধ হয়। সেইজন্য প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শীতল জলে স্নান করতে শিশুকে উৎসাহিত করা উচিত, তবে হিমশীতল জলে শিশুকে স্নান করান উচিত নয়। শীতকালে, কিংবা দেহ দুর্ব্বল থাকলে, শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করান উচিত। রৌদ্রে খেলাধূলা করার পর, নার্সারি স্কুলে শিশুকে কখন জল পান করতে দেওয়া হয় না। এই সু-অভ্যাসটি শিশুদের যত্ন সহকারে আয়ত্ত করান হয়। মলমূত্রত্যাগের পর রীতিমত পরিষ্কার হতে শেখাও একটি বিশেষ কাজ। এই সব কাজে শিক্ষিকা ও পিতামাতা শিশুকে যেন যথাযোগ্য সাহায্য করতে কখন কুণ্ঠিত না হন। কিন্তু যখনই দেখবেন যে শিশু সুন্দররূপে নিজের কাজ নিজে করতে পারে, তখনই তাকে স্বাবলম্বী হতে দেওয়া উচিত।

শিশুর পোষাক ও পরিচ্ছদ—পোষাক ও পরিচ্ছদের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, এতে শরীরের উত্তাপ সমানভাবে রক্ষিত হয়। এইজন্যই লোকে উপযুক্ত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করে। দ্বিতীয়তঃ দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা এর আর একটি উদ্দেশ্য। দেশ, প্রথা, অভ্যাস ও বয়সের তারতম্য অনুসারে পোষাক-পরিচ্ছদেরও তারতম্য দেখা যায়।

শিশুর পরিচ্ছদ সব সময় হাল্‌কা রঙের, ঢিলা ও নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কাপড় দিয়ে তাদের জামা তৈয়ারী করা হবে, সে কাপড়টি যেন শরীরের ঘাম প্রভৃতি শোষণ করতে পারে। এইরূপে শরীরকে বিষমুক্ত রাখা, পোষাকের আর একটি বিশেষ কাজ। শিশুদের কাপড়জামাতে কখনও সেফ্‌টি-পিন্ (safety-pin) বা অন্য কোন রকমের 'পিন্' লাগান উচিত নয়। সাধারণ গোছের ফিতা সেলাই করে, ফাঁস লাগানই ভাল। ফাঁসগুলি যদি বুকের দিকে থাকে তাহলে শিশুরা ক্রমশঃই নিজে নিজেই তা' খুলতে ও বাঁধতে শিখবে। দু'বেলাই শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ কেচে পরিষ্কার করতে হবে। নার্সারিতে খেলবার সময় জামা-কাপড় বেশী ময়লা হয় বলে, একটি বহির্বাস (apron) পরিয়ে দিলে ভাল হয়।

শীতপ্রধান দেশে শিশুকে যেভাবে কাপড়জামা পরাতে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সেরূপ প্রয়োজন হয় না। শিশুর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ—৯৮'৪° (ডিগ্রি) থেকে ৯৯° (ডিগ্রি) যেন রক্ষিত হয়—এরূপভাবে শীত বা গ্রীষ্মকালে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরাতে হবে। খালি গায়ে পশমের জামা পরান কখনও উচিত নয়। মহার্ঘ্য ও জমকালো দু'একটি পোষাক অপেক্ষা—অধিক সংখ্যক পরিষ্কার, নরম, সাধারণ কাপড়জামা প্রস্তুত করাই ভাল। শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে জামাকাপড় জুগিয়ে উঠা, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যে সব কাপড় সহজে কাচা যায়, বার বার বদলান যায়, সুলভ অথচ যা' রুচিসঙ্গত এবং সুশ্রী—শিশুর পক্ষে তাই-ই প্রশস্ত।

শিশুর আহার ও আহার্য্য—(১) শারীরিক ক্ষয় নিবারণ, দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিসাধন, (২) কর্ম্মশক্তির উৎপাদন ও দেহের তাপ-সংরক্ষণ এবং (৩) রোগের প্রতিষেধ, এই তিনটি কারণেই—শিশুর খাদ্যের প্রয়োজন। (২৯) এই তিনটি গুণসম্পন্ন মূলতঃ 'প্রোটিন্' (protein), কার্বোহাইড্রেট্ (carbohydrate), তৈলাদি, ধাতব লবণ, ভাইটামিন্ জাতীয় প্রধান উপাদানসমন্বিত খাদ্যই "সুসমঞ্জস" বলে পরিগণিত হয়। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, চাল, ডাল, আটা, সুজি, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, শাক-সব্‌জি প্রভৃতি শিশুর প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকার অন্তর্গত হলেও, প্রস্তুত করবার প্রণালী অনুসারে এগুলি একদিকে যেমন সুপথ্য বলে গণ্য হয়, আবার অপরপক্ষে দুষ্পাচ্য কুপথ্যেও পরিণত হয়। শিশুর খাদ্য সর্ব্বদাই পুষ্টিকর ও লঘু হওয়া উচিত। প্রকৃতি-দত্ত আহারই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত আহার, সেইজন্য জীবনের প্রথম নয় মাস মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রকৃষ্টতম খাদ্য। নয় মাস বয়সের পরই শিশুকে অল্প অল্প করে মাতৃদুগ্ধ ছাড়িয়ে ক্রমশঃ অন্যান্য আহার্য্য দিতে আরম্ভ করা উচিত। অন্যান্য লঘু খাদ্যের সঙ্গে সারাদিনে সে তিন পোয়া দুধ পান করতে পারে। ১ বৎসর হতে ১½ বৎসরের শিশু ভাত, আলু, ডিমের কুসুম, মাছ, ছানা, মাখন, আঁশহীন সব্‌জিও কমপক্ষে ½ সের থেকে ৩ পোয়া খাবে। ১½ বৎসর হতে ৩ বৎসরের শিশু রুটি, মাংসের 'ষ্টু' (stew) ও নানাবিধ ফল খেতে আরম্ভ করতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ ½ সের দুধ পান করবে। এই হলো শিশুর মোটামুটি খাবার হিসাব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে

(২৯) ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল—রোগীর পথ্য—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—শিশুর খাদ্য ও পথ্য।

মনে রাখতে হবে যে, শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যকিরণ অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য। বালার্করশ্মি শরীরে খাদ্যের মতই কাজ করে। প্রাতঃকালীন সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা ভাইটামিন্ 'ডি' (Vitamin 'D') অথবা রিকেট্স (rickets) ব্যাধির প্রতিষেধক ভাইটামিন, দেহের ত্বকেই সঞ্জাত হয় এবং তাতেই অনেকটা "কড্লিভার অয়েল্" (Cod-liver Oil) গ্রহণের মত কাজ করে। সুতরাং প্রত্যেক শিশুকেই, সকালে অন্ততঃ একঘণ্টা কাল, রোদে রাখা উচিত। পরিমিত ও যথোপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে যদি বিশুদ্ধ বায়ু ও রৌদ্র সেবনের রীতিমত ব্যবস্থা করা যায়, আমাদের দেশে শিশুগণের অকাল মৃত্যুর হার বহুলাংশেই কমে যাবে এবং জনসাধারণেরও স্বাস্থ্যোন্নতি হবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আজকাল সামান্য, সাধারণ খাদ্যই এমন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য যে, যে সব আহার্য্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যয় বহন করা প্রায় প্রত্যেকের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু ঐ অজুহাতে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না, ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে অবলুপ্তি হতে বাঁচাতে হলে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভাব-অভিযোগের মধ্যেও শিশুর আহার ও আহার্য্যের সুব্যবস্থা করতেই হবে। খাদ্যদ্রব্যের অভাব এবং অপ্রতুলতা সত্য বটে, কিন্তু যা' পাওয়া যায় তাও বিশুদ্ধ নয় বলেই আজ আমরা মরণের মুখে দ্রুততর এগিয়ে চলেছি। আমাদের উদাসীনতা ও অজ্ঞতার ফলেই আমাদের এজন্য নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু সে সবেরই প্রতিবিধান তো আমাদেরই হাতে। যেটুকু দুধও শিশুসন্তানের মুখে দেওয়া যায়, তা' যেন সম্পূর্ণ খাঁটি হয় এবং বীজাণুমুক্ত হয়, সেজন্য প্রয়োজন সচেষ্ট সতর্কতা ও উদ্যোগপরায়ণ কর্ম্মতৎপরতা—অর্থসঙ্গতির প্রাচুর্য্যের প্রশ্ন এখানে বড় নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে গরুর দুধ খাওয়ানো হবে সেই গরুটি যেন নীরোগ হয়। যদি সম্ভব হয়, গৃহপালিত গাভীর দুধই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। দুগ্ধবতী গাভী যাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা ও তাজা ঘাস খেতে পায়, এবং মাঠে, দিনের রৌদ্রে, বেশ স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে পারে—সে বিষয়েও লক্ষ্য রেখে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। যে-সব গরু কেবল শুক্নো ঘাস খায় অথবা সারাদিন ঘরের মধ্যে বাঁধা থাকে, তাদের দুধে 'রিকেট্স'-প্রতিষেধক ভাইটামিন অতি অল্পই থাকে। আজকাল আমাদের দেশে, প্রায়

ঘরে ঘরেই, শিশুসন্তানদের টিনের দুধ খাওয়াবার রেওয়াজ যেন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই সব বিদেশী খাদ্যে আমাদের শিশুদের যে কত বড় সর্ব্বনাশ হয়, আমরা তা ভেবেও দেখি না! দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোটি কোটি টাকা এইভাবেই আমরা বিদেশে পাঠিয়ে রাজকোষই যে শুধু রিক্ত করি তা' নয়, শিশুরাও পায় এই থেকেই উদরাময় (green diarrhœa), যকৃতের রোগ, রিকেট্স, স্প্যাজ্মোফাইলা (spazmophylæ) প্রভৃতি ব্যাধি। কাজেই, উভয় দিকেই আমাদের নিদারুণ ক্ষতি হয়। সুস্থ শিশুর পক্ষে কোনও রকম "পেটেণ্ট" খাদ্য ভাল নয়, এই কথাটি কখনও ভুলে থাকা উচিত নয়। মায়ের দুধ এবং গরুর খাঁটি দুধই শিশুদের উপযুক্ত খাদ্য, এবং এর কোনটাই আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়। আমরা যদি যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে ও একযোগে খাঁটি খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করি তাহলে এ সকল সমস্যা যে ক্রমশঃই কেটে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নাই।

নার্সারি স্কুলের একটি প্রাথমিক কর্ত্তব্যই হলো—উপযুক্ত আহার্য্যের যে সকল উপাদান শিশুরা সাধারণতঃ ঘরে পায় না, এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের সেই অভাব পরিপূরণ করে দেওয়া। বস্ত্রের অভাব এদেশে শিশুর পক্ষে তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। বাস্তবিকই, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আজ সমস্ত সমাজ-দেহই যেন ম্রিয়মান, অবসন্ন ও মুমূর্ষুপ্রায়। খাদ্যের অভাবে আমাদের কর্ম্মশক্তি অন্তর্হিত হয়ে পড়েছে, সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত কমে চলেছে, রোগ-প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে ও পুষ্টির অভাবে ব্যাধি-গ্রস্ত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতই স্ফীত হয়ে উঠছে এবং ফলে সমস্ত সমাজই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে চরম বিপর্য্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যে নার্সারি স্কুলটির কথা বলা হয়েছে, সেখানে ৬০ জন শিশুসন্তানের লালন পালন ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা আছে। শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই শিশুদের পরীক্ষা করেন এবং বলেন যে এদের মধ্যে মাত্র ৬ জনকেই "বেশ সুপুষ্ট" বলে স্বীকার করা চলে। এই ৬টি শিশুই উচ্চ-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান। অপর ৫৪টি শিশুকে কোন-না-কোন শিশুসুলভ ব্যাধিতে আক্রান্ত অথবা অন্য কারণে অপরিপুষ্ট দেখে তাদের পিতামাতাকে যথাযথ সাবধান হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের হিতৈষী এবং শিশুদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী কতিপয় সুহৃদবর্গের কৃপায় আমরা এখনও প্রত্যেকটি

শিশুকে দৈনিক ½ পোয়া পরিমাণ গরুর খাঁটি দুধ দিই, এবং শীতকালে সকলকে এক চামচ 'কড্লিভার অয়েল্' (Cod liver oil)-ও দেওয়া গেছে। ফলে, শিশুগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি ক্রমশঃ দেখা দিয়েছে।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অন্যতম অভাব ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে টাট্কা শাক সব্জি ও ফলের সরবরাহ হয় না বলে। পশ্চিমবঙ্গে জমি বা জল, কোনটারই অভাব নেই ; অথচ, অকর্ম্মণ্যতা এবং অজ্ঞতা বশতঃই এই সব জমির সদ্ব্যবহার হয় না।

আমাদের নার্সারি স্কুলে, অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত শিশুগণ প্রত্যেকেই দৈনিক অন্ততঃ একটি করে পাকা 'টোম্যাটো' (বিলিতি বেগুণ) খেতে পায়। এ ছাড়া ফসল অনুযায়ী, ভাল মর্ত্তমান কলা, ভুট্টা, মিষ্টি আলু সিদ্ধ করে প্রায়ই ওদের সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। নিজহাতে কুমড়া, বেগুন, মুলা, পালংশাক ইত্যাদির চাষ করে প্রতি বৎসরই তিন চার বার খুব সমারোহ করে শিশুগণ রান্না করে খায়। সব্জি ও ফল উৎপাদনের ব্যাপারে শিক্ষিকা ও শিশুর দল সবাই মিলে নিয়মিতরূপে যদি সম্বৎসর উদ্যোগী থাকেন, তবে সারা বৎসরই শিশুদের কিছু না কিছু টাট্কা জিনিষ খেতে দিতে পারা যায়। এইভাবে শিশুগণের পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি কিছুটা পরিপূরণ করা যায়।

শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হলে খাদ্যের অপচয় নিবারণ, উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, সংরক্ষণ ও উপযুক্ত রন্ধনপ্রণালীও আমাদের গৃহস্থ পরিবারের সকলকেই শিখতে হবে। এখানে আবার দেখি শিশু ও বয়স্কের শিক্ষায় কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঢেঁকিছাঁটা চাল, চিঁড়া, নারিকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি খেলে শরীরে যে পুষ্টিলাভ হয়, কলে-ছাঁটা চালে তা' হয় না। অনাবৃত পাত্রে ভাত, ডাল পাক করার ফলে ঐ সব আহার্য্যের খাদ্যপ্রাণ জলের সঙ্গে মিশে বাষ্পের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়। ভাতের ফেন, তরকারী সিদ্ধ করা জল, এ সবও ফেলে দেওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে অতি সাধারণ জ্ঞানের অভাব, এবং সংস্কার বা অভ্যাসগত বিপরীত রুচির জন্য, আমরা এইভাবে আহার্য্যের সার বস্তুই অনেক ক্ষেত্রে অপচয় করি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে এই সকল বিষয়ে সম্যক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

কাজকর্ম্ম সুসম্পন্ন করতে হলে সুস্থ, সবলদেহ ও পূর্ণবিকশিত এবং প্রফুল্ল মনের প্রয়োজন। এইজন্যই জাতিগঠনক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য—শিশুকে দেহ এবং মনে সুস্থভাবে বিকশিত করে তোলা। স্বাস্থ্যনীতি আজ সকল দেশেই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য ও প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও বিপদের মধ্যেও ইংলণ্ডের শিক্ষাপর্ষদ (Board of Education) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। এর বহু পূর্ব্ব হতেই ইংলণ্ডে বিদ্যার্থিগণের বিধিমত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী ও জনসাধারণ সেই ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলে মনে করেননি। এই বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে দাবী করেন যে,—

> 'It is proposed, therefore, to make it the duty of the Local Education Authorities to provide for the medical inspection of all children and young persons attending grant-aided schools and to take such steps as may be necessary to ensure that those found to be in need of treatment, other than domiciliary treatment, shall receive it. No charge will be made for medical treatment for any of these children or young people."(১০)

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যে সব শিশু ও তরুণবয়স্ক বালকবালিকাগণের সমাগম হয় তাদের সকলের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন স্থানীয় শিক্ষণ-কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্যকর্ত্তব্য। পারিবারিক চিকিৎসামূলক ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য রোগ ও ব্যাধির চিকিৎসা ব্যক্তিগতভাবে এই শিশুসন্তান ও তরুণবয়স্ক বালকবালিকাগণের কাহারও প্রয়োজন হইলে তাহার যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিধান সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হউক এই প্রস্তাব করা হইল। এবং এই সকল শিশু ও তরুণবয়স্কের এইরূপ চিকিৎসাদান সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে করিতে হইবে, তাহাও স্বীকৃত হইল।

(১০) (ক) Education in England and Wales from 1880—1944 (relevant chapters)
(খ) Education Act of 1944—Dent
(গ) Ministry of Education, England—Pamphlet No. 2.

বিদ্যালয়ে শিশু ও বালকবালিকাগণের জন্য খাদ্য ও দুগ্ধ সম্পর্কেও তাঁরা ব্যবস্থা করেন, যে—

"No less important is the proper feeding of the children. In its origin the power entrusted to Local Education Authorities to provide school meals was designed to prevent the value of education being lost through the inability of children to profit from it through insufficiency of food. The milk in school scheme, whereby children can get milk daily at a cost of half penny for one third of a pint, or free in cases of poverty, has also been very valuable in underwriting the physical well-being of the children. The extension of both these services will follow from the conversion of the present power of authorities to provide school meals and milk into a duty".

অর্থাৎ, "শিশুসন্তানদের যথাযথভাবে আহার্য্য দানের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের উপর বিদ্যালয়ে আহার্য্যদানের ব্যবস্থা-করণের ক্ষমতা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাহাতে আহার্য্যের অপ্রতুলতা হেতু শিশুশিক্ষার মৌলিক উপকারগুলি ব্যাহত না হয়। বিদ্যালয়ে দুগ্ধপানের ব্যবস্থাটির দ্বারা শিশুরা প্রত্যেকেই "আধ পেনি" (বা প্রায় দুই পয়সা) দিয়া ⅓ "পাইণ্ট" (বা ১ পোয়ার মত) দুগ্ধ পায় এবং নিতান্ত নিঃস্বের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যেও ঐ পরিমাণ দুগ্ধ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে আহার্য্য এবং দুগ্ধ সরবরাহের ক্ষমতাটি এখন কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবশ্যকর্ত্তব্যে পরিণত করায়, উপরোক্ত মূল উদ্দেশ্য স্বভাবতঃই বিস্তার লাভ করিবে এবং সুফলপ্রসূ হইবে।"

উপযুক্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজন সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। যথা,—

"There are still many children, especially in large towns, who are inadequately clothed or shod and voluntary funds no longer suffice to meet this need. Local Education Authorities will, therefore, be empowered to supply or aid the supply of clothing and footwear for children and young persons attending grant-aided schools (nursery, primary, secondary and special schools), provided they recover the cost in whole or in part from those parents who can afford to pay."

অর্থাৎ, "অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ বড় সহরে, দেখা যায় যে, শিশুদের পরিচ্ছদ যথোপযুক্ত নয়, পরণে জুতাও ঠিক মত নাই। চাঁদা তুলিয়া এই প্রয়োজন মিটাইবার সম্ভাবনা এখন নাই। সুতরাং স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে যে সকল শিশু ও তরুণ বালকবালিকা সমাগত হয় তাহাদিগকে তাঁহারা যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও জুতা কিনিয়া দিতে পারেন; কিন্তু এই সম্পর্কে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা অন্ততঃ আংশিকভাবেও সঙ্গতিপন্ন পিতামাতাদের নিকট আদায় করিয়া লইতে হইবে।"

রাজকোষের অর্থাভাবের জন্য শিশুশিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় উপস্থিত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু যদি কোনও কারণবশতঃ আমাদিগের শিশুসন্তানগুলির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ রাষ্ট্রগতভাবে দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে আমাদেরও নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে যার যা' সাধ্য ও সামর্থ্য আছে তা' একত্রিত করে সমবেতভাবে যদি আমরা প্রতি সহরের প্রতি বস্তিতে, প্রতি গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়ায়, উদ্যোগপরায়ণ হয়ে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে সচেষ্ট হই, তবে আমাদের চরম দুর্দ্দশা ও অচলাবস্থার অবসান খুবই সম্ভব এবং সে কাজে সাফল্যও আমাদের অনিবার্য্য—এমনতর আশা পোষণ করা অসঙ্গত নয়।

শিশুর বিশ্রাম ও নিদ্রা ঃ মানুষের জীবনে যেমন অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রয়োজন, শরীররক্ষার জন্যও সেইরূপ বিশ্রাম ও পরিশ্রমের সুসংযত ছন্দের প্রয়োজন আছে। শরীরের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এবং উপযুক্ত পুষ্টির জন্য শিশুর পক্ষে প্রচুর বিশ্রামের প্রয়োজন। শিশু সব সময়েই শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে এবং চলা ফেরা, দৌড়ঝাঁপ করে' তার শরীরের যে ক্ষয় হয় বিশ্রামের দ্বারাই তার পরিপূরণ হয়। পরিণতবয়স্ক মানব অবসর সময়ে নানাবিধ চিত্তাকর্ষক কাজের দ্বারা বিশ্রাম ও অবসর ভোগের ব্যবস্থা করে, কিন্তু শিশুর জীবনে নিদ্রাই তার প্রকৃষ্টতম বিকাশের উপায়। সাধারণতঃ, ১ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুকে ১৪ ঘণ্টা ঘুমাতে দেওয়া উচিত; এবং ৪ থেকে ৭ বছর বয়সের বালকবালিকাগণ ১২ ঘণ্টা ঘুমালে তাদের সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ হয়। শিশুরা কখনও চুপ করে শুয়ে বা বসে থেকে বিশ্রাম উপভোগ করতে পারে না। সেইজন্যই নার্সারি স্কুলে ওদের অন্ততঃ ১ থেকে ১½ ঘণ্টা কাল নিদ্রার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

শৈশব হতে যৌবনোদ্গম্ পর্য্যন্ত শিশুদেহের দ্রুত বৃদ্ধির সময়। এই সময়ে প্রচুর সুনিদ্রার প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুরা মুক্ত বাতাসে ঘুমাতে পায় না, কারণ সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে দরজা জানালার ব্যবস্থা এমন নয় যে অবাধে মুক্তবায়ু চলাচল করতে পারে। এ ছাড়া পিতামাতার অজ্ঞতা এবং পারিবারিক পরিবেশের অন্যান্য নানা অসুবিধার জন্যও শিশুরা গভীরভাবে নিদ্রা যেতে পারে না। যেমন, আমাদের ৩ বছরের পল্টু। ওর বাবা একটি খুব বড় সরকারী অফিস-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। ঐ বাড়ীরই দুটি মাত্র কামরায় পল্টুর বাবা সপরিবারে থাকেন। পল্টুরা মা, বাবা, ভাইবোন নিয়ে সবসমেত মোট ৭ জন। দেখা গেল, পল্টু রোজ সকাল ১০টায় নার্সারিতে এসেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং প্রায় বেলা ১-৩০ সময়ে উঠে জলখাবার খায়। এক সপ্তাহ এই রকম লক্ষ্য করার পর, পল্টুর মার কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে, পল্টু রোজই রাত্রি সাড়ে এগারোটার আগে খায় না এবং সকাল ৬টার মধ্যেই উঠে পড়ে। কাজেই এই শিশুটির পক্ষে নার্সারিতে এসেই ঘুমিয়ে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আর একটি উদাহরণ দেওয়া চলে—আরতির কথা। আরতির বয়স এখন ৫ বৎসর। ওরা ছয়টি বোন, বড়টির বয়স এখন ১১ বৎসর, ছোটটির ২ বৎসর। পিতার আয় মাসিক ১৫০৲; তিনি ছোট ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। আরতি ৩ বৎসর বয়সে আমাদের নার্সারি স্কুলে আসে। এই ২ বৎসরের মধ্যে আরতির দুইবার 'টাইফয়েড্' (typhoid) হয়েছে। সেও রোজ সকালে স্কুলে এসেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, ওরা সবাই একটি ঘরে ঘুমায় এবং সেই ঘরটিতে একটি মাত্র জানালা আছে। তাদেরও বাড়ীতে রান্না, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে রাত বারটা হয়ে যায়। কাজেই এই শিশুটিও কোনও রাতেই আরাম করে গভীরভাবে ঘুমাতে পায় না।

ভোরে ঘুম থেকে জেগে অবধি, শিশু অফুরন্ত প্রাণাবেগে অবিরত চঞ্চল হয়ে অঙ্গ-চালনা করে; এবং এইজন্য তার দেহের স্ফূর্ত্তি ও শক্তি ক্রমাগতই ক্ষয় হয়, তাই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উপযুক্ত ভাবে নিদ্রার অবসর ও সুবিধা না দিলে শিশুর ক্লান্তি দূর হয় না, এবং ফলে তার দেহ সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রেই আছে ছন্দ ও গতির স্বাভাবিক নিয়ম। এই ছন্দ কাটলেই, বিপদ। সেইজন্যই স্বাস্থ্যনীতির প্রথম কথাই এই যে, আমাদের শরীর-

বিকাশে বিশ্রাম ও পরিশ্রমের যে ছন্দ তাতে সমতা বজায় রাখতে হবে। বিশেষতঃ, মস্তিষ্ক যেখানে সক্রিয়, ঘুমের প্রয়োজন হয় খুব বেশী। জাগ্রত অবস্থায় দেহযন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পালা করে একটু-আধটু বিশ্রাম করে নেয়, কিন্তু সজ্ঞান ও জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের কিছুমাত্র বিশ্রাম হয় না। সুতরাং মস্তিষ্কের সচল ও সুস্থ পরিচালনার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন।

ছোট শিশু একাদিক্রমে ১৫ মিনিট থেকে ½ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে পারে না। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করার শক্তি, অভ্যাসের ও কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার শক্তি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে। এইজন্য নার্সারি স্কুলের কর্ম্মপদ্ধতি এমন ভাবে রচিত হবে যাতে শিশুরা কিছুটা কাজ করার পরেই বিশ্রাম পায়। বিশ্রামের এই ক্ষণটিকে সময়ের অপচয় মনে করা ঠিক হবে না। কোন কাজ আয়ত্ত করতে হলে বিভিন্ন পেশী ও মস্তিষ্ক-কোষের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার প্রয়োজন। ঠিকভাবে কাজ করতে করভে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেগুলি শিথিল হওয়াতে আর আজ্ঞাবহ থাকে না। সেইজন্যই বিরামের ও অবকাশের প্রয়োজন। নতুবা মস্তিষ্কের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয় রক্ষা হয় না।

শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ নার্সারি স্কুলে নিয়মিতভাবে শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। প্রতিদিন শিক্ষিকার, কিংবা যে-স্কুলে 'নার্স' বা পরিচর্য্যাকারিণীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেখানে, 'নার্স'-এর সাহায্যে শিশুগণের নিয়মিতরূপে চোখ, কান, ত্বক্, দাঁত, নাক, চুল পরিষ্কার করা হয়। সহসা কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হলে শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ সাবধান হন এবং বসন্তের টিকা, ও টাইফয়েড্, ডিপ্থিরিয়া বা কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ঔষধাদির জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হওয়াতেই ব্যাধির সঞ্চার হয় এবং তাই থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহারে ও জীবন-ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। অসুস্থ লোকের সঙ্গে একপাত্রে খাওয়া, কাছে ঘেঁসে বসা, শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। হাঁচি, কাশি, হাই-তোলা, ইত্যাদির সময় মুখে কাপড় বা রুমাল চাপা দেওয়া উচিত। শিশুদের এই সম্পর্কে সাবধান এবং সতর্কতামূলক অভ্যাসের শিক্ষা দেওয়া

উচিত। খাদ্যদ্রব্য ও জল পরিষ্কার রাখা, এবং মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের মাধ্যমে রোগের ক্রমবিস্তারের আশঙ্কা সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। রোগ দেখা দিলে তার প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার অপেক্ষা রোগের আক্রমণ যেন আদৌ না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। সেইজন্য পায়খানা ও নর্দ্দমা সব 'ফিনাইল' দিয়ে পরিষ্কার করান উচিত এবং স্কুলে সকলের পড়ার ও কাজের ঘরগুলি ধুয়ে, মুছে, শুক্‌নো ও পরিষ্কার করে রাখতে হবে। সম্ভব হলে, "D. D. T." ছড়িয়ে চারিপাশ পরিষ্কার করান খুবই ভাল।

এইসব ছাড়াও প্রত্যেক শিশু-শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর অন্ততঃ তিনবার, নিয়মিতভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান উচিত। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় পিতামাতা ও অভিভাবকগণের উপস্থিতি সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কারণ, এইভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রধান উপকারিতা এবং উদ্দেশ্য এই যে, শৈশবে শিশুগণ যে সব রোগের প্রকোপাধীন হয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে যাতে সেগুলি তাদের সর্ব্বনাশের কারণ না হয়, তারই যথাকর্ত্তব্য বিধিব্যবস্থা পালনের উপায় নির্দ্ধারণ। ইংলণ্ডে "স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিস্" (School Medical Service) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে সেদেশে জাতীয় জীবনে বাস্তবিকপক্ষে যুগান্তর সাধিত হয়েছে। সেদেশেও এমন দিন ছিল যখন অধিকাংশ শিশুই ব্যাধিগ্রস্ত ও অপরিচ্ছন্ন থাকত, কিন্তু আজ সেদেশে রোগগ্রস্ত শিশু বাস্তবিকই বিরল। চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি স্বাস্থ্য-বিবরণী-পত্র (Health Card) প্রস্তুত করাতে হবে। স্বাস্থ্য-বিবরণী-পত্রের একটি অনুলিপি (১০৪ পৃষ্ঠায়) দেওয়া হলো। (৩১)

সচরাচর শিশুগণ ২ বৎসর বয়সে নার্সারি স্কুলে আসে এবং ৫ বৎসর পূর্ণ হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এই তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে অনুলিপি অনুযায়ী তাদের স্বাস্থ্যবিকাশের বিবরণী রক্ষা হলে, তাদের স্বাস্থ্যের বুনিয়াদ্ সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষিকাবৃন্দ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হবেন। পিতামাতার সম্মুখে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হলে, তাঁরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকাগণের সঙ্গে নিজ নিজ শিশু সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করে উপকৃত হবেন এবং যদি শিশুর কোন

(৩১) শিক্ষণ-ব্যবহারিকা—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার—৩৩ পৃষ্ঠা

স্বাস্থ্য-বিবরণী-পত্র

নার্সারি স্কুলের নাম ও ঠিকানা..

শিশুর নাম...বয়স .... বিভাগ............

শিশুর ঠিকানা— { অভিভাবকের নাম...
রাস্তা.......................বাড়ীর নং..
পাড়া.. }

বিষয়	১ম পরীক্ষা তারিখ	২য় পরীক্ষা তারিখ	৩য় পরীক্ষা তারিখ	বিশেষ মন্তব্য
১। সাধারণ স্বাস্থ্য				
২। ওজন (সের, বা 'পাউণ্ড')				
৩। উচ্চতা (ইঞ্চি)				
৪। কান (কান-পাকা, কান থেকে পুঁজ পড়া, ইত্যাদি)				
৫। সর্দি, কাশি				
৬। ত্বক্ (খোস, চুলকানি, প্রভৃতি)				
৭। দৃষ্টি (চোখের পরীক্ষা)				
৮। হৃৎপিণ্ড				
৯। দাঁত				
১০। অন্য কোন পীড়া				
১১। মানসিক স্থৈর্য্য				
১২। চিকিৎসকের অভিমত				
১৩। শিক্ষিকার অভিমত				
১৪। প্রধান শিক্ষিকার অভিমত				
১৫। অভিভাবকের অভিমত, জবাব এবং মন্তব্য				

রোগ বা ব্যাধি থাকে তবে তার প্রতিবিধান সম্পর্কেও বিচক্ষণ উপদেশ লাভ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুযোগ পাবেন।

শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে শিশুর শরীর স্বাভাবিক গতিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন যে সময়টুকু সে নার্সারি স্কুলে অতিবাহিত করে সেই সময়ে যাতে তার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ অব্যাহত থাকে সেই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সহায়ক বিধিব্যবস্থার প্রতি শিক্ষিকার দৃষ্টি যেন জাগ্রত থাকে। এই সূত্রে নার্সারির কার্য্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, প্রথম ঘণ্টায় স্কুলে এসেই শিশুগণ অবাধ খেলাধূলায় অতিবাহিত করে। এই সময়, যতদূর সম্ভব তাদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখা হবে, নির্দ্দেশ বা বাধা নিষেধের সৃষ্টি করে তাদের স্ফূর্ত্তিবিকাশে বাধা দেওয়া হবে না।

বেলা ১১।৩০ হতে বেলা ১২।১৫ পর্য্যন্ত শিশুরা যে সব কাজ করে, সেগুলি সম্পর্কে শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষিকা তাদের সযত্নে নির্দ্দেশ দেবেন। এর মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট কাজ হলো—ব্যায়ামের সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গ পরিচালনার ব্যবস্থা-বিধান। নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট ব্যায়ামের সাধারণতঃ ৪টি ভাগ আছে। ব্যায়ামকালে এই চারিটি দিকের প্রতি সমান লক্ষ্য রেখে যদি ব্যায়ামের পাঠ-টীকা প্রস্তুত করা হয় তবেই শিশুগণ সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বাঙ্গ পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। ব্যায়াম সম্পর্কিত পদ্ধতিটি এইরূপ: (৩২)

(ক) general activity, বা সাধারণ-ভাবে অঙ্গচালনার ব্যায়াম···	দৌড় ঝাঁপ, ইত্যাদি।
(খ) balance, বা দেহের ভারসাম্য রক্ষা···	এক পায়ে লাফান, পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে হাঁটা, ইত্যাদি।
(গ) mobility, বা সাবলীল সর্ব্বাঙ্গ-চালনা···	দেহের প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক পৃথক ভাবে ব্যায়াম।
(ঘ) agility বা মনের ক্ষিপ্রতা ও শরীরের সজীবতা সম্যকভাবে রক্ষা করতে শেখান···	নানাবিধ খেলাধূলার দ্বারা এই গুণটি আয়ত্ত করা হয়।

(৩২) **Organised Play in the Infant and Nursery School; B. M. Holmes and Marjorie G. Davies.**

নার্সারি স্কুলে ২ বৎসরের শিশুদের এই প্রণালীতে ব্যায়াম করান হয় না, কিন্তু তাদের এমন সব সরঞ্জাম দেওয়া হয় যাতে তারা সহজভাবে চলা-ফেরা করতে পারে, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে শেখে এবং কার্য্যক্রমে ক্ষিপ্রতা ও মননশীলতার অভ্যাস লাভ করে। ৩ বৎসর থেকে শিশুদের নিতান্ত সহজভাবে অর্থাৎ informally—বাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডীতে ক্রিয়াকর্ম্মের গতি আবদ্ধ না করে, নিম্নলিখিত নির্দ্দেশের অনুরূপ ব্যায়াম করান যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়েরা 'ড্রিল' (drill বা কুচ্‌কাওয়াজ) করতে পারে না। কেননা, 'ড্রিল-এর মধ্যে কল্পনাশক্তি, অনুকরণ বা অভিনয় ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশের সুযোগ থাকে না ; এবং যা থাকে, তাতে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে শিশুর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা খেলাধূলার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় এবং অতি সহজেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ওঠে।

খেলার ছলে ব্যায়ামের নির্দ্দেশ-সঙ্কেত

আদেশ	মন্তব্য
১। "বিড়ালের লেজ চেপে ধর।" "খুব জোরে দৌড়াও।" "ট্যাম্বরিন বাজলেই যে যেখানে আছ দাঁড়াও।"	১০টি শিশুর পিছনে লাল রঙের লম্বা ফিতা লাগিয়ে ওদের ছেড়ে দিলে, আর ১৫ জন মিলে তখন তাদের "লেজ" চেপে ধরতে চেষ্টা করবে। এতে ঐ মোট ২৫ জনকেই খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। এই ভাবে যথেষ্ট ব্যায়ামের পর, "ট্যাম্বরিন" (tambourine) বাজলেই, শিশুর দল যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে যাবে। বেশী দূরে দূরে থাকলে শিক্ষিকা একটু কাছে কাছে ডেকে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

আদেশ	মন্তব্য
২। "ছোট চারাগাছের মত হয়ে বস।" "খুব বড় গাছের মত হয়ে উঠে দাঁড়াও। "পায়ের পাতায় ভর দিয়ে, মাথার ওপরে তালি মারো। (আদেশের পুনরাবৃত্তি)	এতে শিশুরা শরীরের ঋজুভাব, সমতা এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখবে।
৩। "হাত ধরে গোল করে দাঁড়াও"। "হাত ছাড়।" "থলিগুলি তাড়াতাড়ি তুলে আন। "ঝুড়িতে ভর।" "ঝুড়ি খালি হয়ে গেলেই আমি জিতে যাবো, কিন্তু"।	শিক্ষিকা একটি ঝুড়িতে কয়েকটি সীমের বীজ ভরা থলি (bean bags) রাখবেন। সকলে গোল করে দাঁড়ালে সেই ঝুড়িটি বৃত্তের মাঝখানে রেখে, থলিগুলি তিনি এদিক-ওদিক, চতুর্দ্দিকে ছুঁড়ে ফেলবেন। শিশুর দল দৌড়াদৌড়ি করে থলিগুলি কুড়িয়ে এনে ঝুড়িতে ভরতে থাকবে। থলি ঝুড়িতে পড়লেই, শিক্ষিকা থলিগুলি পূর্ব্ববৎ ছুঁড়ে ফেলবেন। খেলা থামানোর আগে যদি ঝুড়ি খালি না হয়, শিক্ষিকাই "হেরে" যাবেন, শিশুরা "জিতে" যাবে।
"হাত ধরে সব "পুতুল" গোল করে দাঁড়াও, বাঘের মাসী" সাবধান !" [এই রকম ভাবে সকলে দাঁড়ালে তারপর] সব "পুতুল" "উবু হয়ে বসবে, তারপর বলবে "ছোট পুতুল", পায়ের পাতায় ভর দিয়ে	শিক্ষিকা একটি বেশ চটপটে শিশুকে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়াতে বলবেন। সেই শিশুটি তখন হলো "বাঘের মাসী।" তারপর শিক্ষিকা এবং অন্য সব শিশুরা "পুতুল" হয়ে বৃত্তের চারিদিকে দাঁড়িয়ে, সবাই মিলে এই ছড়াটি বলবে—

আদেশ	মন্তব্য
দাঁড়িয়ে বলবে “বড় পুতুল।” তারপর মাথার উপর হাত নিয়ে “তালি” দিয়ে বলবে “হাসে হা, হা।” তারপর আঙ্গুল দিয়ে “বাঘের	“ছোট পুতুল, বড় পুতুল হাসে হা, হা— খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসী ধরতে পারে না।” শিশুদের সুবিধার জন্য, ওদের এই

মাসী”কে দেখাতে দেখাতে ক্রমশঃ তার দিকে অগ্রসর হবে ; “বাঘের মাসী” ও দৌড়ে “পুতুল” গুলিকে ধরতে যাবে। “পুতুল” গুলি পালাবে, এদিক সেদিক। যে “পুতুল” ধরা পড়বে, তাকেই তখন “বাঘের মাসী” হতে হবে। [পুনরাবৃত্তি]	খেলায় গোল করে দাঁড়াবার বৃত্তটি পাকা রং দিয়ে বরাবরের জন্য এঁকে রাখলে ভাল হয়। ভীরু শিশু ধরা পড়লে তাকে “বাঘের মাসী” হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে হবে, তবে খুব জোর না করাই ভাল।

আদেশ	মন্তব্য
৫। "হাত ধরে গোল করে দাঁড়াও। হাত ছাড়। এবার সকলে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে খুব আস্তে আস্তে স্কুল-ঘরে ফিরে যাও।"	খেলাধূলার পরেই বিরতির সুবিধা এইভাবে দেওয়াতে ক্রমশঃ শিশুদের উত্তেজনা ও ক্লান্তি দূরীভূত হয় খেলার মাধ্যমেই, এবং তখন ঘরে গিয়ে অনতিবিলম্বেই ওরা শান্ত হতে পারে।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে আমরা অতি সুনিপুণ ছন্দময় শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করি। নিয়মিতভাবে ছয় ঋতুর আবির্ভাব হয় একের পর এক ; দিনের শেষে আসে রাত্রি। প্রকৃতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাই, তার ব্যতিক্রম ঘটলেই হয় প্রলয়। মানুষের জীবনেও তেমনি শৃঙ্খলার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। জীবন-প্রবাহে শৃঙ্খলার অভাবেই মানবসমাজে প্রলয় ঘটে থাকে। আমরা সামাজিক জীব ; আমাদের জীবনযাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের পক্ষে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা একান্তই প্রয়োজন। এইজন্য আমাদের চাই নিয়ম-শৃঙ্খলা। এই সম্পর্কে অতি প্রাচীনকাল হতেই নানা মতবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন হয়েছে। লক্ (Locke) বলেছেন যে, আদিম জাতি বন্য অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করতো ; তারপর প্রয়োজনের তাগিদে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে থাকে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন মানুষ সামাজিক নিয়মাবলীর সৃষ্টি এবং প্রবর্ত্তন করে। এই নিয়ম ও শৃঙ্খলার ঐকান্তিক প্রয়োজন আজও বিন্দুমাত্র কমে নি। সেইজন্যই মানবশিশুর মধ্যে অতি শিশুকাল থেকেই শৃঙ্খলাবোধ সুচারুরূপে জাগাতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য কঠোর ও নির্ম্মম নিয়ম বা অভ্যাসের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সহজ, আনন্দময় পরিবেশে, স্বচ্ছন্দভাবে, বিবিধ কলাকৌশলের মাধ্যমে শিশুদের নিয়মনিষ্ঠ করে তোলাই বাঞ্ছনীয়।

নিয়মনিষ্ঠা ও উপযুক্ত আচার-ব্যবহারই শৃঙ্খলা। জার্ম্মান শিক্ষাবিদ ফ্রোবেল (Froebel) বলেছেন যে, শিশু নানাবিধ সদ্‌গুণাবলী নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ; এবং তাকে প্রকৃতির রাজ্যে অবাধভাবে বিচরণের সুবিধা দিলে সেই অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণাবলী ক্রমশঃ ফুল্লবিকশিত হবে। কিন্তু পিতামাতা

এবং অন্যান্য বয়স্ক ও নমস্য ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আবহাওয়ায়—শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার অভাব ও ব্যতিক্রমের প্রভাবেই শিশু ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল হতে শেখে। শিশুকে নিয়মনিষ্ঠ করে তুলতে হবে,—সুশৃঙ্খলার সদ্জ্ঞান তার মনে ক্রমশঃ জাগাতে হবে, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে এই শিক্ষা দেওয়া যায় না। সেইটাই দুর্লক্ষণ। ফ্রোবেল বলেন—"The sense of discipline must come from within and not from without."(৩৩)—অর্থাৎ, "নিয়মনিষ্ঠার প্রেরণা ভিতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে তা দেওয়া যায় না।" শিশুশিক্ষার মূল কথা, শিশুর ক্ষমতানুযায়ী কার্য্যক্রমের দ্বারা তার মনে নিয়মনিষ্ঠার জ্ঞান জাগ্রত করা। প্রতিদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে খেলাধুলা করলে ক্রমশঃ শিশুরা নিয়ম-নির্দ্দেশ অনুযায়ী সারিতে দাঁড়ান, গোল হয়ে দাঁড়ান, হাঁটা, ঘোরা, প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকর্ত্তব্যের মধ্য দিয়ে আচার-ব্যবহারে নিয়মনিষ্ঠার জ্ঞানলাভ করে। সহজ লোকনৃত্য ও অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে একসঙ্গে নিয়ম ও নীতি মেনে কাজ করার অভ্যাসের ফলেও শৃঙ্খলাবোধ উন্মেষিত হয়। মৌখিক উপদেশ, বক্তৃতা, তর্জ্জন-গর্জ্জন প্রভৃতি ভয়প্রদর্শনের ব্যবস্থা অপেক্ষা আনন্দময় পরিবেশে, আনন্দদায়ক কার্য্যক্রমের দ্বারা যে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে, একথা বলাই বাহুল্য।

নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামের সময়, এক শ্রেণীতে ২০ হইতে ২৫ জনের অধিক সংখ্যক শিশু থাকা উচিত নয়। শিক্ষিকার সঙ্গে একজন সাহায্যকারিণী থাকলে খুব ভাল হয়। বৃষ্টিবাদলের দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে ছায়াবৃত উন্মুক্ত স্থানে শরীরচর্চ্চার বা ব্যায়ামের ব্যবস্থাই সঙ্গত। প্রত্যেক দিনই এইজন্য নূতন পাঠ-টীকার (programme) প্রয়োজন হয় না। কারণ ব্যায়ামগুলির পুনরাবৃত্তির ফলে শিশুরা বিশেষভাবেই উপকৃত হয়। ওদের পক্ষে একটি খেলা বা ব্যায়াম প্রণালী বেশ ভাল করে বুঝে নিতে সময় লাগে। সেইজন্য একই প্রণালী উপর্য্যুপরি দুই দিন করা হলে, প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস সহজ ও সুসঙ্গত হয়। তাই ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ব্যায়াম প্রণালীর ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয় না, বরঞ্চ তা না করাই ভাল।

এই সঙ্গে শিশুর পরিচ্ছদ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। ছোট শিশুদের পক্ষে কেবল 'ইজার' ও ছোট 'কুর্ত্তা' পরে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। জুতা পরার

---

(৩৩) The Education of Man—Froebel.

কোনই প্রয়োজন নেই। তবে মাঠে যেন ভাঙ্গা কাঁচ, ইঁটপাটকেল বা অন্য কোনপ্রকার কণ্টকাদি না থাকে সেজন্য শিক্ষিকা পূর্ব্ব হতেই সতর্ক হবেন। শিশুগণ যেন ১৫ থেকে ২০ মিনিটের অধিক কাল ব্যায়ামে ব্যাপৃত না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। কারণ, তারা সারাদিনই প্রায় চলাফেরা করে এবং যতক্ষণ জেগে থাকে অবিরত তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয়। ব্যায়ামসুলভ অঙ্গচালনার ত্রুটি ঘটায় স্বাস্থ্যবিকাশ ব্যাহত না হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে শিক্ষিকা সতর্ক থেকে সমুচিত নিয়ম নির্দ্দেশের সাহায্যে তাদের ব্যায়াম-ক্রীড়া সুসম্পন্ন করবেন। ব্যায়ামের আদেশ-নির্দ্দেশ শিশুদিগকে শিক্ষিকা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় দেবেন, যেন আদেশ শুনেই তারা প্রতিপালন করতে পারে। আদেশের ভাষা সেইজন্য খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। শিক্ষিকা শিশুদের সামনে ব্যায়ামভঙ্গীগুলি দেখাবেন, যাতে তাঁকে দেখে তারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে নিতে পারে। শিক্ষা সর্ব্বক্ষেত্রেই নির্ভুল হতে হবে। শিক্ষিকার কল্পনাশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে ব্যায়াম প্রণালীর মধ্যে শিশুমনে সহজ আগ্রহ ও অনাবিল আনন্দের সঞ্চার সম্ভব হয়। খেলাধূলা ও অঙ্গচালনার কৌশল-গুলি এমন হওয়া চাই যাতে শিশুর দৈহিক পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক শক্তি, সাহস, কর্ম্মক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিকশিত হয়; তার শারীরিক গঠনভঙ্গী সুন্দর ও সুঠাম হয়, ক্ষিপ্র কর্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং জীবনীশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে। এই সঙ্গেই যেন ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিক বোধ, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, সহযোগিতামূলক মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্ব-ক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে "খেলোয়াড়" জনোচিত অনুত্তেজিত চিত্তবৃত্তি, আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সাধু ব্যবহার প্রভৃতি সজ্জনোচিত গুণাবলীর বলিষ্ঠ বিকাশসাধন হতে পারে তার জন্য তাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে।

মানবধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণরাজি বিকাশের দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজ ও জগৎ যাতে সুন্দরতর ও সুখময় হয়ে ওঠে তা সকলেরই লক্ষ্য। শিশুর স্বাস্থ্যসম্পর্কে অবহিত হলে এ সকল গুণরাজি অতি সহজেই বিকশিত হতে পারে, কিন্তু সেই গুরু দায়িত্ব কেবল শিক্ষাব্রতীরই নয়, সমগ্র সমাজের। স্বাস্থ্যই মানবের প্রকৃষ্ট বিকাশের মূলমন্ত্র, সুতরাং এ বিষয়ে সকলের কর্ত্তব্যানুরাগ জাগ্রত হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

ছড়া, সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় দ্বারা শিশুর শরীর ও মনের ক্রমবিকাশ

ছড়া, সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় দ্বারা শিশুর শরীর ও মনের ক্রমবিকাশ

পারিপার্শ্বিক জগতকে আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—বিশেষতঃ চক্ষু ও কর্ণ, এই দুইটির সাহায্যে। যা দেখি ও যা শুনি তার একটি সুগঠিত চিত্র অঙ্কিত হয় আমাদের মানসপটে। এই দেখাশোনার ভিতর দিয়েই আমরা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি। কিন্তু দৃশ্য বস্তু চক্ষুকে যত সহজে আকর্ষণ করে, তার চেয়েও সহজে কর্ণ আকৃষ্ট হয় শব্দের প্রতি। চোখে না পড়লে আমরা কোন জিনিষ দেখতে পাই না ; কিন্তু কর্ণকুহর আমাদের সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, শব্দতরঙ্গ এসে কর্ণপটাহে আঘাত করলে, না শুনে আর উপায় নেই। কত রকম শব্দই না আমরা শুনি, আর শুনে আমাদের মনে কত রকম ভাবেরই না উদয় হয়! শব্দ আমাদের চেতনাকে গভীর ভাবে অভিভূত করে। শব্দকে তাই বলা হয় জগতের চৈতন্যস্বরূপ—"নাদঃ ব্রহ্মঃ।" পাখীর ডাক, পাতার মর্ম্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি-সংঘাত, ছোট বড় কত সহস্র প্রকারের কলশব্দ নিরন্তর আমাদের চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে চলেছে—কোন শব্দে আমরা ভয় পেয়ে চমকে উঠি, কোন শব্দে আমরা বেদনা অনুভব করি, আবার কোন শব্দ শুনে আমরা পুলকিত হই। শব্দ যদি শ্রুতিমধুর হয়, তাহলে তা আমাদের মনকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে। তাই সঙ্গীত, ছড়া, ইত্যাদি আমাদের এত প্রিয়। সংসার যাত্রার পথে নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাদের মন ক্রমে অসাড় হয়ে আসে ; কোন ঘটনাতেই তাই সহজে মেতে উঠতে পারি না। কিন্তু সঙ্গীত সেই অসাড় চিত্তকেও স্পর্শ করে। সুতরাং আনন্দচঞ্চল শিশু যে সঙ্গীত ও ছড়া প্রভৃতির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

শিশুর বয়স যখন ৩ মাস, তখন থেকেই সে শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন তাকে ডাকলে সে শব্দ লক্ষ্য করে' ফিরে তাকায়, তাকে উদ্দেশ করে' কথা বললে সে হাসে, থঞ্জনি বা ঝুমঝুমি বাজালে সে চুপ করে' শোনে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার এই শব্দানুভূতি ক্রমশঃই প্রখরতর হয়। ক্রমে সে ছন্দোবদ্ধ, সুরসম্বলিত

শব্দ শুনে আনন্দ লাভ করে। শিশুর এই সহজ আনন্দানুভূতিকে কেন্দ্র করে তাকে যদি প্রথমে ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয় তা' যেমন কার্য্যকরী হবে, মনোগ্রাহীও তেমন হবে বলে আশা করা যায়।

জীবনে প্রথম ভাষা বুঝবার পূর্ব্বেই কিন্তু, শিশু ছন্দ বোঝে। খুব ছোট শিশু দোলনার দোলের ছন্দ বোঝে, "ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী", "খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়াল" ইত্যাদির সুর শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। তখনও শিশুর ভাষার অর্থবোধ হওয়ার সময় নয়, কিন্তু তবুও সে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। ছড়া ও সঙ্গীতের মদির স্পর্শে অশান্ত ও প্রাণচঞ্চল শিশু ক্রমেই শান্ত হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ে। অতি শৈশবের এই সুরটি যখন নার্সারি স্কুলের শিক্ষাবিধির সংস্পর্শে আসে, তখন তার সঙ্গে যোগ দিতে এবং তারই মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতেও শিশু খুবই ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। এইদিক থেকে দেখলে, শিশুশিক্ষায় "ছড়া"র স্থান অতি উচ্চে।

ছড়ার মাধ্যমে শিশুর ভাষা শিক্ষা, আনুভূতিক বিকাশ ইত্যাদি আলোচনার পূর্ব্বে ছড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বিচারের প্রয়োজন। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে এবং এই স্বাভাবিক চিরত্ব গুণে এগুলির মাধুর্য্য কোনদিনও ক্ষুণ্ণ হয় না। ছেলেভুলানো ছড়ার বৈশিষ্ট সম্পর্কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এমন মনোগ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা করে গেছেন যে তার পরে ছড়া সম্বন্ধে নূতন করে অনুশীলন করবার প্রয়োজন আর নেই বললেও চলে। তবে শিশুশিক্ষায়—বিশেষতঃ শিশুর ভাষা শিক্ষায় কি করে এই ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলিকে ব্যবহার করা যায়, এক্ষেত্রে তাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে—"ছড়াগুলিই শিশুসাহিত্য—তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। তাহাদের ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্রবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু-মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।" (৩৪) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যথা ঃ

(১) "এই ছড়াগুলিই শিশুসাহিত্য", এবং

(২) "শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া এগুলি রচিত হয় নাই।"

---

(৩৪) রবীন্দ্রনাথ—সঙ্কলন—ছেলেভুলানো ছড়া—১৩০ ও ১৭০ পৃঃ।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে বিপুল আলোড়নের ফলে আজ শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণভাবে এবং পূর্ণমাত্রায় স্ফুরিত কি ভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে নিরন্তর গবেষণা চলেছে। সেই সকল গবেষণাদির ফলে শিশুশিক্ষা প্রণালী এখন সমুন্নত বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছে এবং আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধারা শিক্ষিত সমাজে আজ প্রায় অচল ও অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সামনে ধরে রচিত না হয়েও আমাদের সনাতন ছেলেভুলানো ছড়াগুলি চিরকাল অব্যর্থভাবে শিশুমনোরঞ্জন করে এসেছে। এই রকম পরস্পরবিরোধী কথাটা যথাযথরূপে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এই যে সব অসম্ভব, অসঙ্গত, অর্থহীন শ্লোকগুলি কত শত বৎসর অবধি গৃহে গৃহে, স্নেহার্দ্র সরল, মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আসছে, এগুলি কি করে অবাধে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছে এবং আজও এই বৈজ্ঞানিক জগতে যে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, তার কারণ কি? দেশ, কাল, শিক্ষা ও প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে—কিন্তু শত সহস্র বৎসর ধরে মানবশিশু যেমন ছিল, মূলতঃ আজ তেমনিই আছে এবং তাদের মনোরঞ্জনকারী এই সব কবিতা, সঙ্গীত ও ছড়াগুলির সেই একই পুরাতন রূপ ও ছন্দ আজও সেই একই ভাবে রয়েছে এবং সেই একই ভাবে সেগুলি শিশুমনোরঞ্জন করে আসছে। তাহ'লে নিশ্চয়ই এই ছড়াগুলির মধ্যে অনুশীলন করলেই শিশুমনোবিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করা যাবে এবং যদি তা না হয় তবে দোষ নিশ্চয়ই ঐ ছড়াগুলির নয়।

এখন দেখতে হবে কি কারণে এই মেঘের ন্যায় বন্ধনহীন ছড়াগুলি শিশুমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায় যে, অসংলগ্নতা শিশুমনের পরিচায়ক। সুসংলগ্ন কার্য্যকারণসূত্র ধরে কোনও ব্যাপারকে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা শিশুর পক্ষে রীতিমত পীড়াজনক। এইজন্যই শিশুদের খুব বড় ছড়া বা গল্প শোনাবার প্রথা নেই। ছড়াগুলিতে অর্থসংলগ্নতা না থাকলেও, ছবি আছে এবং শিশু সহজেই সেই ছবিকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে অপার আনন্দ অনুভব করে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন—

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে
ও পারেতে মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে।"

এই ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মত উড়ে চলেছে; এবং এই গতিবেগের সঙ্গে শিশুর মনও কল্পনার রাজ্যে পাখীর মতই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে ভেসে চলে।

দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মন অর্থলিপ্সু নয়। ছড়াটিতে কি মর্ম্মার্থ নিহিত আছে শিশুরা তার খোঁজ করে না। ছড়ার ছন্দের ঝঙ্কারই ওদের মনোবীণায় সুরের লহর ছড়ায়, সেই সুরের সুললিত মাধুর্য্যে শিশুমন গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যদিও মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে ছড়াগুলি রচিত হয়নি এবং এগুলিতে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা থাকা সত্ত্বেও, মুগ্ধহৃদয়া শিশুবন্দনাকারিণী রচয়িত্রীবর্গ যেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরেই ছড়াগুলি রচনা করে গেছেন। শিশুচরিত্রের সঙ্গে তাঁদের সহজ ও সুগভীর পরিচয় থাকায়, কিসে শিশুমন পুলকিত হবে তার অব্যর্থ সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন এবং এই সুললিত ছড়াগুলির দ্বারা সহজেই তা প্রকাশ করে গেছেন।

শিশুর মানসিক বিকাশে ছড়ার প্রয়োজন আছে কিনা, এখন এই বিষয়ের বিচার আবশ্যক। নিজস্ব অভিজ্ঞতাসূত্রে আমরা জেনেছি যে, ছড়ার ছন্দের মিল ও ঝঙ্কার শিশুমনে ক্রমশঃ সাহিত্যরসানুভূতির সঞ্চার করে। যেমন, দেখা গেল যে আমাদের নার্সারি স্কুলের বাগানে অনেক সাদা বক এসে বসে। সেইজন্য শিশুদের এই ছড়াটি শেখান হয়—

"বক মামা, বক মামা
ফুল দিয়ে যাও,
নারকোল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যাও।"

আমাদের বাগানে নারিকেল গাছ নেই, কিন্তু তালগাছ আছে। শিশুরাই এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন কমল বলে উঠলো—

"তাল গাছে তাল আছে
গুণে নিয়ে যাও।"

ক্রমশঃ, প্রত্যেক পরিচিত গাছ সম্বন্ধেই শিশুরা মুখে মুখে ছড়া রচনা করতে সুরু করে এবং শিমুল ফুল, গোলাপ ফুল, আম, কলা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে "বক

মামা"কে ফুল দিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বেশ একটি চিত্তাকর্ষক খেলার সৃষ্টি করে নিল।

ছড়ার ছবিগুলি শিশুর কল্পনাশক্তির উদ্বোধনে বিশেষভাবেই সাহায্য করে, লক্ষ্য করেছি। যেমন এই ছড়াটি—

"লাল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি
নীল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি,
আয় না উড়ি নীল আকাশে
আয় না উড়ি জোর বাতাসে,
সর্ না নামি, সর্ সর্ সর্
সর্ না উঠি, ফর্ ফর্ ফর্,
কর্‌ছে কেমন যেন গা'টা
পড়্‌লি তবে তুই কা-টা
ভো কাট্‌টা, ভো কাট্‌টা, ভো কাট্‌টা রে!
ভো মারা, ভো মারা, ভো মারা রে!

এই ছড়াটিতে সুর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যখন এটি আবৃত্তি বা গান করে, তখন তাদের অঙ্গভঙ্গী, মুখের ভাব ও ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করবার বিষয়। শিশুরা তখন কখনও নিজেরাই ঘুড়ি উড়িয়ে ছুটছে, কখনও নিজেরাই ঘুড়ির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নীলাকাশে আনন্দে বিচরণ করছে, কখনও বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহে তাদের দেহ ও মন আকুল হয়ে উঠছে।

আর একটি ছড়ার কথাও বলা যাক—

"আয়রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধর্‌তে যাই
মাছের কাঁটা পায়ে ফুট্‌লো, দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি, গুণতে গুণতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারে, রে ভাই, বালি ঝুর্ ঝুর্ করে।
চাঁদমুখে রোদ্দুর লেগে রক্ত ফুটে পড়ে॥"

এই আর এক ধরণের ছবি। প্রথমতঃ, ছেলের পাল মাছ ধরতে গেল; কিন্তু পায়ে কাঁটা ফুটে যাওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত দোলায় চেপে গন্তব্য স্থানে পৌছান গেল। পরে নদীর জলটুকু টলমল করছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে খসে পড়ছে, দেখা গেল। বালিতটবর্ত্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত, সরল ও সুস্পষ্ট ছবি শিশুর সহজ কল্পনাশক্তিকে উন্মেষিত হতে সাহায্য করবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের নার্সারি স্কুলে অধিকাংশ শিশুর দল কালীঘাট কিংবা খিদিরপুর অঞ্চল থেকে আসে, কাজেই তাদের নদীর সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে। তাছাড়া, আমাদের বাগানের মধ্যেই একটি বড় ঝিল আছে। ঝিলের পাশে বসে শিশুরা অনেক সময় ছবি আঁকে। এই সময় ছড়ার সাহায্যে তারা মাছ, আকাশ, পাখী, গাছ, ফুলের যে-সব মনোরম চিত্র আঁকে কথা-চিত্রের চেয়ে তা' কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

তৃতীয়তঃ, ছড়া আবৃত্তির দ্বারা শিশু আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জ্জন করে। নিজেকে জাহির করা শিশুর স্বাভাবিক ঝোঁক, কিন্তু কোন কিছুকে অবলম্বন না করে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। এদিকে, ভাবের আতিশয্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-বিশিষ্ট বিষয়বস্তু শিশুর কাছে ধরা দেয় না। লঘু এবং সহজ অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুটি তার কাছে মনোগ্রাহী; কাজেই ছড়ার সহজ ভাষা ও ছন্দ, সাবলীল গতি ও সুমধুর সুরে শিশুর মন আকৃষ্ট হয় এবং অতি ভীরু ও লাজুক শিশুও ক্রমশঃ দলের সঙ্গে আবৃত্তি করতে লজ্জা বা ভয় পায় না। এইজন্যই আমরা ছড়ার সাহায্যে শিশুদের নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকি এবং একটি ছড়ার সহায়তায় একাধারে যে কত উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে, নিম্নবর্ণিত ছড়ার ব্যবহারপদ্ধতি থেকে তা' কিছুটা বোঝা যাবে।

"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গি এলো দেশে—
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি॥"

এ ছড়াটিতেও সুর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে শিশুরা গোল করে দাঁড়ায়, পরে সকলে একসঙ্গে, কোলে পুতুল নিয়ে ছন্দের তালে তালে পুতুলগুলিকে দুলিয়ে, এই গানটি করে। সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে গান করতে কোন শিশুরই আপত্তি দেখা যায় না। তারপর শিশুরা মেঝেতে বসে এবং শিক্ষিকা তখন তাদের জিজ্ঞাসা করেন—"কে সকলের মাঝখানে গিয়ে গান করবে?" শিক্ষিকার হাতে দুই তিনটি বড় বড় সুসজ্জিত পুতুল থাকে। যারা মাঝখানে গিয়ে গান করে, তারা ঐগুলি কোলে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে গান করে। গান শেষ হলে শ্রোতৃবর্গ সপ্রশংস হাততালি দেয়। এইভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শিশুই আত্ম-প্রসাদ লাভ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। দেখা গেছে যে, অতীব ভীরু এবং লাজুক ছেলেমেয়েরাও—যথা, আমাদের আরতি, বন্দন, আলোক ও বাব্‌লু—একাকী এইভাবে গান করবার জন্য মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর, ক্রমশঃ এই ছড়াটিকেই কেন্দ্র করে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হলো। ছড়াটির আবৃত্তিকালে দেখা গেল যে, এর মধ্যে আছে একদল "বর্গি" এবং কয়েকটি ভীত, ত্রস্ত মাতা। বর্গিরা তখন মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গোঁফ এঁকে, কোমরে লাল পটি বেঁধে, কাঁধে লাঠি নিয়ে সব দাঁড়িয়ে গেল—ভাবখানা, একবার সুযোগ পেলেই তেড়ে এসে মায়েদের কাছে খাজনা আদায় করবে। ওদিকে মায়েরা সব শাড়ী পরে, টিপ ও আলতায় সুসজ্জিত হয়ে, ছোট ছোট খোকাখুকুকে কোলে নিয়ে মৃদু ছন্দে গানটি গাইতে গাইতে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করলো। তারা এসে স্বস্থানে দাঁড়াতেই অত্যাচারী বর্গির দল "হারে রে রে" শব্দে চীৎকার করতে করতে প্রবল বেগে দৌড়ে এসে ঐ ভীরু, অসহায় মায়েদের কাছে দাঁড়িয়ে খাজনা দাবী করলো। দস্যুসর্দ্দারের কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে মায়েরা তখন গেয়ে উঠলো—

"ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর করো,
রসুন বুনেছি।"

সর্দ্দারের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হলো। তার ইঙ্গিতে বর্গির দল এবারকার মত

নিরুপায় মায়েদের ছেড়ে চলে গেল। অভিনয়ের আনুসঙ্গিক যে সব ব্যবস্থা থাকা উচিত সবই এই সময় মজুত রাখা হয়—ঢোল, করতাল, ঢাল, তলোয়ার, কিছুই বাকি থাকে না। যে সব ছেলেমেয়েরা অভিনয়ে যোগ দেয় না তারা হয় বাদ্যযন্ত্র বাজায় না হয় গান করে। মোট কথা, দলের কাউকেই বাদ দেওয়া হয় না।

এই ছড়াটির দ্বারা আরও কত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, দেখা যাক। এটি আবৃত্তি করার সময় শিশু নিজের মা-মাসির স্থানে নিজেকে অবিকল কল্পনা করে থাকে এবং তাঁদের অনুকরণ করে তার অনুকরণ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। এই সব ছড়া মুখস্থ করার ফলে তার স্মৃতিশক্তিও প্রখর হয়ে উঠে এবং উচ্চারণের জড়তা কেটে গিয়ে তার বাক্‌শক্তির শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ ছাড়া ছেলে-ভুলানো ছড়ার কথাগুলির দ্বারা শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ৩ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা ছড়ার ছন্দ ও সুরে মুগ্ধ হয়; কিন্তু ৪ থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এগুলির দ্বারা নানাভাবে এবং বিশেষরূপে উপকৃত হয়। কারণ, এ বয়সের শিশুমাত্রই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ।

যেসব ছেলে-ভুলানো ছড়া নার্সারি স্কুলে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ সাত ভাগে ভাগ করি; যথা—

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া,

(২) খোকাখুকুর স্তবাত্মক ছড়া,

(৩) প্রাকৃতিক শোভা সম্পর্কে ছড়া,

(৪) খেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া,

(৫) নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছড়া,

(৬) জন্তু, জানোয়ার প্রভৃতি সম্পর্কে ছড়া এবং

(৭) মজার ছড়া।

মায়ের কোলে শুয়ে, মৃদু দোদুল ছন্দের তালে দুলতে দুলতে, শিশু নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছে এমন চিত্র বাংলা দেশে বিরল নয়। সেই অতি পরিচিত ছবিটিই আমরা নার্সারি স্কুলে পুনরায় পরিবেশন করি যাতে শিশুই এখানে মায়ের স্থান গ্রহণ করে' তার ক্ষুদ্র শিশুটির পরিচর্য্যা করে' তাকে ঘুম পাড়াতে পারে। শিশুমনে এইভাবে দয়া, মায়া প্রভৃতি গুণগুলির ক্রমোন্মেষের সহজ সুযোগ দেওয়া হয়।

"ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী যেও।
বাটা ভরে পান দেবো, গাল ভরে খেও॥
শানবাঁধানো ঘাট দেবো, বেশম মেখে নেও।
শেতলপাটী পেতে দেবো, শুয়ে ঘুম যেও॥
ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী এসো।
খাট নেই, পালঙ্ক নেই, খোকার চোখে বোসো॥"

কিংবা,

"ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী এসো।
জল পিঁড়ি দেবো তোমায়, পা ধুয়ে বোসো॥
চালকড়াই ভাজা দেবো যত খেতে চাও।
দাঁত না থাকে গুঁড়িয়ে দেবো, গাল পুরে খাও॥
যত ছেলের চোখের ঘুম, খোকার চোখে দাও॥"

'ঘুমপাড়ানী' ছড়াগুলি সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, সেগুলির মধ্যে নানা অসঙ্গতি আছে। বেশ বোঝা যায় অধিকাংশ ছড়াই মুখে মুখে রচনা করে মায়েরা তাঁদের শিশুদের মনোরঞ্জন করেছেন; অথচ, ছড়াগুলির মধ্যে কোন অসত্য বা অলীক ঘটনা নেই। কেবল শব্দসাদৃশ্য ও ছন্দের গতি ও লয় অবলম্বন করে মুহূর্ত্তে একটা চিত্র হতে আর একটি চিত্র রচিত হয়েছে এবং যাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই সকল অসংলগ্ন ও অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে, তারা কোনরূপ সন্দেহ করে না, বরঞ্চ মানসচক্ষে ঐ ছবিগুলিকে প্রত্যক্ষ করে অপার বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে মায়ের কোলে ঘুমে ঢলে পড়ে।

কবি বলেছেন, "ভালোবাসার মত এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি, অন্ত, অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়।" তাই মায়ের কোলে শিশু কখনও চাঁদ, কখনও পাখী, কখনও ধন। "যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ,

অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানে তার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি, সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি।" (৩৫)

"আয়, আয় চাঁদমামা টিপ্ দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ, টিপ্ দিয়ে যা ॥
মাছ কাট্‌লে মুড়ো দেবো,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,
চাঁদের কপালে চাঁদ, টিপ্ দিয়ে যা।"

অথবা—

"মা মাসীর কোলে
খুকুমণি দোলে—
খুকু নড়লে ওড়ে চুল
খুকুর মাথায় বকুল ফুল
খুকুর গালভরা হাসি
মাণিক ঝরে রাশি রাশি ॥"

এক মেঘলা দিনের সকাল বেলায়, শুনতে পেলাম আমাদের বাড়ীর পাশেই একটি ছোট নেপালী মেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে গাইছে—

"এক পয়সা হল্‌দি
পানি আ যা জল্‌দি—"

সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি বাঙ্গালী বালকবালিকা গেয়ে উঠলো—

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে,
কচুর পাতা নল
ঝেঁপে আয় জল।"

(৩৫) রবীন্দ্রনাথ—ছেলেভুলানো ছড়া—সঙ্কলন—১৬৪ পৃষ্ঠা।

বাদলার দিনে, স্বল্পপরিসর গৃহে আবদ্ধ থেকে শিশুর তুরন্ত হৃদয় উতলা হয়ে ওঠে; এমন দিনে কি ঘরে থাকা যায়? ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করে', পাতার ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে, মন কল্পনার রাজ্যে ভেসে যেতে চায়। এমন দিনের জন্যই কত যে কবিতা ও ছড়া রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাকৃতিক শোভার মনোগ্রাহী বর্ণনা এই সব ছড়াগুলিতে প্রচুরভাবে রয়েছে এবং বুদ্ধিমতী শিক্ষিকা সেগুলির সাহায্যে শিশুর মনে অতি সহজেই সাহিত্যরসবোধের উদ্রেক করতে পারেন। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই শিক্ষিকার নিজস্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ অতি পরিচিত কয়েকটি ছড়ার আরম্ভমাত্র দেওয়া হলো।

(১) "বিষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর নদেয় এলো বান"—
(২) "বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিখছানা"—
(৩) "সবুজ বরণ ঘাস পাতা
লাল শিমুল ফুল,"—
(৪) "অনেক দূরে নদীর জলে
ছোট্ট কেমন নৌকা চলে,"
(৫) "ভোর হোল, দোর খোল"—
(৬) "আর রোদ কোথাও নাই"—
(৭) "আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূয্যি গেল পাটে"—
(৮) "নমস্কার, সূয্যি-মামা"—

তারপরে, খেলা সম্বন্ধীয় ছড়ার কথা ধরা যাক। এই ছড়াগুলির কোন কোনটা নিতান্তই অর্থহীন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, যে-ধরণের খেলা শিশুরা খেলে সেইসব খেলার উপযুক্ত ছড়া আমরা ব্যবহার করে থাকি। শব্দবিন্যাস ও সুরের ঝঙ্কার ছাড়াও ছন্দের মিল থাকায়, খেলাগুলি বেশ সহজেই জমে ওঠে। সাধারণতঃ, কয়েকটি ছেলেমেয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে। তারপর একজন ছেলে খেলার ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে

আবৃত্তি করে অথবা প্রত্যেকের আঙ্গুল একটি একটি করে গুণে চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গান করে—

"আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে,"—

কিংবা— "ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্‌চিক্‌ড়ি,"

এই সকল সহজ ছড়ার দ্বারা শিশুরা সহজেই সংখ্যাজ্ঞান পেতে পারে। ক'জন ছেলেমেয়ে খেলতে বসেছিল, খেলতে খেলতে ক'জন "মারা" পড়লো ক'জন তাহলে বাকী রইল, ইত্যাদি ভাবে ওরা খুব শীঘ্রই গুনতে শেখে। এছাড়া নিছক খেলার আনন্দেই শিশুরা খেলার ছড়া সোৎসাহে আবৃত্তি করে ওঠে। যেমন,—

"চল্ চল্ খেলি চল্ ফুটবল সকলে
বুট, শার্ট, হাফপ্যাণ্ট্, বল নিয়ে বিকেলে।
ধাঁই করে মারি বল
এই বুঝি হয় গোল্
চারিদিকে ঘন ঘন হাততালি, জয়রোল ॥"

—ইত্যাদি।

নিত্যনৈমিত্তিক যে ঘটনাগুলি ঘটছে শিশুর জীবনে, কিংবা পিতামাতা, ভাইবোন ভিন্ন যে-সকল পরিজনবর্গের সঙ্গে তাদের ক্রমশঃ পরিচয় সাধিত হচ্ছে তাদের সম্বন্ধেও আমরা ছোট ছোট কবিতা সংগ্রহ করে, অথবা রচনা করে, শিশুদের শিখতে উৎসাহিত করি। যথা—

১। "সব চেয়ে মজা ভাই, বেলুন-ওয়ালার,
কত যে বেলুন তার নিজের একার।
কত রং—নীল, সাদা, সবুজ ও লাল,
উড়ায় যখন খুসী সকাল বিকাল ॥

২। "ছোটো খাটো পিওন আমি
ঘুরি চিঠি নিয়ে,

কত মোড়ক, কাগজ, কেতাব
বেড়াই দিয়ে দিয়ে,
পাড়ার সবাই চেনে আমায়
আমার পথ চায়
সদাই কাজে ব্যস্ত থাকি
দিবসে, নিশায়।"

কিংবা—

৩। "আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিও কালকে সকাল বেলা,
কাল্‌কে বড় মজার দিন—কালকে রথের মেলা।
এতে যেন গোলটি না হয় দেখো কোন মতে,
কালকে যাবো রথে, মাগো, কালকে যাবো রথে॥

ও-পাড়ার ময়রাবুড়ো, রথ করেছে তেরো-চূড়ো,
তোরা রথ দেখতে যা', তোদের হলুদ-মাখা গা,
আমরা পয়সা কোথায় পাবো, আমরা উল্‌টোরথে যাবো॥"

জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের গভীর কৌতুহল। তাদের বিষয় জানতে, বুঝতে এবং তাদের লালনপালন করতে পেলে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত খুশি হয়, এবং প্রত্যেক পরিচিত জন্তু সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত ছড়া সংগ্রহ করে মধ্যে মধ্যে আমরা শিশুদের পরিবেশন করে থাকি।

১। "কাঠবিড়ালী ভাই,
একটুখানি পেয়ারা ভেঙ্গে দাওনা ফেলে, খাই।
লেজ দুলিয়ে সারা দুপুর
গাছের ডালে কুটুর কুটুর
দুই চোখে কি দুষ্টু হাসি, ঘুমটি তোমার না

২। "চড়ুই পাখী, চড়ুই পাখী
আমার কথা, শুনছো না কি,
একটু এসো কাছে।
আসছো না তো, চড়ুই পাখী
ফুড়ুৎ করে দিচ্ছ ফাঁকি,
বসছো উড়ে গাছে॥"

৩। "জ্বলে ওঠে জোনাকী
হীরে মতি সোনা কি
মিশ্ কালো আঁধারে,
আকাশের তারাদল
হল বুঝি চঞ্চল
বনের মাঝারে॥"

৪। "থমক্ থমক্ নাচে ভালুক
দু' পা তুলে নাচে।
মল পরে নাচে ভালুক
হাত তুলে নাচে॥
ভালুক মামার বাড়ী যায়
ভালুক দুধ-কলা খায়।
ভালুক হামা দিয়ে যায়
ভালুক থমক্ থমক্ যায়॥"

৫। "আমরা খরগোস দলে দলে,
বাস করি ওই গাছের তলে॥
কড়াইশুঁটি আর কপির ক্ষেতে
লুটোপুটি খাই, সবাই মেতে॥

কেবল একবার নেক্ড়ে বাঘ
দেখলেই—চম্পট্ দিই সবাই ॥"

৬। "খরগোস খর্ খর্
কান দু'টি তুলে
বন থেকে বের হোলো
বুঝি পথ ভুলে ॥"

সব শেষে, কয়েকটি মজার ছড়া উদ্ধৃত করব। হাস্যরস উপভোগ করতে পারা, খুব একটি বড় গুণ। যাদের মনে রসবোধ নেই, তাদের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই শুষ্ক ও দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়ে। বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের জীবন অনেক সময় আনন্দহীন হয়ে যায়। এই আনন্দহীন জীবনকে সরস করে তুলতে হলে, কল্পনার আশ্রয় ও আনন্দভাণ্ডারের সন্ধান নিতে হয়। নতুবা, কেবল রূঢ় ও বাস্তব জীবনকে আঁকড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। তাই, শৈশব হতেই নানারূপ কৌতুকপূর্ণ ছড়া ও কবিতার দ্বারা শিশুদের হাস্যমুখর করে তুলতে চেষ্টা করা হয়। ৪ হতে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ৺সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি খুবই উপভোগ করে; এছাড়া, "রাণীর রান্না," "কাজের ছেলে," "নেমন্তন্ন খাবার লোভে", ইত্যাদি ছড়াকবিতাগুলিও তারা অত্যন্ত পছন্দ করে। কয়েকটি মজার ছড়া নীচে উল্লেখ করা গেল।

১। "ক্ষান্ত-বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়।
শাড়ীগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলি রাখে আল্‌নায় ॥
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে তারা থাকে লোহার সিন্দুকে
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে'
রেখে দেয় খোলা জান্‌লায় ॥

নুন দিয়ে তার ছাঁচি পান সাজে
চুণ দেয় তারা ডাল্‌নায় ॥"

২। "চড়ে' বেতের ঝুড়ি
চলছে উড়ে বুড়ি
সুদূর আকাশে।
হাতে তার ঝাড়ন ঝাঁটা
মাথায় তার কাপড়-আঁটা
উড়্‌ছে বাতাসে ;
আকাশ পথে উড়ি'
তুমি চল্‌লে কোথা, বুড়ি
বল্‌বে নাকি হে ?
আকাশের ঐ ছাতে
ঝুল্‌ জমেছে তাতে
ঝাঁট্‌ দে আসি গে।"

এই ধরণের অধিকাংশ ছড়াগুলির মধ্যে শিশুমনের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পায় বলে আমরা এগুলিকে শিশুশিক্ষার উপযোগী হিসাবে গ্রহণ করেছি। লিখন-পঠনের শিক্ষাভ্যাস সুরু হওয়ার আগে থেকেই ছড়া, কবিতা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হলে সেগুলিরই সাহায্যে, ক্রমশঃ চিত্রাঙ্কন, লিখন, পঠন, গণনা, শরীর চর্চ্চা, ইত্যাদি সবই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, এগুলির সাহায্যে মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিও ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হয়ে ওঠে।

বিশ্ব-প্রকৃতির সুর ও ছন্দ, লালিত্য ও সুষমা, শিশুর মনকে আপ্লুত করে' তোলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর অন্তরের যোগাযোগ ঘনীভূত হয় এই সকল ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। তারই ফলে, এ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তাকেই কোমলমতি, নিষ্কলঙ্ক শিশু সহজ ভাবে উপলব্ধি করে।

সঙ্গীত—আদিম মানবসমাজের ইতিহাসে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা দেখি যে, আদিম যুগে মানুষ ভাষার ব্যবহার জানত না। মনের সব রকম

অবস্থা সুনিপুণভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে তখনকার মানুষ ছিল একান্তই অক্ষম। জীবনপথে হর্ষ, বিষাদ, বীর্য্য ইত্যাদি হৃদয়ের সহজ নানা ভাব ও অনুভূতি তারা ব্যক্ত করত নানাবিধ ধ্বনির সাহায্যে। মানব সমাজে ধ্বনিই হল—আদিম যুগের আদি ভাষা। ধ্বনিকে বাদ দিলে আমাদের ভাষাস্ফূর্ত্তি থাকত অবরুদ্ধ। পশুপক্ষীদের জীবনে যেমন আজও ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়নি, বিভিন্ন ধ্বনিই যেমন বিবিধ পশুপক্ষীর চেতনার প্রকাশভঙ্গী—আদিম মানবও তেমনি ভাষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হতে পারেনি। পাখীর যে সুমিষ্ট গান আমাদের মন ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করে, সে শুধু ধ্বনিরই সুললিত বিন্যাস। মানুষের সেই আদিম অভ্যাস আজও অবলুপ্ত হয়নি, তাই আজও আমরা ধ্বনির সাহায্যেই বিরক্তি, বিস্ময়, উল্লাস প্রভৃতি মনোভাবগুলি প্রকাশ করে থাকি। একটি মাত্র ধ্বনির দ্বারা সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে যতটা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, ভাষার চাতুর্য্যে হৃদয়ের অসীম, অব্যক্ত অনুভূতির স্ফূর্ত্তি প্রায়ই সম্ভব হয় না। জটিল জীবনযাত্রার তাগিদে আজ মানুষ সমৃদ্ধ ভাষার সৃষ্টি করেছে বটে, তবুও মনের গভীর উপলব্ধি সীমাবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন বলে, মানুষ সুর ও ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

মানবশিশু কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই সে সহজেই ধ্বনি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই ক্রন্দন-ধ্বনিতে প্রকাশ করে তার প্রথম ভাষা। জন্মমুহূর্ত্ত থেকেই শিশুর মুখ হতে বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি প্রকাশিত হয় এবং তারই দ্বারা সে ক্ষুধা, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অনুভূতি লোকসমাজে ব্যক্ত করে। আদিম মানুষের ন্যায় শিশুরও আদি ভাষা—ধ্বনি। কাজেই ধ্বনির উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা শিশুমনের সঙ্গে অতি সহজেই পরিচিত হওয়া যেতে পারে, এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে শিশুর বয়স যখন ৩ মাস, তখন থেকেই সে ধ্বনির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কোন শব্দ করলে, সেদিকে সে ফিরে তাকায়; তাকে উদ্দেশ করে কথা বললে সে পুলকিত হয়ে হেসে ওঠে। রোরুদ্যমান শিশুকে অতি সহজেই শান্ত করা যায় বিবিধ উল্লাসব্যঞ্জক ও শিশুমনোগ্রাহী ধ্বনির সাহায্যে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এই শব্দানুভূতি বেড়ে চলে এবং সে তখন নানা বিচিত্র ধ্বনির দ্বারাই তার অন্তরের সকল ভাব

ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তার ধ্বনির ইঙ্গিত সব সময় পরিণত বয়স্কের বোধগম্য হয় না। শিশুও তখন প্রবল ধ্বনির দ্বারা দুঃখ বা বিরক্তি প্রকাশ করে। কিছুদিন আগেই এই ধরণের একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদের নার্সারি স্কুলে একটি ১৪ মাসের শিশু স্বেচ্ছায় ভর্ত্তি হতে আসে। ঐ শিশুটির বাসস্থান নার্সারি স্কুলের খুব কাছে, অনেকগুলি শিশুর মেলামেশা হয়ত তার শিশুচিত্তকে দোলা দেয়। সে তখনও ভাল করে কথা বলতে পারে না। একদিন সে খেলার মাঠে "slide"-এর বিপরীত দিকে বসে অন্য শিশুদের "slide"-এ চড়া ও নামা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে এবং তারপর নিজে ঐ "slide"-এ উঠতে চেষ্টা করে। এই সময় অন্যান্য সক্ষম শিশুরা তাকে বাধা দেওয়ায় সে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করে এবং ক্রোধভরে শিক্ষিকার কাছে গিয়ে অপূর্ব্ব ভাষায় সে তার অভিযোগ ব্যক্ত করলো। তারপর সে রীতিমত আক্রোশের সঙ্গে শিক্ষিকার কাপড় ধরে তাঁকে টেনে আনলো খেলার মাঠে এবং শিক্ষিকা তার মনোভাব বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। লক্ষ্য করলে, এই ধরণের ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তাই শিশুকে জানতে হলে. বুঝতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে সহজেই তার ধ্বনিময় ভাষা। ধ্বনি শিশুমনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কারণেই ধ্বনির উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা শিশুদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করা সহজ। এই ধ্বনিবিন্যাসেরই বিচিত্র সমাবেশ-কৌশলে সৃষ্টি লাভ করেছে সঙ্গীতবিজ্ঞান। তাই, সঙ্গীতের সাহায্যেও যে অতি সহজেই শিশুমনের অতি নিকটে পৌছান যায়, একথা সহজেই অনুমেয়।

সঙ্গীত মানুষের প্রাচীনতম বিদ্যা। পৃথিবীতে মানবসৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। ভাষা সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্ব্বে মানবমনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি যাবতীয় আবেগ-অনুভূতি ব্যক্ত হতো বিশিষ্টধরণের স্বরসংযোগে। সুখ, দুঃখ ও গভীরানুভূতির প্রকার ভেদ অসংখ্য; তাই শুধু ভাষার দ্বারা সেই সকলের সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ও পার্থক্য সম্যকভাবে প্রকাশ করা যায় না। একটি শব্দের উচ্চারণে যতপ্রকার স্বরভঙ্গী প্রযুক্ত হয় তার অর্থও হয় তত প্রকারের। একটি "হাঁ", কিংবা "না", এমনভাবে বলা যায় যে বলার ভঙ্গী ও ধরণ অনুসারে তার বিভিন্ন অর্থ সূচিত হয়। সুতরাং স্বরভঙ্গীর বহুল বৈচিত্র্যই

সঙ্গীত। মনের ভাব কেবল ভাষায় ব্যক্ত ও বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু স্বরভঙ্গীর দ্বারাই স্পষ্টীকৃত হয়। যেমন "আঃ", এই শব্দটি—স্বরভঙ্গীর বৈচিত্র্যে একাদিক্রমে দুঃখ, বিরক্তি, বিস্ময় ও আনন্দসূচক বিবিধ অনুভূতি প্রকাশ করে; বিভিন্ন ভাব ও আবেগ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। এই স্বরবৈচিত্র্যের সুসঙ্গত পরিণতি বিকাশই সঙ্গীত, এবং ধ্বনিবিন্যাসের অভ্যাস ও চর্চ্চার ফলে মানবসমাজে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যার উৎপত্তি।

শিশুর মনোজগতের বিচিত্র বিকাশের সহায়কভাবে সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের প্রয়োজন। দেখা গেছে সঙ্গীতানুরাগের উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করবার সুযোগ পেলে শিশু আপনা হতেই সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে ওঠে। এ রকম অনেক দেখা যায় যে, ৩ বৎসর বয়সের শিশু তবলা বাজান বা গান গাওয়ায় চমকপ্রদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, শিশুটির গৃহ-পরিবেশে যথেষ্ট সঙ্গীতচর্চ্চা হয়ে থাকে। এইসঙ্গে শিশুর বংশানুক্রমিক ক্ষমতাও বিচার্য্যের বিষয়, যেমন 'গাইয়ে-বাজিয়ে'র সন্তানেরা গান-বাজনায় স্বভাবতঃই পারদর্শী হয়ে ওঠে। এই সূত্রে ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা থেকে আমার কথাটি আরও সুস্পষ্ট হবে। 'বাপী' ও 'মিঠু' দুই ভাই। তাদের বাবা সঙ্গীতশিল্পী। মা'ও চমৎকার গান গাইতে পারেন। সঙ্গীত সম্পর্কে উভয়েরই উৎসাহ যথেষ্ট। বাপী তাঁদের প্রথম সন্তান, জন্মের পর থেকে অনেকদিন মামার বাড়ী ছিল। জন্মাবধি মায়ের গান শুনে বাপীর সঙ্গীতানুরাগ যথেষ্ট হলেও সে আশ্চর্য্যজনক কিছু ক্ষমতা দেখাতে পারেনি। মিঠু তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তান। জন্মের পর থেকেই সে বাবার কাছে থেকে, পাশে বসে তাঁর গান ও সঙ্গীতাভ্যাস শুনেছে। আমরা দেখেছি, ৮ মাস বয়স থেকেই মিঠু বাবার গানের অনুকরণ করে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে টুং টাং করতে সুরু করেছে; এবং যখন তার ১ বৎসর বয়স হল, তখন সে বেশ তালে তালে হাত নাড়তে পারত। পরে বাপীও এসে যখন পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করে, তার মধ্যেও সঙ্গীতের স্ফূর্ত্তি বেশ দ্রুতগতিতে প্রকাশ পেতে লাগল। এক্ষেত্রে, বাপী ও মিঠু দুজনেই পিতামাতার গুণের স্বাভাবিক অধিকার লাভ করেছে, কিন্তু একজন জন্মাবধি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সহায়ক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করায় অতি সহজেই তার আত্মগত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে এবং অন্যটির সেই গুণ প্রকাশ

পেতে কিছুদিন সময় লেগেছে। কিন্তু বংশগত গুণার্জ্জনের সৌভাগ্য যাদের নেই তারা যে সঙ্গীত-রসে বঞ্চিত থাকবে, একথা ঠিক নয়। গানের সমঝদারের সঙ্গীত-প্রবণতা সাধারণতঃই স্বোপার্জ্জিত। তাছাড়া দেখা গেছে উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার সাহায্যে বহু গায়ক ও বাদক সঙ্গীতামোদী সমাজে স্থান পেয়েছেন।

শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সঙ্গীত শিক্ষারও বিভিন্ন স্তর হওয়া উচিত। শুদ্ধ ৭টি, এবং বিকৃত ৫ টি, অর্থাৎ ১২টি স্বর ছাড়াও সূক্ষ্ম বিচারে অধিকতর স্বর সংযোগের ফলে সর্ব্বসমেত ১৯টি স্বরভঙ্গী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। এই ১৯টি স্বর ছাড়া, ২২টি 'শ্রুতি'র ব্যবহারও আমাদের দেশীয় সঙ্গীতে প্রয়োগ করা হয়। কাজেই সুর-বিন্যাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের প্রভাবে সঙ্গীত চর্চ্চাও জটিল হয়ে পড়ে। সঙ্গীত সেইজন্য সহজে আয়ত্ত হয় না; তাতে সাধনার প্রয়োজন। রসের ক্ষেত্রেই হোক, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক সর্ব্বত্রই একটা ধারাবাহিকতা আছে, কোথাও প্রকট, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে ধারাবাহিক ভাবে সার্থক করে তুলতে হয় অভ্যাসের দ্বারা, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই রসবোধ ও সুরবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে শিশু ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশে সমর্থ হবে। কিন্তু এইখানেই শিশু সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বেশ অভাব বোধ করে থাকি। বিদেশী সাহিত্য বা কণ্ঠসঙ্গীতে কেবলমাত্র শিশুদের জন্য বিশেষভাবে রচিত ছড়া ও গানের বহু উদাহরণ আছে; কিন্তু এদেশে আমরা শিশু সাহিত্য বা সঙ্গীতে আজও সেরকম সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি নি। এইজন্য দেখা যায় যে শিশুশিক্ষায় এদেশে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন সব সুর ও কথার সমাবেশ এসে পড়েছে যা শিশুচিত্তের পক্ষে জটিল ও দুর্বোধ্য। যথা—একটি শিশুসদনের উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শোনা গেল ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুরা গাইছে—"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন।" ঐ গানটির অন্তরায় স্তবকটিতে আছে—

"শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে, যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন সকালে।"

আমি ঐ শিশুগুলির খুব কাছেই বসেছিলাম। "সব খোওযাবার সময় আমার" না বলে অধিকাংশ শিশুই বলছিল—"সথ্য আমার সময় আমার" ইত্যাদি। ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদের পক্ষে ঐ গানটি উপযুক্ত কি না, তাও বিচার্য্য। প্রত্যেক গানের প্রতি কথাই বুঝে, বেশ হৃদয়ঙ্গম করে, তবে শিশু গান গাইবে—এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু তবুও শিশুর সহজানুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ব্বাচন করে তাকে গান শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষিকার। যেখানে সঙ্গীত শিক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে সুরই প্রধান ও মুখ্য এবং ভাষা গৌণ হলেও তাতে খুব ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কথাই সব নয়। বাক্য যা বলতে পারে না গান তা প্রকাশ করে। সুরের রস আর কবিতার রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও এদের সুষ্ঠু মিলন হতে পারে।"(৩৬) তবে সুর ও ভাষার মধ্যে যতটা স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গতি রক্ষা করা যায়, শিশুশিক্ষা-ক্ষেত্রে ততই ভাল। কারণ সঙ্গীত-কলা এবং ভাষানুরাগ এই দুটিই আমাদের সঙ্গীতের মাধ্যমে শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুকে আমরা শুদ্ধ গানের সঙ্গে যেমন পরিচিত করাতে চাই, তেমন দিতে চাই সুললিত ভাষার সন্ধান।

শৈশবে খুব সহজ ও সরল গান শেখালে শিশুর মন খুশিতে ভরে ওঠে। সেই গানের সঙ্গে থাকা চাই শিশুর অতি পরিচিত জিনিষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তখন তাকেই কেন্দ্র করে শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ়রূপে স্থাপন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছেলেবেলা" বইটিতে সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—"ছেলে-মানুষি ছেলেদের আপন জিনিষ আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দিবুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তাছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল—বায়াতব্‌লার বোলের তোয়াক্‌কা রাখে না। আপনা আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো হয় মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে ; শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর সুরু সেই ছড়ায়, এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।" (৩৭) আমরা আমাদের নার্সারি স্কুলে সচরাচর ছড়াগুলিতে সুর দিয়ে গান শিখিয়ে থাকি। ২।৩ বছর বয়সের শিশুর দল "আয়রে পাখী লেজঝোলা", "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর", "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো", "আয়

(৩৬) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান—৪ পৃষ্ঠা।

(৩৭) রবীন্দ্রনাথ—ছেলেবেলা—৩২ পৃষ্ঠা।

আয় চাঁদমামা", ইত্যাদি গানের সুরের তালে তালে গেয়ে চলে। এ সময়ে কোনও বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গৎ করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "কলটেপা সুরের গোলামী" করা হয় না। ৪।৫ বছর বয়সের শিশুরা এর চেয়েও আরও একটু জটিল ও পরিণত ধরণের (mature) গান চায়। তারা গায়—"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "ফুলের পোষাক পর্‌বো", ইত্যাদি। এ সময় খঞ্জনি, করতাল প্রভৃতির সাহায্যে তাল রাখা যেতে পারে, কিংবা অপরাপর বাদ্যযন্ত্রও এই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

শিক্ষাপ্রসারে পাশ্চাত্য দেশের পরিণতি আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করা উচিত কেননা, সে-দেশে শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি যে সুদুর প্রসারী, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সঙ্গীতকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে ধরা হয়েছে বলে, পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতির এবং অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেখানে শিশুশিক্ষাকে অবহেলা করে যুবশিক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়নি। প্রত্যেক শিশুশিক্ষায়তনেই নানারকম গান বাজনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং যার গান বাজনার প্রতি বেশী আগ্রহ দেখা যায় তার সেই আগ্রহকে কেন্দ্র করে অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সে দেশের প্রতিষ্ঠানে পিয়ানো, গ্রামোফোন; রেডিও, percussion band না থাকলে চলে না, এবং শিশুরা ইচ্ছামত এগুলি শিক্ষিকার সাহায্যে ব্যবহার করতে পারে। জনসাধারণও সে দেশে শিশুশিক্ষার জন্য এতই আগ্রহান্বিত যে "ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন" ("B.B.C.") হতে প্রত্যেক দিন মধ্যাহ্নে শিশুজনোচিত গল্প ও গান শোনাবার ব্যবস্থা আছে এবং এইজন্য B. B. C.র কর্তৃপক্ষগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিযুক্ত করে থাকেন। এই সব নানা ব্যবস্থার ফলে যার যেমন প্রতিভা তার স্ফূরণ হওয়া সহজতর ভাবেই সম্ভব হয়।

কেবল বর্ত্তমান যুগে নয়, সুদুর প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমক সভ্যতার যুগে, এবং মধ্যযুগেও আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, সে সময়েও সঙ্গীতকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। অন্যতম শিক্ষাবিদ ফ্রোবেল সঙ্গীতকে শিশুশিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। মন্তেসরি

নীতি অনুসারে যে সকল শিশুপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, সে সকল স্থানেও সঙ্গীতের স্থান অতি উচ্চে। প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষায় যে সঙ্গীত অপরিহার্য্য, একথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত এবং বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাবিদগণ সঙ্গীতের বিভিন্নমুখী প্রয়োগদ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষার লক্ষ্য জীবন গঠন। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়, শিক্ষার ভিতর দিয়েই তার জীবনকে একটা বিশিষ্ট আদর্শ অনুসারে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়। তাকে যা' কিছু শেখান হবে তা' যেন সমভাবে তার দেহ, মন ও প্রাণের পরিপুর্ণ বিকাশে সহায়তা করে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। এইভাবে শিশু দিনের পর দিন তার দেহ, মন ও প্রাণের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, এই-ই হওয়া চাই আমাদের লক্ষ্য। সঙ্গীতশিক্ষা এবিষয়ে কিভাবে সহায়ক হয় এখন তারই বিচার করা যাক।

দৈহিক বিকাশ না হলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা হয় না। সঙ্গীতের সাহায্যে অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারিরীক বিকাশও যথেষ্ট হয়। অনেকের ধারণা যে জ্ঞানার্জ্জনের পথে সঙ্গীত প্রতিবন্ধক মাত্র। কিন্তু চিকিৎসকগণের অভিমত যে, সঙ্গীত দেহের ক্লান্তি দূর করে, মস্তিষ্ক সবল ও সুস্থ করে, দেহের সব অবসাদ ঘুচিয়ে শিশুর শিক্ষালাভে সহায়তা করে। গান গাইবার সময় কণ্ঠের সূক্ষ্ম ও স্থূল মাংসপেশীর সঞ্চালন হওয়াতে পেশীগুলির ব্যায়াম হয় এবং সেগুলি সুস্থ থাকে; জিহ্বার জড়তা দুর হওয়ায় শব্দোচ্চারণ পরিষ্কার হয়, এবং গাইবার সময় নিঃশ্বাসের সংযম ও সমন্বয় রক্ষা করতে হয় বলে ফুস্‌ফুস্‌ ও বুকের পেশীসমুহেরও কার্য্য সুপরিচালিত হয়ে থাকে। ইউরোপে নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায় অপেক্ষা প্রকাশ্য গায়ক ও বক্তার ব্যবসায় দীর্ঘায়ুর পক্ষে সানুকূল।

সঙ্গীতের একটি অঙ্গ নৃত্য। নৃত্যের সময়ে শরীরের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারা যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। শিশুদের নৃত্যে বেশীর ভাগই অঙ্গসঞ্চালন বোঝায়। এর ফলে তাদের যথেষ্ট পরিমাণেই শারিরীক ব্যায়াম হয়ে থাকে। নৃত্যের ভঙ্গিমায় দেহ সুগঠিত ও দেহ-ভঙ্গী সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়। খুব ছোট শিশুরাও সহজ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ব্যায়াম করতে পারে। ৫ থেকে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা "চল্‌ কোদাল চালাই", "আমরা চাষ করি আনন্দে", "কষে দাঁড় টান্‌" প্রভৃতি

গানের সঙ্গে অঙ্গচালনা করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশে অনেক ভাল লোকনৃত্য-পদ্ধতি আছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-দেশীয় নৃত্যভঙ্গিমায় অঙ্গচালনা যে কত ব্যাপক ও স্বাস্থ্যের অনুকূল তা ভুলে গেলে চলবে না। এগুলি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করে যদি শিশুশিক্ষার অন্তর্গত করে নেওয়া যায়, আমাদের জাতীয় শিক্ষা যে প্রভূতরূপে উপকৃত হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। "দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটীরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।" (৩৮) রবীন্দ্রনাথের এই বাণী, বহু পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উদ্দেশ্যে বলা হলেও, আজ আমাদের সকলেরই স্মরণীয়।

সঙ্গীতের সাহায্যে যেমন শিশুর বাচন ও শ্রবণশক্তি বিকশিত হয় তেমনি সূক্ষ্ম আনুভূতিক ক্ষমতা সুরের মূর্চ্ছনায় বিকাশ লাভ করে। আনন্দানুভূতি শিশুর সহজাত বৃত্তি ; হাসি ও খেলা, সেই আনন্দানুভূতির প্রকাশ। সঙ্গীত শিশুর এই আনন্দানুভূতির সহজ প্রকাশে সহায়ক। সুর, তার এই অনুভূতিকে নির্ম্মল করে তোলে, চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলিকে পূর্ণতা দান করে। মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে শিশুর মনে আসে স্নিগ্ধ কোমল ভাব, ক্রমে তার এই ভাবানুবেগ হতেই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সুরলহরী যে আনন্দবোধ জাগায়, শিশুরা তারই প্রভাবে সঙ্গীতের তালে তালে অঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা মনের ভাবপ্রকাশের সুযোগ পেলে খুবই খুশি হয়। গানের ছন্দ তাদের কার্য্যকলাপও ছন্দোবদ্ধ করে তোলে। শিশু যখন নিজেই বুঝতে পারবে যে, গান শেখা বা শোনার সময় চেঁচামেচি কি হুটোপুটি করলে আনন্দবোধ ক্ষুণ্ণ হবে, তখন সে চুপ করে বসে থাকতে শিখে। এই ভাবে তার আত্মসংযমের শক্তি বেড়ে উঠে, ধীরে ধীরে তার মন ও দেহ শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

শিশুকে সৌন্দর্য্যপ্রিয় করতে, সঙ্গীতের দান অনবদ্য। সুন্দরের উপাসনার ভিতর দিয়েই অসুন্দরকে জয় করা যায়। উৎসবের মাধ্যমে শিশুর সৌন্দর্য্যবোধ জাগরিত হয়, কেননা সঙ্গীতই উৎসবের প্রাণ-কেন্দ্র। উৎসব মণ্ডপের সজ্জা, গায়ক-

(৩৮) রবীন্দ্রনাথ—সঙ্কলন : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৬ পৃষ্ঠা।

গায়িকার সজ্জা, তাদের উপবেশন ভঙ্গী ও নৃত্যভঙ্গী দ্বারা কিভাবে সমস্ত উৎসবটি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হতে পারে, শিশু শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তা' শিখবার সুযোগ পায়। এখানে শিশুই কর্ম্মী, শিক্ষিকা শুধু সহায়ক। শিশু এই সকল কার্য্যে যে কর্ম্মানুরাগ দেখায়, তা আশ্চর্য্যজনক। দেখা যায় যে প্রথমে, শিশুরা গানের অর্থ নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামায় না। সুরের মাধুর্য্যই তাদের কাছে অধিক প্রিয়। একদিন একখানা ইংরাজী বাজনার রেকর্ড বাজিয়ে কয়েকটি ৫।৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শুনান হয়। বাজনা আরম্ভ হতেই তারা আনন্দে তালে তালে হাততালি দিতে সুরু করে। বিদেশী বাজনা হলেও তার ভিতর সত্যই যে আনন্দের সুর ছিল তা অতি সহজেই শিশুরা গ্রহণ করতে পেরেছিল। সঙ্গীতের সাহায্যে মানসিক ও আনুভূতিক বিকাশ সহজতর হয়। একথা সত্য এবং স্বীকার্য্য।

মানসিক ও আনুভূতিক বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হলো সামাজিক বিকাশের। সামাজিকতা বোধ না জাগলে মানুষ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সঙ্গীতের সাহায্যে শিশুমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখে, শিশু বোঝে যে গান গাইবারও বিশেষ নীতি আছে এবং গানের সময় সেই নীতি বা নিয়ম মেনে চলতে হয়। গানের সুর, তাল, লয় ইত্যাদি সব কিছু সুন্দরভাবে না মেনে গান করলে গানের মাধুর্য্য নষ্ট হয়, কাজেই তাকে নিয়মের সীমায়, শৃঙ্খলার গণ্ডীতে বাঁধতে হয়। এই শৃঙ্খলা বা নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে চললে শিশু সামাজিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। সমাজে বাস করতে গেলে সমান তালে পা ফেলে সকলের সঙ্গে চলতে হয়। এই শিক্ষার গোড়াপত্তন হওয়া চাই অতি শৈশবেই।

গানের ছন্দময় ঝঙ্কার, ছত্রে ছত্রে মিল শিশুর মনকে দোলা দেয়, শিশুর তাল ও লয় জ্ঞানের উন্মেষ হয় এই সূত্রে। ফলে, একটি নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানকে শিশু সমানভাগে ভাগ করতে শেখে। ক্রমে ক্রমেই লয়জ্ঞানের সুফল শিশুর অন্যান্য কার্য্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। সবার সঙ্গে একত্র চলা, এক সঙ্গে গাওয়া, এক সঙ্গে আবৃত্তি করা—সবই হয়ে যায় তখন অনেক সহজ। লয় জ্ঞান শিশুচিত্তে যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তারই প্রভাব দেখা যায় যখন শিশুরা মিলে মিশে নেচে নেচে গান গায়। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার একটি ছন্দ-মাধুর্য্য তাদের কাছে ক্রমশঃ ধরা পড়ে।

কোন কোনও শিশু স্বভাবতই খুব লাজুক, কোনও ছেলেমেয়ে অত্যন্ত

রুক্ষস্বভাবের, কোনও শিশু আবার সর্ব্বদাই বিমর্ষ। কিন্তু সুরলহরীর এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই নানাবিধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু সুরের সাহায্যে নিজেদের ক্রটিগুলি শুধ্‌রে নিতে পারে। সুরের প্রভাবে লাজুক শিশুর সকল সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়, রুক্ষ স্বভাবের শিশুর ভ্রূকুটি মিলিয়ে যায়, সদা বিষণ্ণ শিশুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, অসামাজিক শিশু যেন মন্ত্রবলে সামাজিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। আমাদের নার্সারি স্কুলে প্রতি বৎসর একবার করে "মায়েদের আসর" ("Mothers' day") বসে। এইদিন ছেলেমেয়েদের মায়েরা এসে সারা বৎসর তাঁদের শিশুসন্তানেরা কি শিখল, তার কিছু কিছু নমুনা দেখেন। এছাড়া তাঁরা শিক্ষিকাদের সঙ্গে অবাধে আলাপ পরিচয় করেন। এই আসরের অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার অনেক দায়িত্বই আমরা আমাদের বড় ছেলেমেয়েদের উপর ন্যস্ত করি। ফুল, লতা, পাতা সংগ্রহ করে আসর সাজান, বাড়ী থেকে মনে করে পোষাক পরিচ্ছদ আনা, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, এ সমস্ত কাজের ভার তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। তারাও খুব ভাল ভাবেই সমুদয় দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে এবং প্রাণপণে নিজেদের কাজ সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। এইভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে শিশুগণ সামাজিক আচারব্যবহার, ভদ্রতা, ভব্যতা এবং সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যপরিচালনার অভ্যাস লাভের সুযোগ পায়।

ম্যাদাম মন্তেসরী মিলানের "Children's House" (শিশু নিকেতন)-এর সঙ্গীতাভিজ্ঞা পরিচালিকাকে শিশুদের সঙ্গীত বোঝার যোগ্যতা ও শিশুদের উপর সঙ্গীতের প্রভাব নির্ণয় করার জন্য কতকগুলি পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেন। পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, সঙ্গীত শোনার ও অভ্যাসের পরে শিশুরা ক্রমশঃ অভদ্র ব্যবহার ও আচরণ পরিত্যাগ করে। তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তারা বলে যে, অভদ্রভাবে দাপাদাপি বা ছুটাছুটি করা শোভন নয়। কতকগুলি নৈতিক উপদেশের সাহায্যে আমাদের যে-সব উদ্দেশ্য সফল হয় না, অতি সহজে এবং মনোরম ভাবে সঙ্গীতের সাহায্যে তা সুসম্পন্ন হয়।

"It may make a great difference to a child's nervous health whether he is surrounded by soft encouraging voices and quiet steps or by harsh and shrill tones, frequent

scoldings and banging of doors." (৩৯)—ইংলণ্ডের স্বনামধন্যা শিশুশিক্ষাবিদ স্যুজান্ আইজাক্স্ বলেন, "কোমল, সস্নেহ বাক্য ও ধীর গতিভঙ্গীর অনাবিল শান্তি এবং রূঢ় ও কঠোর কণ্ঠস্বরে অনবরত তিরস্কার ও বিরক্তিব্যঞ্জক ব্যবহার (যেমন, সশব্দে পদচারণা অথবা সজোরে দ্বাররুদ্ধ করার শব্দ) এই দুইটি বিভিন্ন ব্যবহারের দ্বারা শিশুজীবনের মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়।" সঙ্গীত সম্পর্কে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে দূরে সরে যায়।"(৪০)··· গান জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটি প্রধান উপাদান। ছোট ছোট ভজন, সহজ ও সুন্দর ধর্ম্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে শিশুর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি সহজেই গড়ে উঠবে।

একসঙ্গে ১০।১৫ মিনিটের অধিক কাল পর্য্যন্ত সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, কারণ শিশুরা বেশীক্ষণ একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করে থাকতে পারে না। একথা পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। শিশুগণ বৃত্তাকারে বসলে শিক্ষিকা গান আরম্ভ করবেন এবং তিনি গাইতে সুরু করলেই শিশুরা আপনা থেকেই শান্ত হয়ে উঠবে, বাঁশী বাজিয়ে বা হাততালি দিয়ে তাদের শান্ত করার প্রয়োজন হবে না। সমগ্র গানটি দু'বার গাইলে শিশুরা ধীরে ধীরে যোগ দিতে চেষ্টা করবে। শিক্ষারম্ভের জন্য একটি স্তবকই যথেষ্ট। শিশুরা স্বভাবতঃই সুরগ্রাহী। তিন চার বার গানটি গাওয়া হলেই দেখা যাবে যে, অনেক শিশুই গানটির সুর বেশ ধরে ফেলেছে।

গান গাইবার সময় শিক্ষিকা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, যাতে সকলেই গানে যোগ দেয়। অনেকে লাজুক, তাদের সহানুভূতির সঙ্গে উৎসাহিত করতে হবে; অনেকে আবার "বেসুরো", অথচ ভীষণ চেঁচিয়ে গান করে, তাদেরও সস্নেহে মৃদুভাবে সংশোধন করতে হবে। অনিল ও অলোক দুই ভাই, তাদের দুরন্তপণায় সামাল্ দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক উপায় খুঁজে বার করতে হয়, তার মধ্যে বিশেষ উপায় হলো—সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কন। গানের সময় এই দুটি ভাই এমন

(৩৯) Susan Isaacs—Social Development in Young Children.
(৪০) শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান।

জোরে গান করে যে, মনে হয় এই বুঝি তাদের গলার শির ফেটে যাবে! আমি সকলকে থামিয়ে একবার নিজে খুব জোরে গান করে প্রশ্ন করি—"এমন করে গাইলে কি ভাল লাগে?" তখন অনিল ও অলোকই সর্ব্বাগ্রে উত্তর দেয়, "না।" যাদের গলা বেস্থরো তাদের বার বার করে গানটি শোনাতে হয় এবং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। বেস্থরা গলা অবশ্য একদিনেই স্থরে আসে না, কিন্তু প্রত্যেক দিনের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি দেখা যায়।

শিশুশিক্ষিকার গান গাইতে পারা খুব বিশেষ একটি গুণ। কিন্তু যেক্ষেত্রে শিক্ষিকা নিজে গাইতে পারেন না, সেখানে তিনি অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। অনেক সময়ে মায়েরাই সানন্দে এই বিষয়ে তাঁর সাহায্য করবেন। শিশুদের কাছে প্রথম হতেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের নমুনা সর্ব্বদাই তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত। শিশুরা যখন সমবেতভাবে গান গাইতে গাইতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন মাঝে মাঝে তাদের একাকী গান করালে, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এই সময়ে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ, সর্ব্বদাই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে শিশুগণ কখনও সাহস করে একাকী গান গাইতে পারবে না। সবশেষে বলতে চাই যে, শিক্ষিকাকে বিশেষ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্না হতে হবে। শিশুদের গান শেখানো খুব শক্ত কাজ, কিন্তু গান শেখাতে গিয়ে শিশুর প্রাণের সহজ আনন্দ যেন অন্তর্হিত ও নষ্ট না হয়ে যায়, এ বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

গল্প—ছেলেবেলায় আমরা কত যে রূপকথা শুনেছি, তার সংখ্যা নেই। সেই সকল রূপকথা শুনতে শুনতে কত যক্ষরাজ্য, পরীরাজ্য, ইন্দ্রপুরী, পাতাল-পুরী, প্রভৃতির মধ্যে সশঙ্ক ও সকৌতুকচিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার ক্ষীণ স্মৃতি এখনও মনে পুলকময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেকালে রসিকা ঠাকুর-মা, দিদিমা—কখন কখন ঠাকুরদাদা, দাদামশায়রাও—এই সকল রূপকথা শোনাতেন; মনে হতো তাঁদের বুঝি আছে এর অফুরন্ত ভাণ্ডার। আজকাল কিন্তু অনেক সময়ে নিজেদের বাড়ীর মধ্যেই দেখি যে, ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাবার লোকের যেন নিতান্তই অভাব ঘটেছে। যে বিমল আনন্দের ভিতর দিয়ে আমরা ছেলেবেলায় মানুষের স্নেহ, প্রীতি, মমতা, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, দুঃখ, শোক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, সেই পথ আজ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। শিশুর কল্পনাক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ

হয়ে পড়েছে। এ' বড় সুখের কথা নয়, তাই শিশুশিক্ষায় গল্পের ব্যবহার যতই প্রসারিত হয়, ততই মঙ্গলের কথা।

রূপকথা কিংবা গল্প বলার একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী আছে। কবিতাপাঠের ন্যায় এর যতি আছে, ছেদ আছে, বিরাম আছে। কবিতার ন্যায় রূপকথার বর্ণনভঙ্গী ছন্দের তালে তালে অগ্রসর হতে থাকে—এই বর্ণনায় ছন্দ পতনের অবকাশ নেই। মনে পড়ে, যেই সুরু হতো "এক ছিলেন রাজা আর এক সওদাগর"—মন যেন এক মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে যেত। তখন নানা রঙের রঙীন সূতো দিয়ে জাল বুনে মন এক রাজ্য হতে আর এক রাজ্যে বিচরণ করত, বাস্তবের সঙ্গে তখন মনের সম্বন্ধ থাকত না বললেই চলে। নার্সারি স্কুলে শিক্ষিকা যখন গল্প বলবেন, তখন তাঁকেও নিজের মনের সেই মুগ্ধাবস্থা স্মরণ করতে হবে, তাহলেই তিনি গল্পের মাধুর্য্য ও উপকারিতা বুঝতে পারবেন। তখনই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সামাজিকতা মানবতা ইত্যাদি যে-গুণগুলি আজ আমরা নানা উপদেশ-ছলে শিশুমনে বিকশিত করতে চেষ্টা করে নানাভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ছি, সেই সকলের বহু আদর্শ এই রূপকথাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কত বিচিত্র সুখদুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষিকা আপনার ক্ষমতায় সেগুলি চয়ন করে নিয়ে শিশুকে পরিবেশন করবেন, এই হলো নার্সারি স্কুলে গল্প বলার উদ্দেশ্য।

গল্পগুলির সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের মধ্যে সহজ-সম্ভবতা রক্ষা করে যিনি গল্প বলতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শিশুদের গল্প বলার যোগ্য। শিশুর কল্পনাশক্তি প্রখর; সে অতিশয় সহজে, স্বল্পায়োজনের মধ্যে নিজের খেয়ালখুশি তৃপ্ত করবার জন্য ইচ্ছামত সৃজন করতে কিংবা ধ্বংস করতে পারে। এই সত্যটিকে মনে রাখলে, শিশুকে গল্প বলা কঠিন হবে না। আমাদের একটা মূর্ত্তিকে মানুষ বলে কল্পনা করতে হলে সেটিকে ঠিক মানুষের মত করে গড়তে হয়; কিন্তু শিশু এক টুকরা কাঠ বা একটি কাপড়ের পুঁটুলিকে অনায়াসে মানুষ কল্পনা করে', তাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এইখানেই পূর্ণবয়স্ক মানবমনের ও শিশুমনের পার্থক্য। শিশুর কল্পনার ক্ষেত্রে অতীতের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে, তার কাছে বর্ত্তমানের মূল্যই সবচেয়ে বেশী। গল্পের মধ্যে যেটুকু তার ভাল লাগে সেটুকুই সে

নিজের মনে স্থান দেয়, এবং অমনোনীত ঘটনাগুলি অনায়াসে সংশোধন করে নিতে কিংবা নিতান্ত শ্রান্তিকর ঘটনাগুলি একেবারে ত্যাগ করতে তার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। তার কাছে কোন কিছুই অদ্ভুত নয় কারণ তার কাছে অসম্ভবও কিছু নেই। এইজন্য গল্পের মধ্যে কিছু কিছু অদ্ভুত কিংবা অসম্ভব থাকলে কোনই ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ভালই। কেননা, গল্পের মধ্যে নূতনত্ব থাকলে শিশুর মনে সেটা আঘাত করে এবং শিশু সে সম্বন্ধে চিন্তা করে। কল্পনা কখনও সংযত, ধীর, স্বচ্ছন্দ গতিতে গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়, কখনও বা অসংযত উদ্দাম-কল্পনা বল্‌গামুক্ত অশ্বের মত বিদ্যুতগতিতে অগ্রসর হয়। কাহিনী যদি বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়, তাহলে শিশু অচিরেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। এইজন্য গল্পের মধ্যে কখনও ধীর ও সংযত ভাষা ব্যবহার করা উচিত, কখনও বা কল্পনার লাগাম শিথিল করে শিশুকে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে দেওয়া ভাল।

যে কাহিনী কেবলই কল্পনার উপর ভর করে রচিত হয়, তার মধ্যে একটি বড় দোষ আছে—শিক্ষিকাকে সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে গল্প গড়ে ওঠে না, বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলে গল্প রীতিমত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ হয়—শিশুবয়সে দীর্ঘগল্পগুলির অর্থ ধরে শিশু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। তাই শিশু চায় কাল্পনিক গল্প। স্থান বা সময়, সম্ভব কি অসম্ভব, কোন কিছুই শিশুর কল্পনাতে বাধা সৃষ্টি করে না, কাজেই পরী, রাক্ষস, রাক্ষসী, সবাক্ জন্তু জানোয়ার সকলকেই স্বচ্ছন্দমনে শিশু মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। শিশুর নিজস্ব পরিবেশ হতে বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ করে কল্পনার সূত্রে সেগুলি গেঁথে নিলে শিশুর জন্য সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প গড়ে ওঠা সম্ভব।

আনন্দের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাই হয় স্থায়ী। যে পদ্ধতিতে শিশু সহজে ও খুশি মনে কোন কিছু শেখবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসে, সেই পদ্ধতিই শিশুশিক্ষায় গ্রহণ করতে হবে। নানা পদ্ধতির মধ্যে গল্পও একটি অন্যতম পদ্ধতি, যার দ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হতে পারে। এখন দেখা যাক, নার্সারি স্কুলে গল্প বলতে হলে শিক্ষিকাকে কি ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

প্রথমতঃ, শিশুর বয়স অনুসারে গল্প নির্ব্বাচন করতে হবে। অধিকাংশ শিশুই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, কিন্তু তাদের সকলের আগ্রহশীল ঔৎসুক্য (span of interest) সমান নয়। ২ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুরা গল্প শোনবার বা বুঝবার সীমায় প্রায়ই আসে না, কাজেই তাদের কাছে এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের কাছে যদি একই গল্প পরিবেশন করা যায়, তবে আমাদের আয়োজনও যেমন এক দিকে ব্যর্থ হবে, তেমন অন্যদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও হবে বিফল। গল্প পরিবেশনের অর্থ এই নয় যে, বক্তা অনর্গল বলেই যাবেন এবং শ্রোতা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে নির্ব্বিচারে শুনেই যাবে। গল্প এমন হওয়া উচিত, যাতে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং আপনা হতেই গল্পের পুনরুক্তি করবার জন্য তারা ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে। গল্পের দ্বারা শিশু যদি মুখ খুলতে না শেখে, কিংবা চিন্তা করে কথা বলতে না পারে, তবে শিশুর জীবনে তেমন গল্পের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়তঃ, গল্প নির্ব্বাচনের সময় তার বিষয় বস্তুর মধ্যে কিছু শিক্ষা-সম্ভাবনা আছে কি না, তা দেখতে হবে। যে গল্পটি বলা হবে, তার দ্বারা শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ, বাগ্মিতার সূচনা, সৃজনীশক্তির চেতনা, এবং আনুভূতিক ও সামাজিক গুণগুলি বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ, তা' বিচার করে দেখা উচিত। একটি কথার টানে, কিংবা কথার ছবি দিয়ে যদি শিশুচিত্তে গল্পের সমগ্র চিত্রটি জাগিয়ে তোলা না যায়, তাহলে গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই অন্যান্য উপকরণ। একথাও বক্তাকে আগে থেকে ভেবে উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখতে হবে। নার্সারিতে গল্পের সঙ্গে আমরা উপস্থিত রাখি সুদৃশ্য ছবি, পুতুল নাচের সরঞ্জাম ও অভিনয়োপযোগী সাজ-সজ্জা, ইত্যাদি বিবিধ উপকরণ। যে কোন কাল্পনিক বিষয়বস্তু ছবির সাহায্যে উপস্থিত করলে শিশু গল্পের অর্থ সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। অত্যন্ত ভাব-প্রবণ ও কল্পনাবিলাসী যে শিশু, সে গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, মনের রঙে তার ছবি এঁকে ফেলতে পারে; কিন্তু সব শিশু সমান ক্ষমতার অধিকারী নয়। সুতরাং শ্রেণীর মধ্যে সমতা রক্ষা করবার জন্য সব শিশুকেই কম বেশী ইঙ্গিত দিতে হবে। এই ভাবে গল্পটি যে কেবল সহজ-বোধ্য ও সরস হবে, তা নয়, যে শিশু কেবল বর্ণনা শুনে চিত্তপটে তার ছবি আঁকতে পারে না, নানা রঙের তুলির স্পর্শে তার মানস-চক্ষু ক্রমশঃ উন্মিলীত হবে।

জ্ঞান বিস্তারের নিয়ম বা পদ্ধতি হলো, পরিচিত জগৎ হতে অপরিচিত জগতে অগ্রসর হওয়া। এটি হবে আমাদের আর একটি লক্ষ্যের বিষয়। ২½ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুর জানার গণ্ডী খুবই সঙ্কীর্ণ। তাদের সামান্য বয়স, ক্ষুদ্র ধারণা, ক্ষুদ্র তাদের অভিজ্ঞতা। এই সুকুমার, কোমল, পবিত্র শিশুদের অপরিণত মন ও হৃদয় স্বচ্ছ ধারণা ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করা, বিরাট দায়িত্ব ও নৈপুণ্যের কাজ। সেইজন্য প্রতিদিন নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকা সযত্নে ও সস্নেহে শিশুকে যে গল্পটি বলবেন তার পরিকল্পনা স্থির করবেন। দেবতার পূজা যেমন অবহেলা ভরে সম্পন্ন হয় না, তেমনি শিশুদেবতাকেও জীবনের মধুরতম, গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম সন্ধান দিতে হলে, হেলা-ফেলা করে তার প্রস্তুতি হতে পারে না।

"নূতন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে।
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটী না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি, দেখো দেখো, এ-বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিও না বিসর্জ্জন।"

—রবীন্দ্রনাথ—

গল্পনির্ব্বাচনের সময় দেখতে হবে যে, সেগুলি কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করে রচিত। সচরাচর আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করেই গল্প বলে থাকি। যথা—

(১) গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারের গল্প,
(২) রূপকথা,
(৩) মজার গল্প (হাস্য-কৌতুকাত্মক)
(৪) সহজ, পৌরাণিক গল্প—এবং,
(৫) অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের বিচিত্র গল্প।

গল্প বলার আগে শিক্ষিকা ভেবে দেখবেন যে, নির্ব্বাচিত গল্পটি বলতে তাঁর নিজের ভাল লাগবে কিনা। যে গল্প নিজের বলতে ভাল লাগে না, সে গল্প বলতে না যাওয়াই ভাল। গল্পটি মনোনীত হলে, সেটিকে একবার খাতায় লিখে নিলে, গল্পের বিষয় ও বস্তু সুপরিস্ফুট হয়। লেখার ধারা সম্পর্কে কয়েকটি মুল-নীতি অনুসরণ করতে হবে। যথা—

(১) বাক্যগুলি বেশ ছোট ছোট হবে ;

(২) গল্পের মধ্যে নূতন শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে ;

(৩) শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত যদি কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলির অর্থ উপকরণাদির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে ;

(৪) নূতন শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি হবে ;

(৫) গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পুরাতন শব্দের যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি থাকবে ;

(৬) চিত্রের সাহায্যে গল্পটি চিত্তাকর্ষক করে তোলা একটি প্রকৃষ্ট উপায় ; তার ব্যবহার করতে হবে ;

(৭) গল্পটি অভিনয়োপযোগী হলে, নাটকাকারেই সেটি লেখা ভাল হবে ;

(৮) ছড়া ব্যবহারের সুযোগ থাকলে, গল্পের সঙ্গে ছড়াও ব্যবহার করা ভাল ;

(৯) গল্পটি নিত্য নূতন ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে বটে, কিন্তু শিশুর আগ্রহ অব্যাহত থাকবে কি না সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গল্পটি লেখা হলে, শিক্ষিকা সেটি পাঠ করে দেখবেন যে, গল্পটি বলতে কত সময় লাগবে। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যেই গল্পটি শেষ করা ভাল। গল্প বলতে পারা একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা। কল্পনার তুলির সাহায্যে কখনও নিজের কণ্ঠস্বর ধীরে, কখনও উচ্চে খেলিয়ে, কখনও বা মুখভঙ্গী করে, কখনও বা প্রসন্নমুখে শিক্ষিকা গল্পটি বর্ণনা করে যাবেন। এইভাবে এমন একটি রসমাধুর্য্যভরা পরিবেশের সৃষ্টি হবে যেখানে মুগ্ধহৃদয় শিশুসন্তানগুলি মাতৃরূপিণী শিক্ষিকাকে ঘিরে নিতান্ত সরল বিশ্বাসে ও সহজ আনন্দে সেই বর্ণনাবহুল কাহিনীর মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে গল্প বলার যে পরিবেশটি রচনা করা হবে, তার মধ্যে চাই একটি ঘরোয়াভাব। শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বা ডেস্ক্, চেয়ারে বসে গল্প শোনার মত মন নিতান্ত কল্পনাপ্রবণ শিশুরও আছে কি না সন্দেহ। ছেলেবেলায় যেমন দিদিমার কোল ঘেঁসে বসে আমরা রূপকথা শুনেছি, বিদ্যালয়েও শিশু যখন রূপকথা শুনতে আসবে তখন চাই এমনই স্নেহস্পর্শ। আমরা সচরাচর যেভাবে আসন সাজাই, তার নমুনা এইভাবে দেওয়া চলে—

কাহিনী শুনতে শুনতে শিশু অনেক সময় এমনি তন্ময় হয়ে যায় যে, সে যে কেমন ভাবে বসেছে তা তার মনে থাকে না। তাছাড়া, গল্পের সময়টি হলো relaxation অর্থাৎ একটু আরামের সময়, তখন শিশুর মন থাকে সক্রিয় এবং শরীর থাকে মোটামুটি ভাবে নিষ্ক্রিয়। কাজেই, শরীরের ভাবগতিকে কিছু শৈথিল্য দেখা দিলে শিশুকে সে সম্বন্ধে সচেতন করতে না যাওয়াই ভাল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, উজ্জ্বল (৪ বছরের) ও চঞ্চল (৫ বছরের) দুটি ভাইয়ের কথা। গল্প শুনতে শুনতে দুটি ভাই-ই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে গল্প শোনে। এই দুজনকে আমি শ্রেণীর পিছনের সারিতে, দুইধারে বসতে দিই, যাতে তারা পা ছড়াতে পারে। একটি দলে ১৫ থেকে ২০ জন সমবয়সী শিশুর ব্যবস্থা থাকাই প্রকৃষ্ট। তাতে তাদের

কথাবার্ত্তা বলতে দেওয়ার সুযোগ যথেষ্ট দেওয়া হয় এবং শিক্ষিকাও তাদের প্রশ্নগুলি শুনে যথাযথ উত্তর দিতে পারেন।

গল্প বলার মধ্যে নানা উদ্দেশ্য আছে। তার মধ্যে, শিশুকে ভাষাশিক্ষা দেওয়া একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। দেখা গেছে যে, যেসব ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত পরিবেশ থেকে আসে তাদের শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আমাদের কাছে যেসব ছেলেমেয়েরা আসে তাদের অধিকাংশই বাস্তুহারা পরিবারের সন্তান। সচরাচর তারা বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক ভাষা (dialect) বলে থাকে। সেইজন্য তারা প্রথম প্রথম উচ্চারণ অশুদ্ধির ভয়ে বেশী কথা বলতে চায় না। অনেক সময়ে আমরাও তাদের কথা সহজে বুঝতে পারি না। গল্পের সাহায্যে এই অসুবিধা ক্রমশঃ দূর করা যেতে পারে। ভাষাশিক্ষা-পদ্ধতিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) গল্পক্রমিক, (২) বাক্যক্রমিক, (৩) শব্দক্রমিক এবং (৪) বর্ণক্রমিক। নার্সারিতে শিশুরা যে বয়সে আসে, তাতে প্রথমে গল্পক্রমিক পরে বাক্যক্রমিক ও শব্দক্রমিক ভাষাশিক্ষা পদ্ধতিই বেশী প্রযোজ্য। নার্সারি স্কুলে শিক্ষার শেষ বৎসরে শিশুর যদি মানসিক প্রস্তুতি হয়ে যায় এবং লেখা ও পড়ার জন্য সে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, তবেই তাকে বর্ণক্রমিকরূপেও শিক্ষা দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং সে সহজেই ছোট ছোট গল্প, ছড়া ইত্যাদি পড়তে পারে।

এখন দেখা যাক্ আমরা কিভাবে গল্পের সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বিখ্যাত "টুনটুনির বই" থেকে আমরা প্রায়ই গল্প বেছে নিই। এই বইটির গল্পগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, গল্পগুলি বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের জন্যই লেখা। তাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি গল্পেই একটি বাক্যের বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং নূতন শব্দপ্রয়োগ খুব সাবধানে এবং ক্রমে ক্রমে করা হয়েছে। এই রকম পুনরাবৃত্তিমূলক গল্প শিশুরা খুব পছন্দ করে।

ধরা যাক্, "রাজা ও টুনটুনি পাখী"র গল্পটি বলা হল। গল্প বলার সময় বেশ বড় চারটি ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো হলো। প্রথম ছবিতে দেখানো হ'ল,—রাজামশায় বসে আছেন,—পাশে মন্ত্রীমশায় এবং পিছনে সেপাইশান্ত্রী; প্রাঙ্গণে কয়েকটি টাকা শুকাতে দেওয়া হয়েছে, এবং একটি টুনটুনি পাখী

একটি টাকা মুখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ছবিটির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

"রাজার ঘরে যে ধন আছে।
টুনির ঘরে সে ধন আছে॥"

দ্বিতীয় ছবিটিতে আছে—একদিকে রাজার সাত রাণী গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, টুনটুনি পাখী উড়ে যাচ্ছে এবং ঘরের কোণ থেকে একটি ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে ও একটি দাসী ব্যাঙ্‌টিকে ধরতে ব্যস্ত। ছবিটির নীচে লেখা আছে—

"ওমা, কি হবে! রাজামশায় কি খাবেন?"

তৃতীয় ছবিটির বিষয়বস্তু—রাজামশায় খেতে বসেছেন, পাশে মন্ত্রীমশায়; সাত রাণীও কাছে বসে, তাদের পিছনে দাসী; দূরে গাছের ডালে—টুনটুনি পাখী বসে আছে। ছবিটির নীচে লেখা—

"কেমন মজা! কেমন মজা!
রাজা খায় ব্যাঙ্‌ ভাজা।"

চতুর্থ ছবিটি এই প্রকারের—সিংহাসনে রাজামশায় বসে আছেন, পাশে মন্ত্রী; দুটি সেপাইয়ের দুই তলোয়ার রাজার প্রায় নাকের উপর এসে পড়েছে; দূরে—গাছের ডালে—টুনটুনি পাখী। ছবির নীচে লেখা—

"নাক কাটা রাজারে।
কেমন মজার সাজারে॥"

এইবার, সরস ভাবভঙ্গীর সঙ্গে গল্পটি ছেলেমেয়েদের বলা হলো। শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও যাতে ছড়াগুলি বলে, তার উৎসাহ দিতে হবে। গল্পটি যদি তাদের ভাল লাগে, তারা আবার শুনতে চাইবে। এবার শিক্ষিকা সম্পূর্ণ গল্পটি শিশুদের সাহায্যে বলবেন। তৃতীয় দিনে গল্পটির মধ্যে কি কি চরিত্র আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং তারপর শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ পাখী, ইত্যাদি হতে চায় কিনা, প্রশ্ন করবেন। এইবারে আরম্ভ হবে অভিনয়। আমরা এই সময় আর একজন শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে

থাকি, যাতে শিশুরা নিজেরা যে ভাষা ব্যবহার করে তাই যেন অবিকল খাতায় লিখে নেওয়া হয়। পরে ভাষার কোন ত্রুটি থাকলে শুধু সেইটুকুই শিশুদের সামনে তুলে ধরা হয়, যাতে তারা নিজেরাই ত্রুটিটুকু সংশোধন করে নিতে পারে।

অভিনয়ের বর্ণনা এবার দেওয়া গেল।

প্রথম দৃশ্য

[রাজসভা : সিংহাসনে রাজা উপবিষ্ট ; পাশে মন্ত্রী, পারিষদবর্গ ; পশ্চাতে সেপাইশান্ত্রী দাঁড়িয়ে। বেশ জমকালো পরিবেশ।]

রাজা। বাঃ! বেশ রোদ্দুর উঠেছে।—মন্ত্রী !

মন্ত্রী। (নমস্কার করে) মহারাজ— !

রাজা। মন্ত্রী,—বেশ রোদ্দুর উঠেছে। টাকাগুলো রোদে দাও।

মন্ত্রী। সেপাই,—বেশ রোদ্দুর উঠেছে। টাকাগুলো রোদে দাও।

[সেপাই টাকাগুলো রোদে বের করে, বিছিয়ে দিল।]

[টুনি পাখী একটা টাকা মুখে করে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সভাগৃহ]

"টুনটুনি পাখী" গাইছে—

"রাজার ঘরে যে ধন আছে।
টুনির ঘরে সে ধন আছে॥"

রাজা। মন্ত্রী !

মন্ত্রী। মহারাজ— !

রাজা। কে ঐ গান করে ?

মন্ত্রী। সেপাই,—কে ঐ গান করে ?

সেপাই। মহারাজ,—একটা টুনি পাখী ঐ গান করে

রাজা। মন্ত্রী !

মন্ত্রী। মহারাজ— !

রাজা। টুনি পাখীকে ধরে আনো।

মন্ত্রী। সেপাই,—টুনি পাখীকে ধরে আনো।

[সেপাই-শান্ত্রীর দল টুনিপাখীকে ধরে আনলো।]

রাজা। মন্ত্রী,—রাণীমাদের এই টুনিপাখীকে রেঁধে দিতে বল। আজ ভাতের সঙ্গে খাওয়া যাবে।

মন্ত্রী। সেপাই,—রাণীমাদের এই টুনিপাখীকে রেঁধে দিতে বল। রাজামশায় ভাতের সঙ্গে খাবেন।

সেপাই। দাসী······।

(দাসীর আগমন)

সেপাই। দাসী,—রাণীমাদের এই টুনিপাখীকে রেঁধে দিতে বল। রাজামশায় ভাতের সঙ্গে খাবেন।

[টুনিপাখীকে নিয়ে দাসীর প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

[অন্দর-মহল : রাজার সাত রাণী বসে আছেন। পান সাজছেন।]

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। রাণী মা, রাজামশায় বল্‌লেন এই টুনিপাখীকে রেঁধে দিতে। রাজামশায় ভাতের সঙ্গে খাবেন।

সাতরাণী (একসঙ্গে)।—কি সুন্দর পাখী! দেখি, দেখি—কি সুন্দর পাখী! সকলে পাখীটি নিয়ে দেখাদেখি করছেন, হঠাৎ ফুড়ুৎ করে পাখী উড়ে গেল।)

সাত রাণী (একসঙ্গে)—ওমা, কি হবে! রাজামশায় কি বলবেন ?

দাসী। ওমা, কি হবে! রাজামশায় কি বলবেন ?

[একটা ব্যাঙ্‌ লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুক্‌লো। দাসী থপ্‌ করে ব্যাঙটা ধরে ফেল্‌ল।]

দাসী। রাণীমা, এই ব্যাঙটা কেটে রাজামশায়কে রেঁধে দিন।

সাত রাণী। তাই তো!—আচ্ছা এই ব্যাঙ্টা কেটে রাজামশায়কে রেঁধে দিই।

[রাণীরা রান্না শেষ করলেন। তারপর দাসীকে ডাকলেন।]

রাণী। দাসী,—রাজামশায়ের খাবার দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ডাকো।

দাসী। রাজামশায়, খাবার দেওয়া হয়েছে;—আসুন।

[রাজামশায় খেতে বসেছেন]

টুনি পাখী। (ফুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে, গাইল)—

"কেমন মজা! কেমন মজা!
রাজা খায় ব্যাঙ্ভাজা॥"

[রাজামশায় ভাতের থালা ঠেলে ফেলে, উঠে পড়লেন]

রাজা। যাও,—আর ভাত খাব না।

[রাজামশায়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[সভাগৃহ: রাজামশায় সিংহাসনে বসে আছেন। টুনি পাখীটাও এসেছে।]

টুনি পাখী। (গান করে)—

"কেমন মজা! কেমন মজা!"

রাজা। (ধমক দিয়ে) মন্ত্রী—!

মন্ত্রী। (আঁৎকে উঠে) মহারাজ—!

রাজা। কে ঐ গান করে?

মন্ত্রী। মহারাজ, সেই টুনি পাখীটা—

রাজা। ধরে আনো ঐ টুনি পাখীকে।

মন্ত্রী। সেপাই—ধরে আনো ঐ টুনি পাখীকে।

[সেপাইরা টুনি পাখীকে ধরে আনলো]

রাজা। মন্ত্রী,—দাসীকে ডাকো।

মন্ত্রী। সেপাই,—দাসীকে ডাকো।

সেপাই। দাসী—!

[দাসীর প্রবেশ ও রোদন]

রাজা। মন্ত্রী,—দাসীর নাক কেটে দাও।

মন্ত্রী। সেপাই,—দাসীর নাক কেটে দাও।

[সেপাইরা দাসীর নাক কেটে দিল। দাসী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল]

রাজা। মন্ত্রী,—এবার ঘটিতে করে জল আনো, পাখীটাকে গিলে খাবো।

মন্ত্রী।—সেপাই ঘটিতে করে জল আনো, রাজামশায় পাখীটাকে গিলে খাবেন।

[ঘটিতে করে জল আনা হলো রাজামশায়ের কাছে]

রাজা। মন্ত্রী—সেপাইদের বলো, যেন তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাখী উড়লেই যেন কেটে ফেলে।

মন্ত্রী। সেপাই—তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। পাখী উড়লেই, কেটে ফেলবে।

[সেপাইরা রাজামশায়কে ঘিরে তলোয়ার উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। রাজামশায় ঘটি থেকে মুখে জল ঢেলে, টুনি পাখীকে গিলে খেতে গেলেন। পাখী ফুড়ুৎ করে তখন উড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেপাইদের তলোয়ার রাজার নাকের ওপর পড়বে।]

রাজামশায়। (চেঁচিয়ে উঠবেন) এ্যাঁ—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ

(গলার স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে)

মন্ত্রী। এ্যাঁ—হাঁ-হাঁ-হাঁ " " " " " "

সেপাই। এ্যাঁ—আহা-হাহা-হা " " " "

[টুনটুনি পাখী এবার নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকে, গাইবে]

টুনটুনি পাখী। "নাক কাটা রাজারে!

কেমন মজার সাজারে॥"

পাখী ৩ বার গাইবে। অন্য সবাই মূক অঙ্গভঙ্গী করবে।

সমাপ্ত

এই নাটিকাটি সম্পূর্ণভাবেই শিশুদের নিজস্ব ভাষায় লিখিত এবং তদনুসারে অভিনীত। এইভাবে আমরা "সাত ভাই চম্পা", "গাজরের গল্প", "পান্তাবুড়ী" "লাউ গড়্গড়্" ইত্যাদি অনেক গল্পই শিশুদের অভিনয়োপযোগী করে রচনা করেছি আমাদের নার্সারি স্কুলে—তাদের মনোরঞ্জন ও শিক্ষার জন্য। এগুলির মধ্যে নেই পরিণত মনের ছাপ, নেই কোনও বাহুল্য। এতে কেবল আছে, শিশুর কোমল হৃদয়ের সজীব নবীনতা এবং আনন্দের বিশুদ্ধতা। এই রকম গল্পের সুবিধা এই যে, যেমন এটিকে অভিনয় করা যায় তেমন আবার একই বাক্য বার বার করে দেখতে দেখতে গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের অজ্ঞাতসারেই বাক্যগুলি আয়ত্ত করে ফেলে।

এই গল্পটিকেই কেন্দ্র করে শিশুদের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশুদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, রাজার জন্য মুকুট চাই, রাণীদের চাই গহনা, সেপাইদের চাই তলোয়ার, টুনিপাখীর চাই ডানা, ব্যাঙের চাই মুখোস, মন্ত্রীর চাই দাড়ী, ইত্যাদি আরও কত কি! প্রথমে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কাজে নামাই ভাল। কারণ অভিজ্ঞতাসূত্রে দেখা গেছে যে, একবার সৃজনাত্মক কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে কত যে তার অফুরন্ত আয়োজন ও উপকরণের প্রয়োজন তার ইয়ত্তা নেই, প্রস্তুতি না থাকলে তাল সামলান দায়! অবশেষে, শিক্ষিকা যেন সর্ব্বদাই এই কথাটি মনে রাখেন যে, গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি শিশুর কাছে প্রকাশ করতে গিয়ে তার আনন্দটুকু যেন নিঃশেষ না হয়ে যায়। শিশু যদি কেবলমাত্র মানস-চক্ষে নানা বর্ণ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আশ্চর্য্য মনোহর ছবি কল্পনা করে দেখতে পারে, তাহলেও গল্প বলার চরম উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে বলেই আমি মনে করি।

অভিনয়েরই প্রকারান্তর পুতুল নাচ। ছোট ছেলেমেয়েদের এতে অসীম আগ্রহ। নানারকম পুতুলের মাথা এক একটি কাঠিতে বসিয়ে তারপর লম্বা ঝুলওয়ালা পোষাক পরিচ্ছদ এমন ভাবে পরিয়ে দিতে হবে যে, পুতুলের গলার নীচ থেকে কাঠিটা যে হাত দিয়ে ধরা হয়েছে সেই হাত পর্য্যন্ত ঢাকা পড়বে। ছেলেমেয়েদের হাতে গড়া কৌতুকপ্রদ নানা রকমের মূর্ত্তি ও তাদের অদ্ভুত ভঙ্গী, পরিকল্পনার গুণে পুতুল নাচের দ্বারা শিশুমনোরঞ্জন সম্পূর্ণভাবে করা চলে। পুতুল-নাচ যিনি করান তাঁকে পুতুলগুলি ধরতে হয় এই ভাবে—অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যম

অঙ্গুলি দুটি পুতুলের বগলে থাকবে এবং তর্জ্জনী থাকবে পুতুলের মাথার পেছনে। তাহলে পুতুলটি এদিক-সেদিক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা আর হাতও অপরূপ ভঙ্গীতে নেচে উঠবে এবং শিশুদের কৌতুকোচ্ছ্বাসেরও পরিপূর্ণতর সুযোগ দেওয়া হবে। শিশুরা নিজেরাই পুতুলনাচের পোষাকপরিচ্ছদ তৈরী করতে পারে। কাগজে কেটে নানা ধরণের জন্তুজানোয়ারের প্রতিকৃতি দিয়েও পুতুল-নাচের বাহার বাড়ান যেতে পারে। এই সব কাজে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের ফলে শিশুরা বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জন্তুজানোয়ারের আকৃতিগত সাদৃশ্যমত কাগজ কাটতে, কাপড়ের পুঁটুলিতে নানাধরণের "রাক্ষস" প্রভৃতি কাল্পনিক "মুণ্ডু" আঁকতে এবং পরিচ্ছদাদি প্রস্তুতের মধ্যে মননশীলতা এবং হাতের কাজে সাবলীল দক্ষতা লাভ করে। "পুতুলনাচ" মানব সমাজের একটি সনাতন ও চিরন্তন আনন্দায়োজন। নার্সারি স্কুলে আমরা "পুতুলনাচ"-এর শিক্ষাপ্রদ সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধি করে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে থাকি যাতে এই উপায়ে আনন্দময় পরিবেশে শিশুশিক্ষায় সাফল্য অর্জ্জন করতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্রাঙ্কন ও সৃজনাত্মক কাজের দ্বারা শিশুশিক্ষার বিকাশ

চিত্রাঙ্কন ও সৃজনাত্মক কাজের দ্বারা শিশুশিক্ষার বিকাশ

হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি যে, দেওয়ালের গায়ে কত রঙের চিত্র, বিচিত্র ছবি এঁকে রেখেছে কোন্ অখ্যাতনামা শিল্পী। দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে ছবিগুলি বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম। মনে নানাভাবের উদয় হলো। রাতে ফুটপাতে শুয়ে থাকে কোন ঝাঁকামুটে, হয়ত বা কোন বাস্তুহারা ভিখারী। সারাদিন রূঢ়, বাস্তব জগতের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, তাই তারা ক্লিষ্ট মনকে শান্ত করতে এসেছিল এই ইঁট, কাঠে বাঁধা নদীর ধারে। রাতের আবছায়াতে মনে পড়ে গেছে তাদের সেই শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক দেশের কথা। যে দেশে একদিন তারা নদীর ধারে বসে আকাশে দেখেছে মেঘের খেলা, রঙের পেলবতা, কোমলতা ও অপরিমেয় গভীরতা। মনের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি ঘুমিয়ে আছে, তা হয়তো তারা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে নি। তাই নানা রকম তেলের রং সংগ্রহ করে অপটু হস্তে ফুল, লতা, পাতা, গরু, ছাগল, পাখী, গাছ, হাতপাখা, আলপনার নমুনা এঁকে রেখেছে—হাওড়া ব্রিজের দেওয়ালে।

আমরা সকলেই জানি যে, আদিম জগতে মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করতো ছবি এঁকে। আদিম মানুষের আঁকা ছবি সংগ্রহ করে আজ নানা গবেষণা চলছে এবং সেগুলির থেকেই যে তথ্য পাওয়া গেছে তারই ওপর নির্ভর করে' আজ মানবজাতির ইতিহাস লিখিত হয়ে চলেছে। ভাষাশিক্ষা শিশুর পক্ষে একটি অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যাঁরা বড় হয়ে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, কত কঠিন পরিশ্রমের পর তবেই বেশ সাবলীল গতিতে বিদেশী ভাষায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। অনেক সময় অনেক শিশু এসে বলে, "একটা মানুষ লেখ না!" যদি শ্লেটে "মানুষ" কথাটি লিখে দিই তাতে তারা খুশি হয় না, মানুষ এঁকে দিলে তবে খুশি হয়। অনেক সময় তাদেরও "পাখী" লিখতে বললে, তারা পাখী এঁকেই দেয়। এই

সকল অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, শিশু লেখার চেয়ে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে নিজেকে সহজে ব্যক্ত করতে পারে।

জীবনের প্রথম ৫ বছরে শিশু যে সকল ক্ষমতা অর্জ্জন করে তার মধ্যে ভাষার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করা, তার একটা খুব বড় কৃতিত্ব। ভাষাশিক্ষার প্রণালীটি কিন্তু বড় জটিল। প্রথমতঃ, একটি শব্দ যে কোন জিনিষ বা কোন কাজের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়, এই সত্যটি তাকে বুঝতে হবে। এই কথাটি বোঝবার ক্ষমতা শিশু তার নিজের স্বাভাবিক গতিতে অর্জ্জন করে। হেলেন কেলারের আত্মজীবনী পড়তে পড়তে মনে হলো যে, এই অন্ধ মহিলা যেমন স্পর্শের দ্বারা "জল" কি বস্তু, তার গুণাগুণ কি, তা' বুঝে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন—তেমনি অনভিজ্ঞ শিশু যখন "জল" এই শব্দটি এবং জলের বৈশিষ্ট্য, একসঙ্গে বুঝতে পারবে তখনই হবে তার ভাষাশিক্ষা। হেলেন কেলার লিখেছেন—"আমরা পথে চলতে চলতে একটা কুয়োর ধারে এসে পৌছালাম। সেখানে একজন জল তুলছিল। আমার শিক্ষিকা আমার হাতের ওপর জল ঢালতে লাগলেন। একদিক দিয়ে শীতল জলের ধারা আমার হাতের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো, অন্যদিকে তিনি আমার হাতে বানান করে লিখলেন, "জ—ল", ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম জল পদার্থটি কি। কোন্ জিনিষ স্পর্শ করলে বুঝবো জল, তার বৈশিষ্ট্যগুলি কি, তাও ক্রমে ক্রমে আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গেল।"

শিশুর জীবনেও শব্দানুভূতি ও অভিজ্ঞতাই হল ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। ক্রমে ধাপে ধাপে শিশু এগিয়ে চলে; কিন্তু সমস্ত প্রণালীটি এত জটিল বলেই মনে মনে অনেক কিছু বুঝলেও সে তা সহজে ব্যক্ত করতে পারে না। আবার অনেক সময়ে আমরাও নিজেদের মনের ভাব শিশুর ভাষায়, শিশুর বুঝবার মত করে, ব্যক্ত করতে পারি না। ছবির সাহায্যে এই সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। এই জন্যই গল্প, ছড়া, প্রকৃতিপাঠ বা অন্য কোন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছবি ব্যবহার করা, শিক্ষা প্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, শিশুকে যে ছবি দেখান হবে, তা যেন তাদের যোগ্য হয়। খুব উঁচুদরের শিল্পীর হাতে আঁকা ছবিও অনেক সময় জটিলতার কারণে শিশুরা বুঝে উঠতে পারে না।

বেশ ভাল করে নির্ব্বাচন করে, শিশুমনের উপযোগী ভাষায় একটি গল্প বলে মনে হলো "বেশ একটা গল্প বলা গেল।" শিশুরাও বেশ খুশি হয়েছে বলেই মনে হলো। তারপর ওদের দিয়ে গল্পটি পুনরাবৃত্তি করাতে গেলে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ শিশুরা এ ওর মুখের দিকে চাইছে ; অর্থাৎ কে আগে গল্প আরম্ভ করবে ? একটু সহানুভূতি দেখিয়ে গল্পটি ধরিয়ে দিলে দেখা যায়, বেশ কয়েকজন শিশু গল্পটি পুনরাবৃত্তি করতে পারবে। কিন্তু কয়েকজন একেবারেই মুখ খোলে না। সেই কয়টি শিশুকে লক্ষ্য করে দেখা যাবে, হয়ত একটি শিশু নূতন আগন্তুক, অন্যটি দলের মধ্যে ছোট, কিংবা অপর একটি হয়ত অন্যদের মত চটপটে নয়। যেমন আমাদের আরতি (৫ বছর) ; সে কোন মতেই ভাষায় মনের ভাব পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে পারত না। শিপ্রা (৫ বছর) ; সেও প্রায় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত "হ্যাঁ" কিংবা "না" ছাড়া আর কিছুই বলেনি। এরকম শিশুদের বোকা বলে ছেড়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আরতি বা শিপ্রা প্রত্যেক গল্পটিকে অবলীলাক্রমে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করে বলা চলে যে, গল্প বা ছড়া তারা বোঝেনি, অথবা তারা বোকা ? "আয়রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে," এই ছড়াটি শুনে দুজনেই টিয়া পাখী এঁকেছে, টিয়া পাখীর সবুজ পালখ, লাল ঠোঁট কিছুই বাদ যায়নি ; নৌকা জলে ভাসছে, তাও পরিষ্কার করে এঁকেছে ; বাগানে ফুল ফুটেছে নানা রঙের, এবং মাথার উপরে আকাশ, প্রত্যেকটি যেখানে যেমন হওয়া উচিত শিশু দুজনেই চমৎকারভাবে তার অভিব্যক্তি করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমরা কত সময়ে শিশুদের ভুল বুঝে থাকি।

তারপরে দেখা যাক্, গল্পটি কার মনে কেমন রেখাপাত করেছে। 'পান্তাবুড়ী' গেছে রাজার কাছে নালিশ করতে। গল্প বলার সময় রাজসভার জমকালো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অভিজিৎ অবস্থাপন্ন গৃহের সন্তান, সে ঐ গল্পটি শুনে আঁকলো সভার চিত্র—রাজা বসে আছেন কৌচে, মাথার উপর ঘুরছে ইলেক্‌ট্রিক পাখা। শিবানী খোলার ঘরে থাকে তার মা, দিদিমার সঙ্গে, সে আঁকলো—রাজামশায় বসে আছেন মাদুরে, তাঁর হাতে তালপাতার পাখা।

আর একটি ছেলে—৩ বছর বয়সের সমীর, প্রথম প্রথম স্কুলে আসার সময় খুব কান্নাকাটি করত। ছবি আঁকবার সময় সে সমস্ত কাগজটি জুড়ে

একটা বড় ফটক (gate) আঁকতো, বোধ হয় স্কুলের প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে প্রত্যেক দিন এসে আট্‌কা পড়ে বলেই বোধ হয় সে ফটকের বড় ছবি এঁকে তার মনের ভাব প্রকাশ করতো। এ ছাড়া, আমাদের স্কুলের ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশই গাছ-পালা, গরু-বাছুর, দোল্‌না, ইত্যাদি আঁকে। তার কারণ, তাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতি যে শ্যামসমারোহে সৌন্দর্য্যভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন—সহরের মধ্যে এমনটি আর কোথায় পাবে? আরও একটি ঘটনা বলি, একটি ৫ বৎসরের ছেলে, নূতন এসেছে। সে কেবলই রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বাস, মোটর আঁকে। শিশুটি অশান্ত, দুরন্ত, ভীতু। তার মধ্যে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর ব্যবহারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তার পিতামাতা শিক্ষিত, এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল। ছেলের মনের অশান্তি লক্ষ্য করে তার পিতামাতার সঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্কুলেই আলাপ আলোচনার ফলে জানা গেল যে, নানা কারণে তার মায়ের মনে শান্তি নেই এবং সেজন্য মা প্রায়ই বাড়ীতে থাকেন না, শিশুর জন্মাবধি তাকে নিয়ে ট্রামে, বাসে করে ঘুরে বেড়ান এদিক-ওদিক। এর ফলে বিচিত্র পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মন হয়েছে বিক্ষিপ্ত, ব্যবহার হয়েছে অশান্ত ও নির্দ্দয়। প্রায় ৩ মাস শিশুটিকে আমরা মাঠে, গাছের নীচে বা দীঘির ধারে কেবল খেলা করতে দিয়েছি। কখনও সে কাগজ, রং ও তুলি নিয়ে প্রাণভরে সবুজ ও নীলের সমাবেশ রচনা করেছে, কখনও মাটি দিয়ে পুতুল গড়েছে, এইভাবে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তার আন্তরিক যোগসাধন হয়ে ক্রমে ক্রমে তার দেহ ও মনে শান্তি এসেছে। পরিবেশ শিশুর জীবনে যে কি প্রভাব বিস্তার করে, ঐ শিশুদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করলেই বোঝা যায়।

চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে কেবল যে শিশুরই ভাষার রুদ্ধ দ্বার খুলে যায় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিকাও তার আঁকা ছবি দেখে শিশুমনের গভীরতম স্থানে গিয়ে পৌছাতে পারেন। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলি। অনেক দিন আগেকার কথা—একটি ৫ বছর বয়সের মেয়েকে তার বাবা কলিকাতার একটি বোর্ডিং-স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। মেয়েটির মা ছিলেন না, বাবাকে মফঃস্বলে থাকতে হতো। প্রতি শনিবারে বোর্ডিং-এর ছোট মেয়েরা বড় মেয়েদের পাশে বসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ীতে চিঠি লিখতো। সেই ৫ বছরের মেয়েটি তার বাবাকে

চিঠি লিখতো—"শ্রীচরণেষু পিতামহাশয়, আপনি আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।" এইটুকু—পাশে যে বড় দিদি ছিলেন তাঁরই চেষ্টায়। তারপরেই—"বাবা, আমরা বিকেলে ভাত খাই, রাতে কেবল দুধ।" অর্থাৎ রোজ রাতে ক্ষিধের জ্বালায় পেট চুপ্‌সে থাকে, বাবা যদি খাবার পাঠান
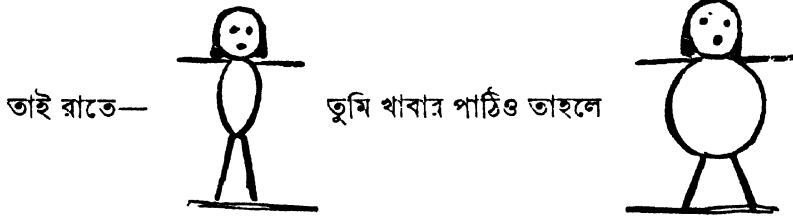
তাহ'লে পেটটি বেশ ভরে উঠবে। জানি না, পিতামহাশয়ের মনের কি অবস্থা হয়েছিল। তিনি মেয়েকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে যেতে পারেন নি ; হয়ত ভালই করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক শনিবারে চারটের সময় কখনও তিনি নিজে এক ঝাঁকা ফল, মিষ্টান্ন নিয়ে উপস্থিত হতেন, কখনও বা 'হরিদাদা'র হাতে এমন একটি ডালা পাঠাতেন যে, বোর্ডিংএ প্রায় কেউই ক্ষুধার্ত্ত থাকতো না। দশটি বৎসর এক শনিবারেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজও সেই চিঠির কথা মনে হলে সেই ছবিটি চোখের সামনে ভাসে এবং তখনকার সমসাময়িক মেয়েদের মুখে পিতামহাশয়ের ঔদার্য্যের কথা শুনে এবং তাঁর শিশুমন বোঝবার ক্ষমতার কথা ভেবে মন ভরে ওঠে।

এতক্ষণ ধরে বলা গেল যে, চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে শিক্ষিকা কি ভাবে শিশুকে বুঝতে পারেন, কিংবা শিশু শিক্ষিকার মনের ভাব বুঝতে সক্ষম হয়। এবার দেখা যাক, অবাধভাবে ছবি আঁকতে পেলে শিশুর আনুভূতিক ও মানসিক জীবন কি ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রায় ২ মাস বয়স থেকে, শিশু উজ্জ্বল রং দেখে খুশি হয়, আলো ও অন্ধকারের প্রভেদও বুঝ্‌তে পারে। ২ বৎসর বয়স থেকে, লাল ও হলুদ রং-এর পার্থক্য বুঝতে পারে। খুব ছোট বয়সেই শিশুর মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি জেগে ওঠে। সে মায়ের হাসিমুখটি চেনে, লাল ফুলটি হাতে পেলে খুশি হয়, মায়ের কোমল উষ্ণ কোলটি পছন্দ করে, সুমিষ্ট দুগ্ধ পান করে তৃপ্ত হয়।

এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতি, এ প্রায় শিশুর সহজাত ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটি উন্মেষিত ও বিকশিত করাই শিশুশিক্ষিকার কাজ। কবি বলেছেন, "প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্ত্তি। প্রকৃতি হতে রং এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুল্‌ছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুল্‌ছে (৪১)। এই যে বাণী তিনি দিয়ে গেছেন, এ চিরন্তন সত্য। এই চিরন্তন সত্যে শিশুকে সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রথম পাঠ দিতে হবে।

উন্মুক্ত মাঠে, ফুলে ফলে ভরা বাগানে, শিশু নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ মনে খেলে বেড়াবে—এই উপদেশই দিয়েছেন সকল শিশুশিক্ষাবিদ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান। প্রকৃতিদেবীর নিত্যনূতন মোহিনীরূপ তাদের কাছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন সংবাদ বহন করে আনে। কখনও তারা দেখে বর্ষার নদী যেন কেশর ফোলানো তাজা বন্য ঘোড়ার মত আপনার গতিগর্ব্বে ঢেউ তুলে, ফুলে ফুলে চলেছে, কখনও তারা দেখে ক্ষীণা, শীর্ণা শীতের নদী যেন তপস্বিনী গৌরীর ন্যায় ধ্যানমুগ্ধা; কোথাও বা তারা দেখে বালির চর ধূ ধূ করছে, অনতিদূরে চষা মাঠ, নদীর তীরে কতকগুলি গরু মহিষ চরে বেড়াচ্ছে; কোথাও বা আছে কর্ম্মকোলাহলময় গৃহসংসার। জন্মাবধি আকাশের রং ফেরানো দেখে তাদের মন থাকে ভরে, তাদের কেবল চিনিয়ে দিতে হয় তাদের নিজেরই জানা জিনিষ। কিন্তু সহরের শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানিয়ে ও চিনিয়ে, দুই-ই দিতে হয়। এই জানিয়ে দেওয়ার সময় শিক্ষিকা যেন ভুল করে না বসেন। শিশুকে প্রকৃতি-পাঠ দেওয়ার সময় প্রথমেই ফুলটিকে ছিন্ন ভিন্ন না করে তার রং, গঠন, গন্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ফুল যে সুন্দরের দূত, সেই কথাই পাবে শিশুর জীবনে প্রথম স্থান। শিশু যখন রং তুলি নিয়ে গাছের নীচে আঁকতে বসবে তাকে তার পারিপার্শ্বিক প্রত্যেক জিনিষটি এক এক করে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার মনের দ্বারে যে রং, যে বিষয়বস্তু এসে আঘাত করে, তাই সে প্রথমে রং-এর ভাষায় ব্যক্ত করবে, এই হলো চিত্রাঙ্কনের প্রথম ধাপ। হয়তো, সমস্ত কাগজটাই লাল রঙে বুলিয়ে দেবে, লাল ফুল তার চোখে ভাল লেগেছে বলে;

(৪১) রবীন্দ্রনাথ—সঙ্কলন—শ্রাবণসন্ধ্যা, ২৬৮-২৬৯ পৃষ্ঠা

কিংবা কেবল সবুজে সবুজ করে ফেলবে কাগজটা, কেননা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, সবুজ গাছপালার ছবি তার মনে সব চেয়ে প্রথমে গিয়ে পৌঁছেছে।

শিশু যখন বছর দুয়েকের, তখন সে খড়ি হাতে পেলে কেবল হিজিবিজি আঁকে। তার পরে, কাগজে বেশ ঘন করে এদিক ওদিকে রং এর পোঁছ্ লাগায়। এ সময় রং, তুলি, কাগজ, খড়ি, ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে তার মনে একটা জয়ের গৌরব আসে। ক্রমশঃ সে আত্মবিশ্বাস লাভ করে। কিন্তু ৪।৫ বছর বয়স থেকে শিশু ছবি আঁকে অন্য রকমে। এ বয়সে শিশু রং ও তুলির সাহায্যে নিজের মনের অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে। যে সব জিনিষ তার কৌতূহল জন্মায়, যে সব জিনিষ বা কাজ সে বলতে চায় বা করতে চায়, অথচ তার শারীরিক ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠছে না বলেই শিশু আত্মপ্রকাশ করে ছবি এঁকে। প্রথমে শিশু কোন একটা কিছু এঁকে বলে "বেলুন" বা কমলালেবু", কখনও বা "গেলাস"। একটা সরল রেখা টেনে হয়ত বলবে, "রেলগাড়ী", আর তার নীচেই আর একটি সরল রেখা টেনে বলবে, "রেলের লাইন।" আসল জিনিষের সঙ্গে তার মিল রইল কি না রইল, এ নিয়ে শিশু মাথা ঘামায় না। এ সময়ে সে কেবল সৃষ্টির আনন্দে মশ্গুল হয়ে থাকে এবং নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাকে জয় করে সে হয় স্রষ্টা। শিশুর জীবনে এই সময়টি হলো সন্ধিক্ষণ;—আপনার পছন্দমত ছবি এঁকে চলবে সে, তাকে সমালোচনা করে বা খুব বেশী প্রশংসা করে ব্যতিব্যস্ত না করলে সে ক্রমশঃ তার কল্পনার স্বর্গরাজ্য ও মাটির পৃথিবীর মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে পারে।

আজ শিশুশিক্ষার জগতে—বিশেষ করে বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরে—শিক্ষাবিদগণ চিত্রাঙ্কনের মর্ম্ম উপলব্ধি করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থাতে শিশুর মন ভয়ে, দুঃখে, অশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। তার কথায়, তার কাজে, তার ব্যবহারে ফুটে উঠতো তার মানসিক অসহায় অবস্থা। কত শিশু কাগজে ঘন করে কালো রং বুলিয়ে বলেছে—"ভয়"। কলিকাতায় গত দাঙ্গার পর বাব্লু, ৫ বছর বয়স তার, একটি করে বাড়ী আঁকে আর তাতে ধরিয়ে দেয় লাল রঙের "আগুন"। এইভাবে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত দুঃখ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে শিশু তার মন থেকে দূরীভূত করে। কিন্তু শিশুর কাছে, চিত্রাঙ্কন তার খেলারই একটি অঙ্গ। শিশুর খেলায় ও কাজে কোন পার্থক্য নেই, সেকথা পূর্ব্বেই

আলোচিত হয়েছে। শিশু রং তুলি ও কাগজ নিয়ে খেলবে, শিক্ষিকা সেই ছবির ভিতর থেকে শিশুমনটিকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করবেন। অবাধ স্ফূর্ত্তিতে, আপনার নির্ব্বাচিত বিষয়বস্তুটিকে শিশু নিজের পছন্দমত রংএর সাহায্যে ব্যক্ত করতে সুযোগ পেলেই হবে সেটি খেলা, নতুবা নয়। "There is a close affiliation of 'art' to 'play'", says Professor Nunn, "since the soul of 'art', like that of 'play' is the joyous exercise of spontaneity. (৪২)—"চারুশিল্পকলা আর ছেলেখেলার মধ্যে একটি গভীর এবং ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, কেননা এই দুটিরই গূঢ় মর্ম্মসত্য হলো স্বতঃস্ফূর্ত্তির অনাবিল আনন্দ", অধ্যাপক ন্যন্ এই মত প্রকাশ করেছেন।

১৮৯৭ সালে, ভিয়েনা (Vienna) সহরে, অধ্যাপক ফ্রান্জ সিজেক্ (Professor Franz Cizek) শিশু ও বালকবালিকাগণের অঙ্কিত চিত্র সংগ্রহ করে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। (৪৩) এই দিন থেকেই শিশুরা নিজেদের জন্য চিত্রাঙ্কনের একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। এর আগে, শিশুদের 'মডেল' বা নমুনা থেকে অনুকরণ করতে হতো, তারা পেন্সিল দিয়ে আগে ছবি এঁকে তারপর তাতে রং বুলাতো, কিংবা শিক্ষিকা বা পিতামাতা যে ছবি এঁকে দিতেন তার উপরই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিত্রাঙ্কন অভ্যাস করতো। শিশুর কল্পনাশক্তি চায় উদ্দামভাবে, অবাধ গতিতে ছুটে চলতে, কিন্তু বয়স্ক লোকের ধ্যানধারণার নাগপাশে সেই শক্তিকে বেঁধে এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল। অধ্যাপক সিজেক্ সেই নাগপাশ ছিন্ন করে, শিশুকে দিলেন অবাধ মুক্তি। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, শিশু রং-এ তুলি ডুবিয়েই প্রথমেই কাটতে চায় কাগজে খুশিমত দাগ; এবং আঁকার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন ছুটে চলে এগিয়ে ও প্রত্যেক অভিব্যক্তিরই সে একটা নাম দিতে চায়। এই রকম পরিবেশে শিশুর শরীরে ও মনে আসে স্বাচ্ছন্দ্য, বুদ্ধি হয় স্বচ্ছ ও সহজ, এবং তার মনের মধ্যে যে সমস্যাগুলি লুকিয়ে থাকে, সেগুলি হয়ে যায়

(৪২) Nunn—Education; Chapter VII. p. 90.

(৪৩) (ক) Adolph. E. Meyer; The Development of Education in the Twentieth Century; Franz Cizek. pp. 24-26.

(খ) H. W. Oldham; Child Expression in Colour and Form. p. 99.

প্রকাশিত। তখন, মনের মধ্যে কোন বাধা আর জমে থাকে না, ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ হয় সহজ এবং স্বাভাবিক।

অধ্যাপক কফ্‌কা (Koffka) বলেছেন, "In the adults' world the child is not free but meet with compulsion and opposition which are lacking in his own world."—(৪৪) অর্থাৎ, "বয়স্ক মানব যে জগতে বাস করে সেখানে শিশু অবাধ মুক্তিতে বিচরণ করতে পারে না; সর্ব্বক্ষণই সে বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিপীড়িত হয়, কিন্তু শিশুর মনোরাজ্যে এই বাধ্যবাধকতার কোনই স্থান নেই।" পূর্ণবয়স্কের যে জগৎ এবং শিশুর যে জগৎ, তার মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি এমন সুচারুরূপে সংঘটিত হয় যে, শিশুর মনে বিশেষ কোন সমস্যা পুঞ্জীভূত হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ণবয়স্কের ইচ্ছায় ও হস্তক্ষেপে শিশুর নিজের মনটি গড়েই উঠতে সুযোগ পায় না। ধরা যাক্, 'সমু'র কথা। ৬ বৎসর বয়সের ছেলে সে, তার চাল-চলন, বাচনভঙ্গী সবই বয়স্কের মত। সে যখন ছবি আঁকে, প্রত্যেক বিষয়বস্তুটি দূরে দূরে এঁকে নিয়ে সভয়ে রঙীন খড়ি দিয়ে কয়েকটি রেখা টেনে ভীরু মনের পরিচয় দেয়। ছবিটির মধ্যে হয়ত ভুলত্রুটি বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু শিশুমনের অবাধ স্ফূর্ত্তিও তাতে নেই। আর একটি ক্ষেত্রে দেখা গেল সুভাষকে (৫ বৎসর), আঁকায় যে তার খুব হাত আছে তা নয়, কিন্তু ঝড় এঁকেছে নীল, লাল কয়েকটি রং দিয়ে সহজ সতেজভাবে, বড় বড় টান দিয়ে কাগজটি ভরে। হাসতে হাসতে বললে, "দিদিমণি কাল রাতে ঝড় হয়েছিল—তাই না?" এই দুটি শিশুরই বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—একটি বাড়ীতে শিশুকে সমাজের নিয়মকানুন অনুসারে ঠিক বয়সে ঠিক পরীক্ষাটি দিয়ে ঘরসংসার বেঁধে বসতে হবে, এরই একটি সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া গেছে। অন্য বাড়ীতে, আর পাঁচটি ভাই- বোনের সঙ্গে হেসে হেসে খেলে বড় তো হোক্—এমনই একটা ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুদের অঙ্কিত চিত্র সংগ্রহ করে পাশ্চাত্যদেশে বেশ বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই। ডাক্তার গুডএনাফ (Dr. Goodenough) এ সম্বন্ধে গবেষণা করে যে ফললাভ করেছেন, মনে

(৪৪) Koffka—The Growth of the Mind.

হয় তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই পরিচিত। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক দেশেই শিশুদের প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন একই ধরণের। শিশুদের আঁকা ছবিগুলি দেখলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে কি সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে তারা রং, তুলি বা খড়ি হাতে ধরেছে। কিছুই তার কাছে কঠিন বলে মনে হয় না; কোনও দ্বিধা না করে সে দাগের পর দাগ কেটে চলে। মানুষ, জন্তু জানোয়ার, বাড়ী বা গাড়ীর ছবি সে সাহস এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এঁকে চলে। এই যে ক্ষমতার পরিচয় শিশু জীবনের প্রারম্ভেই দিয়ে থাকে, তার কারণ কি? তার কারণ শিশুর সামনে কি আছে তা দেখে সে আঁকে না, তার মানসপটে বিষয়বস্তুটির যে-ছবিটি ধরা আছে সেটিরই রূপ দেয় সে কাগজে। একেই ইংরাজীতে বলে—"schema" (৪৫)। হিজিবিজি আঁকার দিন বিগত হলেও শিশু বাস্তবধর্ম্মী ছবি আঁকতে সুরু করে বেশ দেরীতেই। ৪।৫ বৎসর বয়সে শিশু যখন মানুষ আঁকে, তখন বেশ বড় একটি গোল এঁকে মানুষের মাথাটি বোঝায়, দুটি বিন্দু দিয়ে চোখ বোঝায়, মুখটিও বেশ বড় করেই আঁকে—হাত পা বা দেহ নেই বললেই চলে—কয়েকটি সরল রেখা দিয়ে সে এগুলি বুঝিয়ে দেয়। এই যে প্রকাশভঙ্গীর ধারা, একেই বলে "schema"। বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার বিকাশধারা এইরূপই হয়ে থাকে। শিশুর মনে মানুষের মাথাটাই বড় করে ধরা দেয়, কারণ সে নিজে চোখ দিয়ে দেখে, মুখ দিয়ে খায়, কাণ দিয়ে শোনে; যেন, মাথাটাই সব কাজ করে, তাই মাথার গুরুত্ব তার কাছে সবচেয়ে বেশী। প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রত্যেক শিশুর আঁকার একটা ধরণ আছে—সেই ধরণটিকে কেন্দ্র করেই তার ছবি আঁকা এগিয়ে চলে। যথা, শিশু যখন তার পরিবেশটি ছবির রেখার মধ্যে ধরে রাখতে চায়, সে সচরাচর কাগজের উপরে আঁকে আকাশ, নীচে আঁকে সবুজ ঘাস আর মাঝখানের ফাঁকটিতে চাঁদ, সূর্য্য, এরোপ্লেন, গাছ, পুকুর, মাছ ইত্যাদি যা মনে আসে, এঁকে চলে। অনেক সময় শিশু এই গণ্ডীটুকু পার হয়ে এগিয়ে যেতে পারে না, এইখানেই আসবে শিক্ষিকার নির্দ্দেশ। তিনি শিশুকে সাহায্য করবেন যাতে সে এই ধারার কিছু অদলবদল করে ধীরে ধীরে বাস্তবধর্ম্মী হতে পারে।

(৪৫) K. Bühler ; Mental Development of the Child—p. 120.

আবার, অনেক শিশুর মনে স্থান বা কাল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকে না। অনেকে একই সঙ্গে আকাশে চাঁদ, সূর্য্য, তারা আঁকে, কেউ কেউ বাড়ীর চারিপাশে আসবাব-পত্র এঁকে খুশি হয়। এছাড়া, বেশ পর্য্যবেক্ষণ করে ছবির বিষয়বস্তুগুলিকে তাদের পরিমাপ অনুযায়ী সাজাতেও তারা পারে না। দুরের লাল ফুলটি যদি চোখে ভাল লাগে তাহলে সেটিকেই বড় করে আঁকে, কাছের অন্য জিনিষগুলি সে কোনই প্রাধান্য দেয় না। পোষাক পরিচ্ছদের ভিতর দিয়ে মানুষের দেহটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এমন ছবি ৪।৫ বছরের শিশুরা প্রায়ই এঁকে থাকে। পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) জ্ঞানও এই বয়সের শিশুদের মধ্যে উন্মেষিত হয় না। তারা হয়ত আঁকতে চায় জনতার ছবি—এক সারিতে অনেকগুলি মানুষ এঁকে দিয়েই যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করে, জনতা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাবে এ ধারণা তারা করতেই পারে না।

এর পরের ধাপে শিশু ক্রমশঃ এক জিনিষ হতে অন্য জিনিষের মধ্যে যে দূরত্ব আছে সেটা বুঝতে পারে, কিন্তু সেই দূরত্বের ভাব সে তখনও ছবিতে ঠিকমত এঁকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন, ছেলেরা মাঠে বল খেলছে, এইটি আঁকবার সময়ে শিশু একটি ছেলের মাথার উপরে আর একটি ছেলে আঁকে এবং একজনের পায়ের ও অন্যজনের মাথার মাঝখানে বলটি এঁকে দেয়। কিংবা, একটি বাড়ী এঁকে ঠিক তার নীচেই বাগান এঁকে দেয় এবং শেষে, একটা সোজা রাস্তা এঁকে বাড়ী ও বাগানটিকে জুড়ে দেয়। এইভাবে আঁকতে আঁকতে একদিন দেখা যায় শিশু দূরের জিনিষ ছোট করে আঁকছে এবং কাছের জিনিষ সেই অনুপাতে কিছু বড় করে আঁকছে। তখনই বুঝতে হবে, শিশুর ছবি-আঁকা খেলার দিন ফুরিয়ে এসেছে—এবার সে ছবির সাহায্যে বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। চিত্রাঙ্কনের এই স্তরেই আমরা দেখতে পাই যে শিশু একই ছাঁদে (pattern) বারবার এঁকে চলেছে, যেন একটা ছাঁচে ঢেলে সে তার আঁকবার ধরণটিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। তার এই rhythmic pattern-এর (ছাঁদে-ধরা ছন্দের সহজ গতির) আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সুযোগে তাকে এই সময় অক্ষর পরিচয়ের প্রথম পাঠ দেওয়া যেতে পারে। ভারতী ও আরতি আসে অতি দরিদ্র পরিবার থেকে। তাদের বাড়ীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা একেবারেই নেই বললেই চলে। এদের দুজনকেই

লিখতে পড়তে শেখান হয়েছে এই পদ্ধতিতে। "ত", "ব", "ভ"—এইসব অক্ষরগুলি সামান্য অদলবদল করে অনেক অক্ষর লেখা যায় "ত", "ব", "ভ" এগুলি ছন্দময় গতিতে এঁকে চললো আরতি ২।৪ দিন ধরে, তারপর "ত" হলো "অ", "অ" থেকে "আ"; "ব" থেকে "র", এমনি করে একদিন লেখা হলো—"আরতি"। নিজের নামটি অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখে এবং ঠিক তেমনিই যে সে নিজে লিখতে ও পড়তে পারে, যেই আরতি বুঝতে পারল, তার মুখটি প্রসন্ন হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো। এর পর থেকে আরতি অক্ষর লিখতে ও পড়তে তেমন কষ্টবোধ করেনি, তার ক্ষমতা ও আগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করে আমরা দিনের পর দিন সহজেই এগিয়ে যেতে পেরেছি। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, অক্ষরের pattern আঁকা হস্তলিপির প্রস্তুতি মাত্র—অক্ষরশিক্ষা নয়। অনেকে "ব" থেকে "র", "র" থেকে "ক" পদ্ধতির উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সাধারণ শিশু যত সহজে "ব" ও "শ" এর পার্থক্য লক্ষ্য করে তত সহজে "ব" ও "র" এর পার্থক্য লক্ষ্য করে না। শিশুর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা লক্ষ্য করে ব্যক্তিগতভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়াই উচিত।

প্রত্যেক শিশুর "বুদ্ধির পরিমাণ" কত তা জানবার জন্য বিংশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। শিশুরা যে সকল ছবি এঁকেছে সেগুলি সংগ্রহ করে তার থেকে একটা "মান" স্থির করে অধ্যাপক সিরিল বার্ট (Professor Cyril Burt) শিশুদের বুদ্ধির পরিমাপের একটি পদ্ধতি প্রচলিত করেছেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষিকা ৩ বৎসর হতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণের "বুদ্ধির মাপ" স্থির করতে পারেন। (৪৬) কিন্তু এই "মাপ" ব্যবহার কালে শিক্ষিকাকে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। শিশুর আঁকা শুধু একটি ছবি নিয়ে এরকম পরীক্ষা চলে না। একই শিশুর আঁকা অনেকগুলি ছবি বেশ কিছুদিন ধরে সংগ্রহ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, শিশুটি একেবারে নিজের ক্ষমতায় ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সেই ছবিগুলি এঁকেছে। তারপর অধ্যাপক বার্টের "মানদণ্ড" অনুযায়ী ঐ ছবিগুলির বিচার করে স্থির করতে হবে শিশুটির "বুদ্ধির মাপ" কত।

আমাদের বাড়ীর একটি ১০ মাসের মেয়ের হাতে আমি একদিন একটি সাদা

(৪৬) Burt's Mental and Scholastic Tests—pp. 317-329.

খড়ি দিই। প্রথমে সে সেটা নেড়েচেড়ে দেখেই মুখে পুরলো; তারপরে, সেটিকে মেঝেতে বেশ করে ঘস্‌লো; তারপর, সেটা দুহাত দিয়েই মেঝেতে ঘসে বেশ পরখ করে দেখতে লাগলো। মেঝেতে সাদা খড়ির দাগ পড়াতে খুব খুশি হয়ে উঠলো। এরপর প্রায় রোজই তার হাতে খড়ি দেওয়া হতো এবং সে মাটিতে খড়ি ঘসে দাগ কেটে নিজে খুব খুশি হয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতো। তারপর শিশুটির ১ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্মদিনে, তাকে এক বাক্‌স রঙীন খড়ি দেওয়া হলো। রঙীন খড়ি দিয়ে মেঝেতে হিজিবিজি এঁকে সে বেশ খুশি হতো। একটা কালো রঙের কাঠের শ্লেটও দেওয়া হয়েছিল। শ্লেটে রং ঘস্‌তে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু শ্লেটটি হিজিবিজি দাগে ভরে গেলে সেটিকে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে সে থাকতে পারত না। প্রকাণ্ড হল ঘরটি ঘুরে ঘুরে টেবিল, চেয়ারের নীচে দাগ কেটে বেড়ান, তার একটি বিশেষ খেলা হয়ে দাঁড়াল। ২ বৎসর বয়সের জন্মদিনে তাকে (crayon) ও একটি বড় খাতা দেওয়া হলো। ক্রেয়নটি নিয়ে এবারেও সে মুখে পুরবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু খাতা ও ক্রেয়ন বার বার করে তার সামনে একসঙ্গে উপস্থিত করায় সে ক্রেয়ন দিয়ে বেশ সতর্কভাবে কাগজে একটা দাগ কাটলো। কাগজে দাগ পড়তেই শিশুটি খুশি হয়ে উঠলো এবং অনেকক্ষণ ধরে কাগজে দাগ কাটার খেলা চল্‌ল। তবে দেখা গেল, একটা পাতায় খানিকটা হিজিবিজি কেটেই আবার আর একটা পরিষ্কার পাতায় সে দাগ কাটতে চায়। এইভাবে পাতা-ওল্‌টানোতেও বেশ একটা খেলার সৃষ্টি হল। এবারে কিন্তু শিশুটি ক্রমশঃ গোলাকার দাগ কাটতে লাগলো। এর পরের ধাপেই দেখা গেল, ক্রেয়নের বাক্‌সে যত রঙের ক্রেয়ন্‌ ছিল, সবগুলি নিয়ে তার পরীক্ষা হল সুরু। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ঘসে ঘসে সে দেখে, এবং লাল ও হলুদ রংটিই সে বেশী চিনতে পারত। তার মাথার চিরুণীটি লাল, জলখাবারের থালা গেলাসগুলি হলুদ রঙের—ঘন ঘন ব্যবহারের ফলে, সে বেশ রং চিনতে শিখল। সবুজ ও নীলের পার্থক্য সে বুঝতে পারত না। এই সময়, তাকে কিছু গোলা রং দেওয়া হল, আর একটা তুলি। তুলিটির ডগা ছিল বেশ মোটা। শিশুটি রঙে তুলি ডুবিয়ে কাগজে ছাপ মেরে নানারকম নক্‌সা কাটতে সুরু করল। এই খেলায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট একাদিক্রমে সে

বেশ ডুবে থাকত। ক্রমে দেখা গেল যে, সে রং ও তুলি দিয়ে কাগজে বেশ সোজা দাগ কাটছে, অন্য কোন নক্‌সা তার মধ্যে নেই। তার পরের কাগজে কেবলই রঙের ফোঁটা দিত কিন্তু শ্রান্ত হলে তুলিটা কাগজে কেবল ঘসেও উঠে পড়তো। এই সময়ে রং নিয়ে খেলা করতে করতে যখন বুঝতে পারলো যে ছুটি রং মিশে আর একটি নূতন রং তৈরী হয় তখন শিশুটি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল। তারপরে খেলা তার হলো, খালি একটি রঙের উপর আর একটি রং ঘসে মিশিয়ে দেওয়া।

তিন বৎসর বয়সে শিশুটি বেশ সহজেই লাল আর হলুদ রং মিশিয়ে যে কমলা লেবুর রং হয় এবং হলুদ আর নীল মিশিয়ে যে সবুজ রং হয়, এই তথ্যটি নিজেই পরীক্ষা করে বার করে নিয়েছে, দেখা গেল। তখন তার কি উৎসাহ—কেবলই মাকে, ঠাকুরমাকে তার ঐ নবলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় দিতে চায়, মা ঠাকুরমা যে কিচ্ছু জানেনা! তারপর, শিশুটি মায়ের সঙ্গে খেলতে খেলতে আবিষ্কার করলো যে, রং-এ যদি খুব জল থাকে তবে রং গড়িয়ে এদিকে ওদিকে চলে যায়; এবং শুক্‌নো রং ঘসে ঘসেও মনোমত ছবি আঁকা যায় না। এর আগে তার মা নিজে রং গুলে শিশুর ব্যবহারোপযোগী করে দিতেন। এবার শিশু মায়ের সঙ্গে বসে রং গুলে নিজেই পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর একটা বড় সাদা কাগজে খুব জল মেশানো লাল রং-এর দুই চারিটি ফোঁটা ফেলে কাগজটি এদিক ওদিক হেলান হলো এবং রং গড়িয়ে সাদা কাগজটিই ভরে গেল। লাল রং-এর ওপর দু ফোঁটা হলুদ রং ফেলা হলো এবং সেটাও খুব মজা করে লাল রং এর উপর ছড়িয়ে গেল। শিশু তখন অত্যন্ত খুশি হয়ে বললে—"আকাশের মতো।" শিশু এইবার বেশ বুঝতে পেরেছে, রং দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। রং ও তুলি দিয়ে তখন অফুরন্ত খেলার সৃষ্টি হতে লাগল এবং শিশু পরীক্ষামূলক নানা খেলায় তন্ময় হয়ে মেতে রইল। ক্রমশঃ যে রঙের দাগ পড়তে লাগল তার প্রত্যেকটির এক একটি নাম দিয়ে, শিশুটি তার চারি পাশে যে-সব জিনিষ তার চোখে পড়ে সেগুলিকে প্রকাশ করতে সুরু করল। এখন দেখা গেল যে, কাগজে অনেকটা লাল রঙের ছাপ দিয়ে সে বললো,—"ফুল"। আসল ফুলের সঙ্গে তার কোনই সাদৃশ্য নেই, শুধু ফুলের লাল রংটি তার মনে ধরা দিয়েছে, বোঝা গেল। খানিকটা কাল রং লাগিয়ে

বললো—"বিড়াল।" এইভাবে শিশু রং দিয়ে তার পরিবেশকে নিজে বুঝতে এবং অন্যকে বোঝাতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগ্‌ল। ৪ বৎসর বয়সে, সে দৃষ্ট বস্তুটির আকৃতি কাগজে ধরবার চেষ্টা করছে, দেখা গেল। কিন্তু রঙের বিচার তার তখনও পরিষ্কার হয়নি। যে কোনও উজ্জ্বল রংই তার পছন্দ এবং বেশ গাঢ় বেগুনী রং দিয়েও সে গাছ আঁকে, আর লাল রং দিয়ে আঁকে তার ঠাকুরমাকে। ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর দেখা গেল, যে সে বস্তুটির সাদৃশ্য রক্ষা করে রং মিলিয়ে আঁকতে শিখেছে এবং গল্প শুনে গল্পের যে অংশটি তার ভাল লেগেছে, সেটিও আঁকতে চেষ্টা করছে। এই সময়ে বস্তু সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা গেল।

পাঁচ হতে ছয় বৎসরের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেল যে, শিশুটি তুলি ও রং দিয়ে বেশ ঢেউয়ের মত রেখা টানছে। এটিও একটি মজার খেলা হয়ে দাঁড়াল। বারবার ঢেউয়ের মত রেখা টেনে কাগজটি ভরিয়ে দিতে তার আগ্রহ দেখে, তাকে এবার Pattern—প্যাটার্ণ বা নক্সা আঁকা দেখিয়ে দেওয়া হলো। এই নূতন খেলাতেও মত্ত রইল সে বেশ কিছুদিন। নক্‌সা কাটার ছন্দে শিশুর আগ্রহ দেখে তখন তার মা তাকে "ত", "অ", "আ", "ব", "র", "ক", "ঝ," "ধ"—এইভাবে অক্ষরের নক্‌সা আঁকতে দিলেন। শিশু যেমন আঁকে, ঐ সঙ্গে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা ছবির বই তাকে দেওয়া হল এবং মিলিয়ে দেখে দেখে সে বেশ কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকটি অক্ষর চিনতে ও পড়তে শিখে গেল।

অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু লিখতে বা পড়তে বিলম্ব করছে : তখন তাকে এইভাবে লিখতে-পড়তে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে, অন্য সব কাজের মত, তার এই আঁকার কাজও হতে হবে সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কেবল যেখানে দেখা যাবে যে শিশু আর অগ্রসর হতে পারছে না, সেখানেই আসবে নির্দ্দেশ। চিত্রাঙ্কনে শিশুরা সহজেই আগ্রহ দেখায়, কাজেই তাদের এই সহজ স্বাভাবিক আগ্রহটির সুযোগ নিয়েই শিক্ষক নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু শিশুর উপর যদি বেশী চাপ পড়ে, তবে এই আনন্দজনক খেলার কাজটিতেও তার বিতৃষ্ণা এসে যেতে পারে, এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। ছবি আঁকার সমস্ত প্রণালী থেকে বোঝা যায় যে, শিশু প্রথমে রং দিয়ে হিজিবিজি কেটে একটি ক্ষমতা অর্জ্জন করে' আত্মপ্রতিষ্ঠ

হয় এবং খড়ি, ক্রেয়ন্, গোলা রং, পেন্সিল, তুলি দিয়ে যে ইচ্ছামত দাগ কাটা যায় এই সম্পর্কে তার নজর খুলে যায়। এর পরের স্তরে সে নিজেই সন্ধানী ও পরীক্ষামূলক খেলায় রত থাকে এবং শেষে সে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকার জন্য কি সরঞ্জাম উপযুক্ত, তা' বেশ ভাল করে স্থির করতে হবে। প্রত্যেক কাজে ভাল ও উপযুক্ত ফল পেতে হলে, শিশুকেও উপযুক্ত সরঞ্জাম জুগিয়ে দেওয়া চাই। তার জন্য মহার্ঘ্য জিনিষের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন আছে শিক্ষিকার সহানুভূতি, আগ্রহ, চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা এবং নানারকম উপযোগী জিনিষপত্র সংগ্রহ করার সাগ্রহ প্রচেষ্টা। আমরা সচরাচর মাটির রং ব্যবহার করে থাকি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকি 'প্যাকিং' (packing) কাগজ আর বড় সাদা খবরের কাগজ ছাপাবার কাগজ (news-print) দিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে, সাধারণ খবরের কাগজও ব্যবহার করা হয়। শ্লেটে এবং মেঝেতে খড়ি দিয়ে আঁকাও বেশ ভাল। শিশুরা চায় বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে আঁকতে, কাজেই দামী ছোট-মাপের কাগজ দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। প্রথমে তাদের মূল তিনটি রং দিলে বেশ ভাল ভাবেই কাজ সুরু হবে। তারপরে রঙের সংমিশ্রণে আগ্রহ জন্মালে মূল তিনটি রং ব্যবহার করে নূতন রং সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃ। তবে শিশু প্রায়ই কাল রং ব্যবহার করতে চায়, কাজেই সেই রংটিও তাদের দেওয়াই ভাল। তুলির ডগা হওয়া চাই বেশ মোটা, সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে কাজ করে শিশু সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করে না। তাছাড়া, সেগুলি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতিকর।

শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কনের স্থান যেমন অতি উচ্চে, তেমনি অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। "মা কেন কাঁচি দিয়ে দিয়ে কাপড় কাটেন, আমি কেন কাঁচি ধরতে পাই না?"—"বাবা কেন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন, আমি সেগুলিতে হাত দিলে কেন মানা করেন।" এই রকম প্রশ্ন নিয়তই শিশুর মনে জাগে। এর সদুত্তরেই সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। বিধিনিষেধের বেড়াজালে আমরা যে শিশুদের বেঁধে রাখতে চাই, হয়ত তার মঙ্গলের জন্যই; কিন্তু শিশুমন কিছুতেই তা' মেনে নিতে পারে না। সে স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছুই যাচাই করে নিতে চায়;

অন্যের মাপকাঠিতে ওজন করা যে জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়, সেটা তার মনঃপূত হয় না কিছুতেই এবং তাই সে অবিরাম প্রশ্ন করে—"কেন ?" "এটা কি ?" ইত্যাদি। সে এই "কেন"-র মৌখিক উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে চায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বস্তুকে সে প্রথমে ইন্দ্রিয় দিয়ে, তারপর মন দিয়ে গ্রহণ করে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ২ হতে ৫ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা নির্ভর করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপর ; কিন্তু, শিশুর এই মানসিক সঞ্চয় এই বয়সে কোনমতেই বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে না। জ্ঞানকে বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করলে শিশুশিক্ষা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে তার প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই কোন কাজ বা বস্তুকে ঘিরে হওয়া উচিত। এইজন্যই শিশুশিক্ষার কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, শিশু সারাদিনই কিছু গড়ছে বা কিছু ভাঙ্গছে। ছেলেমেয়েরা এই বয়সে কাদা, মাটি, বালি, কাপড়ের টুক্‌রা, বাক্স, কাঠের টুক্‌রা, পেরেক হাতুড়ি ইত্যাদি দিয়ে কিছু-না-কিছু গড়বার চেষ্টা করে। ৪ বৎসর থেকে এই নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়ে শিশু কিছু একটা স্থায়ী জিনিষ গড়ে তুলতে চায়। এই থেকেই সুরু হবে শিশুর শিল্পকলার শিক্ষা। শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে খেলবে বটে, কিন্তু যে শিশু মাটি নিয়ে কেবল গুলি পাকাচ্ছে, তাকে একবার যদি দেখিয়ে দেওয়া যায় যে নানা মাপের মাটির গুলি দিয়ে পাখী, মানুষ ইত্যাদি তৈয়ারী করা যায়—তার এই কাজে ক্রমশঃই আগ্রহ বেড়ে উঠবে। তখন শিক্ষিকা তাঁর শিশুর দলটিকে নিয়ে প্রথমে বাগানে গিয়ে মাটি কেটে আনবেন, ছোট ছোট পাত্রে করে শিশুরা আনবে জল ; তারপর সুরু হবে মাটি মাখা। মাটি থেকে কাঁকর বেছে অল্প অল্প জল দিয়ে বেশ ময়দার মত করে ঠেসে নিতে হয়, এই তথ্যটি শিশুরা শিক্ষিকার কাছে বসে শিখবে। বেশী জল দিলে কাজ চলবে না, আরও একটু মাটি দিতে হবে ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে, শিশু ক্রমশঃ মাটি ব্যবহার করতে শিখবে। মাটির কাজের জন্য সব চেয়ে ভাল হলো "এঁটেল মাটি" ; কাছে নদী থাকলে সচরাচর সেখান থেকেই মাটি এনে নেওয়া ভাল। বেশ ভাল মাটি না দিলে শিশুরা কাজে উৎসাহ ও আনন্দ পায় না। ২ থেকে ২½ বছর বয়সের শিশুরা প্রথম প্রথম মাটি নিয়ে কেবল চট্‌কায় ; এব্‌ড়ো-থেব্‌ড়ো করে, শেষে

গুলি পাকিয়েই ক্ষান্ত হয়। তখন একটি থালা গড়ে নিয়ে যদি ঐ মাটির গুলি তার উপর সাজিয়ে রাখা যায়, শিশুর দল দেখেই বলবে যে, সেগুলি "ফল" অথবা "রসগোল্লা"। তারপরের স্তরে, শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে কাজ করবার সময়, একটা বড় গুলির মুখে একটা ছোট গুলি বসিয়ে দেবেন। হয়তো শিশু দেখে বলবে, সেটা হয়েছে হাঁসের দেহ ও মাথা। মাথার দু'পাশে ছোট দুটি মাটির গুলি বসিয়ে দিলে হবে চোখ। আঙ্গুল দিয়ে আর একটি গুলি টিপে মুখের ওপর বসিয়ে দিলে ঠোঁট হবে। দেহের শেষ ভাগটা তখন হাত দিয়ে টেনে দিলেই হবে লেজ। তারপর নীল রং-করা একখণ্ড কাঠ নিয়ে সেটিকে বসিয়ে দিলে শিশুরা বলবে, "হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে।" এর পর, শিশুরাই ঘাস, পাতা সংগ্রহ করে হাঁসের চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে দেখাবে ঝিলের পাশে গাছের ও ঘাসের কি সমারোহ। তারপরে তারা নিজের নিজের গড়া হাঁস বা পাখী নিয়ে ছায়াতে শুকাতে দেবে। খুব কড়া রোদে শুকাতে দিলে মাটির জিনিষ ফেটে যায়, এ তথ্যটিও তারা জানবে ঐরূপ প্রত্যক্ষ ভাবেই। হাঁসগুলি শুকালে, আসবে রং দেওয়ার পালা, তারপরে সেগুলি ছোট বড় নানাভাবে সাজানো, মোট কয়টি তৈরী হলো তা' গুণে রাখা, এই সব দিয়ে নানা শিক্ষা-সম্ভাবনা পাওয়া যায় মাটির কাজের মধ্যে।

তারপরে ধরা যাক কাগজ কাটার কাজ। ছিঁড়তে, কাটতে, ভাঙ্গতে, গড়তে শিশুর স্বভাবতঃই বড় আগ্রহ। জীবনে যে আবির্ভাব ও তিরোভাবের ছন্দ আছে, সংকোচন, সম্প্রসারণ, উত্থান, পতন, হ্রাস, বৃদ্ধি, অর্জ্জন, বর্জ্জনের যে পর্য্যাবৃত্তি হয়, তা শিশু তার কাজের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করে। ২ বৎসরের শিশুকে হাতের কাছে কিছু নানা রঙের কাগজ জুগিয়ে দিলে সে প্রথমে দুই হাতে কাগজ নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবে, তারপরেই ছিঁড়ে ফেলবে। শিক্ষিকা তাদের সঙ্গে বসে কিছুটা কাগজ ছিঁড়বেন, তারপরে ছোট ছোট টুক্‌রা কাগজগুলি হাতে করে গুলি পাকাবেন। এই পদ্ধতিকে বলে কাগজ-পাকানো (paper crumpling)। কাগজগুলি পাকানো হলে শিক্ষিকা নানা রঙের গুলি নিয়ে শিশুদের সাহায্যে সেগুলিকে কখনও ফুলের আকারে, কখনও বা পাতার আকারে সাজিয়ে তাদের সামনে যে কোন একটি নমুনা তুলে ধরবেন। এইভাবে ২ থেকে ২½ বৎসর বয়সের শিশুরা কাগজ ছিঁড়ে, সেই ছেঁড়া কাগজ দিয়ে আবার একটা সুন্দর

জিনিষ গড়ে তুলতে পারে। এছাড়া, ছেঁড়া রঙীন কাগজ কেবল আঠা দিয়ে আর একটি কাগজের ওপর সেঁটে বসিয়েও নানারকম নক্‌সার সৃষ্টি করা যায়। এসব কাজ ২ থেকে ২½ বছর বয়সের শিশু অনায়াসেই করতে পারে।

৩ বৎসর বয়স থেকে শিশু কাঁচি চালাতে পারে। আমরা কাঁচি চালানো অভ্যাস করাই নানাভাবে। কয়েকটি সচিত্র পত্রিকা জুগিয়ে দিলে, প্রথমে তারা ছবিগুলি দেখবে; ছবি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা করবে। তারপরে কয়েকটি ছবি শ্রেণীকক্ষে টাঙ্গাবার জন্য বেছে নেওয়া হবে। এবারে ছবির চারি ধারে বেশ মোটা করে রঙীন পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে দিলে শিশু সেই দাগে দাগে কাঁচি দিয়ে কেটে ছবিটি পত্রিকা থেকে বার করে নেবে এবং মোটা কার্ডবোর্ডের উপর তখন সেই কাটা ছবিটি আঠা দিয়ে সেঁটেও দেবে। তারপর সূতা বা সরু দড়ি দিয়ে সেটি টাঙ্গানোর ব্যবস্থা হলেই ক্লাসঘরের জন্য একটি বেশ সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে।

৪ বৎসর বয়স থেকে, শিশুরা কাগজ কেটে নানা গল্পের ও ছড়ার চরিত্রগুলির রূপ দিতে পারে এবং সেগুলি মোটা কাগজের উপর সেঁটে যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে অতি উৎকৃষ্টভাবে শিশুদের চিত্তবিনোদনের উপায় উদ্ভাবিত হয় কয়েকটি বেশ উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত ছবি কার্ডবোর্ড কিংবা 'প্লাইউড' (plywood) এর উপরে সেঁটে নেওয়ার পর, যদি ছোট করাত দিয়ে সেগুলিকে আঁকাবাঁকা-ভাবে ১৬ টুক্‌রা করে কেটে ফেলা যায় তাহলে বেশ একটা মজার ধাঁধার খেলা —jig-saw puzzle প্রস্তুত করা যায়। ঐ কাটা টুক্‌রাগুলিকে তখন জোড় মিলিয়ে আবার প্রত্যেক ছবিটি ঠিকমত গড়ে তোলা, এই হলো সেই ধাঁধার খেলা।

৫।৬ বৎসরের শিশুরা এইভাবে ছড়া ও গল্পের চরিত্রগুলি রঙীন কাগজে কেটে নিয়ে চলচ্চিত্রেরও (cinema) ব্যবস্থা করতে পারে। এটি খুব চমৎকার ব্যাপার এবং এর ব্যবস্থা হয় এই রকমেঃ গল্প বলার পর, আলোচনা করে সকলে মিলে গল্পের চরিত্রগুলি আঁকবে, তারপরে দলের দশটি ছেলে গল্পের চরিত্র ও দৃশ্যপটগুলি কেটে অন্য পাঁচটি শিশুর হাতে সেগুলি দেবে। তারা সরু সরু লম্বা কাগজে গল্পের ঘটনা পরম্পরানুযায়ী চরিত্র ও দৃশ্যপট আঠা দিয়ে সেঁটে দেবে। এই ছবি-সাঁটা লম্বা কাগজগুলি দিয়ে হবে সিনেমার "রীল"। তারপরে একটি প্যাকিং বাক্সের দুই পাশে,

উপরে ও নীচে, দুটি করে চারিটি—সমান মাপের এবং সমান্তরাল করে—ফুটো করে নিতে হবে। এইবারে দুটি মাপসই কাঠের লাঠি নিয়ে প্যাকিং বাক্সের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর লাঠির উপরে ও নীচে, ছবির রীলের
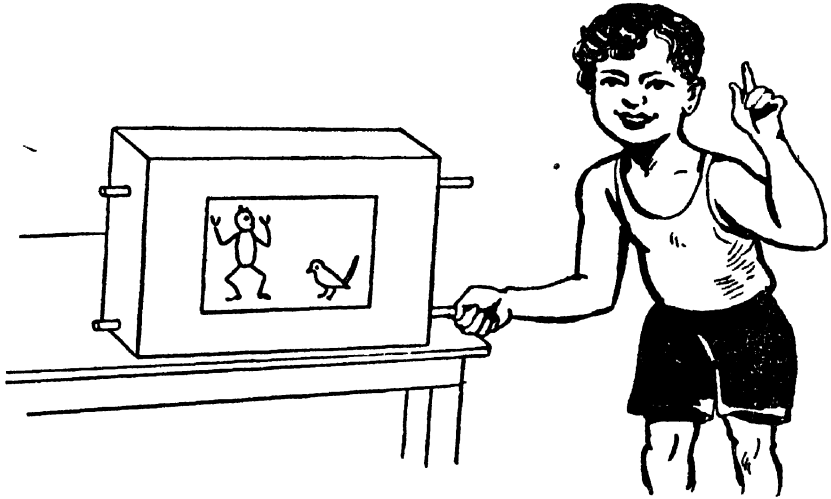
শেষ প্রান্ত দুটি আঠা বা পিন্ দিয়ে সেঁটে, "রীল" ঘোরালেই তখন ছবিগুলি উপরে, নীচে চলাফেরা করতে থাকবে। শিশুরা কোনদিন হয়ত চিড়িয়াখানা ঘুরে এসে, নিজেদের জন্যে একটা পশুশালা প্রস্তুত করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তখন কাগজ ও কার্ডবোর্ডে জন্তুজানোয়ারের আকৃতি কেটে তারা নিজেদের জন্যে বেশ একটা পশুশালা প্রস্তুত করে নিতে পারে। এই পদ্ধতিতেই, অভিনয়ের জন্য নানারকম মুখোসও তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

এবার ধরা যাক কাঠের কাজ। শিশুদের সামনে কতকগুলি কাঠের টুকরা রাখলেই তারা একটার ওপরে একটা বসিয়ে কখন বাড়ী, কখন গাড়ী, কল্পনা করে খুশি হয়। এর থেকেই ক্রমশঃ সৃজনাত্মক কাজের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কোনও বড় ছুটির পরে শিশুরা স্কুলে এসেছে। কথাবার্ত্তার মধ্যে একজন বলে উঠল—"দিদিমণি, আমি মধুপুরে গিয়েছিলাম।" মধুপুরে যেতে হলে ষ্টেশনে গিয়ে রেলে চড়তে হয়, ইত্যাদি আলোচনা তখন সুরু হলো। এর

পরেই একদিন সদলবলে কোনও একটি ষ্টেশনে গিয়ে বেশ ভাল করে ষ্টেশনটিকে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। ফিরে এসে, শিশুদের মধ্যে একটি রেলগাড়ী গড়বার আগ্রহ দেখা দিল, এইবারে কাঠের ছোট ছোট টুকরা পেরেক দিয়ে ঠুকে বাক্স তৈরী করে, তাতে চাকা লাগিয়ে এবং একটির সঙ্গে অন্যটি হুক্ (hook) দিয়ে লাগিয়ে, একটি এঞ্জিন তৈরী করে এবং রেলগাড়ীতে রং দিয়ে—বেশ একটা মজার খেলনা সৃষ্টি করা গেল। তারপরে, ষ্টেশনবাড়ী, সিগন্যাল (signal), বাতি, ঘণ্টা সমস্তই একে একে তৈরী ও সংগ্রহ করে পরিকল্পনাটিকে (project) সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। খুব ছোট যারা, তারা খালি দেশলাই-এর বাক্স ও সোলা দিয়ে ঠিক সেই একই জিনিষ তৈরী করে নিতে পারে।

"চলেছে কলের গাড়ী হুস্ হুস্ হুস্।
লম্বা চোঙ্গে উড়ছে ধোঁয়া—হুস্ হুস্ হুস্।
গড়গড়িয়ে চলে গাড়ী
রেলের ওপর তাড়াতাড়ি
কাঁপিয়ে ঘরবাড়ী—
শব্দে, হুস্ হুস্॥"

এই ছড়াটি, আবৃত্তি করে কিংবা সুরে বেঁধে গান গেয়ে, মহা আনন্দের সঙ্গেই তখন স্কুলঘরে রেলগাড়ী চলার আয়োজন সমারোহে সাধিত হবে। এছাড়া, কাঠের নৌকা, ট্রাম, বাস, পুতুলের বাড়ী, চৌকি, খাট, টেবিল—এসবই ছেলেমেয়েরা শিক্ষিকার উৎসাহে ও সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে প্রস্তুত করে নিতে পারে।

৫ বৎসর পর্য্যন্ত, শিশুদের আমরা সেলাই-এর কাজ বড় একটা দিই না। কারণ, তখনও তাদের চোখের সূক্ষ্ম পেশীসমূহ যথেষ্ট সবল হয় না। কাজেই কোনও প্রকার সূক্ষ্ম কাজে তাদের দৃষ্টিশক্তির সমূহ ক্ষতি হতে পারে। এই সময় শিক্ষিকা পুতুল, জন্তুজানোয়ার তাদের সামনে বসে সেলাই করতে পারেন। খুব ছোট যারা, তারা সেগুলিতে তুলো ভরে সাহায্য করবে। ৫ বৎসরের পরে শিশুরা চটের উপর কার্পেটের সূচ দিয়ে বড় বড় "ফোঁড়" তুলতে পারে এবং নিজেদের পুতুলগুলির জন্যে জামা, শয্যাবস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করতে

পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাপড় জামাগুলি মাপে বেশ বড় হয় এবং কতকগুলি ছেঁড়া, রং-জ্বলে গেছে এমন কাপড় না দিয়ে নূতন কাপড়ের টুকরা সংগ্রহ করাই ভাল। সেলাই-এর সময় রঙীন সুতো মানানসই রকম দিতে পারলে, ছোট থেকেই শিশুর সৌন্দর্য্যানুভূতি বিকাশে সাহায্য করা হবে।

এইভাবে শিশুকে নানারূপ কাজের মাধ্যমে ক্রমশঃ শিল্পকলা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা শিক্ষিকার দায়িত্ব। উপাদান ও উপকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুবিধা এই যে, এইভাবে শিশু তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তৃপ্ত করতে সুযোগ পায়। চোখের মাংসপেশী, হাত ও আঙ্গুলগুলি ক্রমশঃ সবল ও সংযত হয়ে চোখ ও হাতের সংযোগ সাধিত হয় এবং নানা অভ্যাসের ফলে, শিশু স্বাবলম্বী হতে শেখে এবং পেশীসমূহের সংহতির ফলে, শিশু অনায়াসেই লিখতে ও পড়তে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, নার্সারি স্কুলের শিক্ষা পুঁথির গণ্ডীর বাইরে ; এবং না জানা হতে ক্রমে জানার আনন্দ পাবে বলেই হয়ত শিশু নির্জ্ঞান মন নিয়েই জন্মায়। এইজন্যই শিশু জন্মের কিছুদিন পরেই, নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। শিশুর এই কৌতূহলটি জাগিয়ে রাখাই প্রত্যেক শিশু-শিক্ষায়তনের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক উপকরণ, প্রত্যেক উপাদানের মাধ্যমে শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহ যদি শিক্ষিকা জাগিয়ে রাখতে পারেন তাহলে শিশু ক্রমশঃ পরীক্ষামূলক কাজ করতে চেষ্টা করবে। পরীক্ষামূলক কাজ করতে গেলেই প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হয়। এবং তারই ফলে শিশু নিজের একটি ছোট পরিকল্পনা গঠন করে নিজেই সেটিকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। এইরূপে, শিশু ব্যক্তিগতভাবে নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষিকা এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ্যমাত্র। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা নানাভাবে অসুবিধাজনক হওয়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুদের এতে সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে মনে করতে পারেন যে, আমাদের এই দরিদ্র দেশে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব, কেননা এই পদ্ধতিক্রমে শিক্ষায়তনের শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাই—নানাবিধ উপকরণ ও সামগ্রীসম্ভার। একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু শিক্ষিকার অন্তর্দৃষ্টি

থাকলে এসকল অসুবিধা তিনি অনায়াসেই দূর করতে পারেন। যেমন ধরা যাক—প্রথমে শিশুর দলকে পান্তাবুড়ীর গল্পটি বলা হলো। গল্প শুনতে দলের প্রায় সব ছেলেমেয়েই আসে, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় যদি তখন কেউ গল্প শুনতে আসতে না চায়, তাকে জোর করা হয় না। এখানে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দিলেও নিজেদের ক্ষমতানুসারে তারা প্রত্যেকেই কিছুটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে। তারপরে,এই গল্পটিকেই কেন্দ্র করে মাটির কাজ দেওয়া হলো। এ সময় শিক্ষিকা যদি পরিকল্পনা অনুসারে তাদের সামনে কেবল একটা "ছুরী" রেখে বলেন যে, "তোমরা সকলে একটা ছুরী গড়," তাহলে তাদের উপরে শিক্ষিকা নিজের ইচ্ছাই আরোপ করলেন। কিন্তু গল্প বলা হয়ে গেলে পর যদি বেশ কিছুক্ষণ ঐ নিয়ে গল্প-সল্প, আলাপ-আলোচনা চলে তাহলে শিশুরা সহজেই বুঝে নেবে যে, গল্পের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্র আছে, যথা—(১) বুড়ী, (২) চোর (৩) বেল, (৪) ছুরী, (৫) সুচ, (৬) সিঙ্গি মাছ, (৭) কুমীর, (৮) রাজা, (৯) সেপাই, আর (১০) মন্ত্রী। এ ছাড়া হাঁড়ি, থালা, লাঠি, গেলাস ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রীরই অবতারণা ঐ গল্পে করা হয়েছিল। একটি একটি করে, এইগুলি তখন শিক্ষিকা বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিশুরা, যার যেমন ইচ্ছা, একটা কিছু গড়বে। শিক্ষিকা শিশুদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের উৎসাহ দেবেন এবং প্রয়োজন হলে, সাহায্য করবেন। কিন্তু কখনও কোন শিশুর কাজের সমালোচনা করবেন না, একজনের কাজের সঙ্গে অন্যের কাজ তুলনা করে কোন মন্তব্য প্রকাশ করবেন না। শিক্ষণীয় বিষয়ের যতটুকুর উপর শিশুর মন দখল ও কর্তৃত্ব লাভ করে, অল্প হলেও সেইটুকুই তার প্রকৃত শিক্ষা ; আর শিক্ষার নামে যা' মনকে ভারাক্রান্ত ও আচ্ছন্ন করে দেয়, তাকে শিক্ষার বোঝা চাপানো বলে—তাকে শেখানো বলা চলে না।

মাটির কাজ হয়ে গেলে, শিশুদের যদি গল্পটির সম্পর্কে আগ্রহ তখনও জাগ্রত থাকে, তাহলে ছবি আঁকার ব্যবস্থা হতে পারে ; এবং, ছবি আঁকা শেষ হলে, সেগুলি সরু সরু ফিতের মতন কেটে কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে বসিয়ে চল-চ্চিত্রের জোগাড় হয়ে যায়—কাঠের 'ফ্রেম' ত' আগেই তৈরী করা রয়েছে। রীল পরিবর্ত্তন করে শিশুরা কিছুক্ষণ নূতন ছবি দেখবে। মনে রাখা ভাল যে

শিশুদের আনন্দবর্দ্ধক শিক্ষার কোন আয়োজনই ১৫ মিনিটের বেশীক্ষণ যেন করা না হয়। শিশুমনের পক্ষে তারপর আগ্রহ ও উত্তেজনার বিরতি ও বিশ্রাম আবশ্যক হয়ে পড়ে। ছবি দেখার পরেও যদি গল্পটির সম্পর্কে শিশুদলের উৎসাহ থাকে. তখন অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশুরা নিজেরাই চরিত্র বাছাই করে নিয়ে, তারপর সাজ-পোষাক, কাপড়-জামা গহনাপত্র ইত্যাদি বাক্স থেকে বার করে নেবে এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করবে—শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে। সকলে প্রস্তুত হলে, অভিনয় সুরু হবে। এই সময় অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদেরও তারা অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ করতে পারে। অভ্যাগতদের বসবার জন্য জায়গা করা, আসন পাতা ইত্যাদি কাজগুলি শিশুরাই করবে। অভিনয়াদির পর, ঐ গল্পটিকেই কেন্দ্র করে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতে হবে, এবং তারজন্য চাই অনেকগুলি বিশিষ্ট বিবরণ-পত্র (individual cards) যেগুলির সাহায্যে সমস্ত গল্পটিকে বিশ্লেষণ করে শিশুদের সামনে ধরা হবে। এই বিশেষ পদ্ধতিটি সম্পর্কে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে যতগুলি কর্ম্মপদ্ধতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা গেল তা' থেকে বোঝা যায় যে, সারাদিন ধরে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুকে ব্যক্তিগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। খেলা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার জন্য চাই পরম ধৈর্য্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

প্রত্যেক শিশু নিজের স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পায়। একথা আমরা সকলেই জানি। শ্রেণীগতভাবে শিশুদের শিক্ষা দিলে, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে এমত একটি পরিকল্পনা করতে হয় যাতে শ্রেণীর মাঝারি রকমের ছেলেমেয়েরা বেশ ভাল করেই বিষয়বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের এতে সময় নষ্ট হয় এবং কম বুদ্ধিমান শিশুরা পিছিয়ে পড়ে থাকে। তাই, ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিলে শিশুরা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী কাজ করতে সুযোগ পায় এবং সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে জীবনপথে অগ্রসর হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচনা কালে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে থাকে। আগেকার সময়ে দেখা যেত বিদ্যালয়ে কঠিন শৃঙ্খলা বিধান এবং তার পালনেরও কঠোর নিয়ম অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। শিশু ও প্রাথমিক

বিদ্যায়তনে আহার, মলমূত্রত্যাগ ও বিশ্রাম প্রভৃতির সময় ধরা-বাঁধা নিয়মে হওয়া উচিত। এছাড়া অন্য কোন কাজে বা সময়ে কড়া বিধিনিষেধ না থাকাই উচিত। বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, শিক্ষিকা শিশুদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতানুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ে কোনমতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে না। একথা সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। আনন্দজনক ও তৃপ্তিদায়ক কাজের মধ্যে শিশুরা এমন তন্ময় হয়ে থাকে যে তাদের মনে কোন ভয় থাকে না; তারা পুরস্কার বা দণ্ডের প্রত্যাশা করে না। একটির পর একটি শিক্ষাপ্রদ কাজ সম্পন্ন করে' তারা শরীর ও মনে ক্রমশঃ যে সংযম শিক্ষা করে তারই গুণে তাদের মধ্যে অটুট শান্তি বিরাজ করে, শিক্ষিকাকে বিধিনিয়ম প্রয়োগ করে শান্তিরক্ষা করতে হয় না। এইভাবে, নিজ অন্তর হতেই যেদিন শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার প্রয়োজন-বোধ সকল নাগরিক উপলব্ধি করতে পারবে, সেদিনই আসবে দেশে সুদিন—এবং সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গোড়াপত্তন করা হয় শিশুশিক্ষায়তনে।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, শিশুর আগ্রহপূর্ণ ঔৎসুক্য (span of interest) ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা বেশী নয়। অনেক সময় এই সত্যটির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষিকা প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর শিশুর কাছে একটি নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হতে পারে না; কিন্তু এইভাবে ১৫।২০ মিনিট অন্তর নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা শিক্ষিকার পক্ষে নিতান্তই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, কেননা এ বিষয়ে শিশুর গ্রহণ করবার শক্তিও বিচার করতে হবে। খেলা বা কাজ যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য্যজনক হোক না কেন, নিরন্তর পরিবর্ত্তনের ফলে শিশুর মন শ্রান্ত হয়, কারণ কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না, বরঞ্চ মন তাতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বৈচিত্র্য মনকে বিশ্রাম দেয়, একথা অংশতঃ সত্য হলেও হঠাৎ একটা বিষয় হতে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অন্য একটি বিষয়ে শিশুমনকে আকর্ষণ করে নেওয়া শিশুর পক্ষে ক্লেশকর। এছাড়া মনের গতির বেগকে একদিকে থামিয়ে দিয়ে আবার আর এক দিকে চালনা করবার সময়ে মনের একটি সহজ শক্তির অপব্যয় ঘটে। কাজেই বৈচিত্র্য যাতে মনকে তেজ ও শক্তি দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সারাদিনের কাজের মধ্যে যেন একটি অখণ্ডতা থাকে, এ সম্বন্ধে শিক্ষিকাকে অবহিত হতে হবে। কেননা, শিশু কখনও জগৎকে খণ্ড খণ্ড করে

দেখে না। পরিবেশের, তথা জীবনের সঙ্গে শিশুর শিক্ষার যাতে নিবিড় মিলন ঘটতে পারে শিশুশিক্ষায়তনে তার ব্যবস্থা না থাকলে শিশুশিক্ষা ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা।

শিশুশিক্ষায়তনে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার স্থান যে অতি উচ্চে, একথা আজ স্বীকার না করে উপায় নাই। কিন্তু দলগত ও শ্রেণীগত ভাবে শিক্ষাপ্রণালীর স্থান একেবারে অস্বীকার করলে নূতনত্বের প্রতি আমাদের যে অস্বাভাবিক আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব তাও বিশেষ ভাবে বোঝা যাবে। শরীরচর্চ্চা, নিয়ন্ত্রিত খেলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, গল্পশোনা, প্রকৃতিপাঠ ও পরিবেশ-পরিচিতি, ইত্যাদি বিষয়গুলি দলগত ও শ্রেণীগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এসব কাজে পরস্পরের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন; এবং শিশুরা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারে যে যৌথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করলে, অনেক কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষকের উপদেশবাণীতে যে সকল গুণাবলী শিশু সহজে আয়ত্ত করতে পারে না, অনেক স্থলে শিশুরা পরস্পরকে দেখে সেগুলি শিখে ফেলে। এ ছাড়া, আজ পৃথিবীতে আমরা আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, সর্ব্বপ্রকার আদান প্রদান, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে ফেলেছি। হয়ত, তার ফলে কিছু পারিবারিক সুবিধা বা আরাম পাওয়া গেছে, একথা সত্য; কিন্তু সমগ্র দেশের, তথা মানবজাতির মধ্যে যে একতার শক্তি ও সম্পূর্ণতা আছে, তা হতে আমরা বঞ্চিত হয়ে দীনহীনের মত বাস করছি। ঐক্যের যে কি অসীম শক্তি, তার দ্বারা নানা বিরাট ও মহান মঙ্গলকর্ম্ম সাধন করা যায়, শৈশবে এই শিক্ষার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, ভবিষ্যতে সমাজের ও সংসারের বহু অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে বলেই আশা করা যায়।

সব শেষে শিশুর চিত্রাঙ্কন ও সৃজনাত্মক কাজ সম্বন্ধে বলতে চাই যে, এ সকল কাজ যেমন-তেমন, বা অবহেলা ভরে করা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। এ সকল কাজের দ্বারা শিশুর যেমন মানসিক ও আনুভূতিক বিকাশ হয়, তেমন সংসারে বসবাসের জন্যও তাদের সহজ প্রস্তুতি হয়। আশৈশব অভ্যাসক্রমে শিশু ভবিষ্যতে একান্ত নিবিষ্ট হয়ে শোভনভাবে যেন সকল কাজ করতে পারে— সেইজন্য শিক্ষিকা সমস্ত কাজে তাঁর নিজের সাধনা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করবেন। তাহলে শিশুও তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক অভিব্যক্তিতে সেই অভিনিবেশ, সৌষ্ঠব, নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা প্রকাশ করতে শিখবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা

স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলা, কথোপকথন, সঙ্গীত, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন এবং অন্যান্য শিল্প-কর্ম্মের সাহায্যে আমাদের শিশুদের যে ভাবে প্রস্তুতি হয়, তাতে দেখা যায় যে তাদের ৫ বৎসর পূর্ণ হলেই তারা মাতৃভাষা পড়তে, লিখতে এবং ছোট ছোট অঙ্ক কষতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। শিশু দেখে বাড়ীতে তার বাবা, মা, দাদা, দিদিরা পড়াশুনা করছেন। রাস্তায় প্রাচীরপত্র ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে তার কৌতুহল জেগে ওঠে এবং ক্রমে শিশু তার দাদা ও দিদির মত বই পড়তে চেষ্টা করে। এমন সময়ে হয়তো তার জন্মদিনে তার মামা একটি ছড়া ও ছবির বই তার হাতে দিলেন, সেট পড়বার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এইভাবে শিশু যখন পুস্তকপাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং শিক্ষিকা যখন দেখবেন যে লেখাপড়া শেখবার জন্য শিশুর মানসিক প্রস্তুতি হয়েছে, তখনই তার লেখা-পড়া আরম্ভ করতে হবে, তার আগে নয়। আজকাল মনস্তত্ত্ববিদগণ শিশুর মানসিক বয়স কত তা পরীক্ষা করে তবে কাজ আরম্ভ করতে উপদেশ দেন। আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের সে সুযোগ ও সুবিধা এখনও হয়নি, কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষিকা নিয়মিতভাবে শিশুর প্রগতি লক্ষ্য করলে শিশুর লেখাপড়া শেখার দিন এসেছে কিনা, তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

শিশুর ভাষাশিক্ষা সুরু হয় মাতৃক্রোড়ে—অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হতেই জননীর সুধাকণ্ঠে যে ভাষা ধ্বনিত হয় শিশু তা আকর্ষণ করে নেয় আপনার মনপ্রাণের মধ্যে। ক্রমে শিশু নিজের আনন্দানুভূতি আপনার প্রিয়জনকে জ্ঞাপন করবার জন্য কিম্বা নিজের অসুবিধা দুর করবার জন্য নানারূপ শব্দের সাহায্য নেয়। এই নানারূপ ধ্বনিই শেষে ভাষায় পরিণত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিশু আপনার প্রয়োজনের তাগিদে ও কাজের সুবিধার জন্য কথা বুঝতে ও বলতে চেষ্টা করে। নবজাত শিশু যখন জল-স্থল-আকাশ-বায়ুর ধাত্রীক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে তখন তার কাছে সকলই অপরিচিত,

কিন্তু এই অজ্ঞাত, বিস্ময়ভরা পৃথিবীকে জানবার জন্যে তার মনে থাকে এক অদম্য কৌতুহল। সে তার পারিপার্শ্বিকের সকল বস্তু ও ঘটনাকে জানতে ও বুঝতে চায়। এই জন্যই সে সর্ব্বদা "এটা কি, কেন ও কখন" ইত্যাদি প্রশ্ন করে এবং জিনিষপত্র নেড়ে চেড়ে নিজের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে। জৈব প্রয়োজন ভিন্ন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করার একটা আনুভূতিক দিক আছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার পক্ষে এও একটি অতি বড় প্রেরণা। নিজের মনে যে ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস আসে, শিশু তার প্রিয়জনের কাছে তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। পিতা-মাতা তার সুখ-দুঃখের ভাগী হলে সে আর ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না। যখন শিশু ভাষার সাহায্যে এই আবেগ ও অনুভূতিগুলির কিয়দংশ প্রকাশ করতে পারে তখনই আসে তার মুক্তি। এর পরে তার ভাষাশিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে এবং ক্রমে আসে তার বই পড়বার অদম্য আগ্রহ।

আমাদের বাংলাদেশের পাঠশালাগুলিতে দেখা যায় যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার পরমুহূর্ত্ত হতেই শিশু পড়তে ও লিখতে আদিষ্ট হয়। যেন শিশু লেখাপড়া গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুর নিয়মিত পড়া ও লেখার দিকে গুরুত্ব আরোপ না করে তার মন প্রস্তুত করার জন্য খেলা ও আনন্দের প্রচুর পরিমাণে আয়োজন থাকলে শিশুমন পড়া ও লেখার জন্য আপনা আপনিই উন্মুখ হয়ে উঠবে—একথা আমাদের শিশু-শিক্ষিকাকে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে। কি ভাবে মন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সহরের শিক্ষিত পরিবারে দেখা যায় যে ১½।২ বৎসরের শিশুও কলম, কালি, বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়ে টানাটনি করে এবং যে শিশুর গৃহে লেখাপড়ার কোনই আবহাওয়া নাই, তারও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে এত ছবি, প্রাচীরপত্র, বড় বড় হরফের খবরের কাগজের লেখা বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, যে এই সমস্তই তার মনে অনবরত দোলা দেয়। গ্রামের শিশুর অবস্থা এদিক দিয়ে একেবারে শূন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে নিরক্ষর পিতার গৃহে শিশু বই, কাগজ, কলম কিছুই পায় না ; কোন কোন ক্ষেত্রে চোখেও দেখতে পায় না। অবশ্য কেবল বই নাড়াচাড়া করলে বা কয়েকটি ছবি দেখলেই যে মন পড়া ও লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, একথা বলা চলে না, কিন্তু এগুলির ব্যবহারে শিশুর অচেতন মনে এমন একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে যাতে শিশু পরবর্ত্তী জীবনে লেখা-

পড়ার সুযোগ পেলে তাতে অনাগ্রহ দেখায় না। গ্রাম্য-আবেষ্টনীতে ও দরিদ্র পরিবারে এ সকল সুযোগের একান্ত অভাব বলে, যে সব জিনিষ শিশুর পড়ার ইচ্ছা উদ্রেক করতে পারে, শিশু-শিক্ষায়তনে সে সব জিনিষের সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। নানারকম ছবির বই, বড় বড় সুন্দর ছবি ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিশু যথেচ্ছভাবে এই সকল ব্যবহার করতে পারবে। এসকল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য সকল শিশু-শিক্ষায়তনের নাও থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষিকা অনেক চিত্র এবং চিত্রসম্বলিত ছোট ছোট ছড়া ইত্যাদি নিজের হাতে প্রস্তুত করে শ্রেণীকক্ষে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এই সকল দেখে ও ব্যবহার করে শিশুর পড়ার ইচ্ছা উদ্রিক্ত হওয়া অসম্ভব নয় এবং ক্রমে তার জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, অবশেষে আরও বেশী জানবার আশায় সে শিক্ষিকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এইভাবে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগ্রত হলে শিক্ষিকা অনায়াসেই শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

ভাষা শিক্ষার মুলতঃ তিনটি দিক আছে—বলতে শেখা, পড়তে শেখা ও লিখতে শেখা। কথা বুঝতে ও বলতে শেখা শিশুর জীবনে ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান, একথা বলাই বাহুল্য। শিশু-শিক্ষায়তনে কথা বলতে প্রচুর সুযোগ না পেলে শিশুর ভাষাশিক্ষা ব্যাহত হওয়ারই সম্ভাবনা; সেইজন্য বিশ্রামের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে শিশুকে ভাষার দ্বারা আত্মপ্রকাশের প্রচুর অবকাশ দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম ও খেলাধুলা সম্বন্ধে শিশু অনর্গল কথা বলতে চায় এবং দেখা গেছে যে অবাধভাবে সুযোগ পেলে সে অল্পদিনের মধ্যেই কথিতভাষায় নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয়। এই বয়সে শিশুর অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের মধ্যে কোন ব্যবধান ও পার্থক্য না থাকলে তার ভাষাশিক্ষা সরস ও সার্থক হয়ে উঠবে। সেইজন্য অভিভাবকগণ ও শিক্ষিকা শিশুর জন্য এমন পরিবেশ রচনা করবেন যার মধ্যে থাকবে আনন্দময় শিক্ষা সম্ভাবনা। শিশুমনের সুপরিণতির জন্য চাই উন্মুক্ত আকাশ, বাতাস, মাঠ, গাছপালা, পশুপক্ষীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ। আমাদের শিক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সকলই বিশ্বজননী উদার হস্তে আমাদের দিয়েছেন,—এখন চাই তার পরিপূর্ণ ব্যবহার। শিশুর নবীন হৃদয়ে আছে সজীব কৌতুহল; শরীরে আছে সজীব ইন্দ্রিয়শক্তি— যে শক্তির সাহায্যে শিশু সন্ধান করবে, নিজে চিন্তা করবে, নিজে কাজ করবে

এবং নিজের চেষ্টায় সেই অভিজ্ঞতা ও কাজের বর্ণনা দেবে তার নিজের ভাষায়। এই পদ্ধতিই শিশুর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এইজন্যই শিশু আমাদের শিক্ষায়তনে এসেই পায় অবাধভাবে খেলাধূলার সুযোগ। এই সময়ে কোথাও শিশুর দল বাগানে মাটি খুঁড়ে সযত্নে ফুলের চারা রোপণ করছে ও জল দিচ্ছে—কোথাও পাখীর পালক সংগ্রহে ব্যস্ত, কোথাও বা গাছের শুক্না পাতা সংগ্রহ করে সারের স্তূপ প্রস্তুতে রত। এইভাবে বাগানে কি গাছপালা আছে, কখন তাদের ফুল ধরে, ফল ধরে, পাতা ঝরে, পাতা ওঠে, কি তাদের রং, তাদের ডালপালা, কি-ই বা তাদের আকৃতি প্রকৃতি, নিজেরাই পর্য্যবেক্ষণ করে জেনে নেবে। আর একদিকে শিশুর দল রান্নাবান্না করছে, বাজার করছে, পুতুলকে স্নান করাচ্ছে, এমনই কত কি। কেউ বা বালির স্তূপে পাহাড়, জলাশয়ের সৃষ্টি করে নিজেদের কল্পনাবৃত্তিকে সার্থক করে তুলছে। আবার কয়েকজন কাঠের ওপরে কাঠ বসিয়ে, পেরেক ঠুকে নিত্য নূতন বস্তু সৃষ্টি করে ধ্বংস ও সৃষ্টি করার যে সহজ প্রবৃত্তি তা পরিতৃপ্ত করছে। এই সময়টিই হলো শিক্ষিকার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সুযোগ তিনি অবহেলা করবেন না। শিশুদের কর্ম্মোৎসাহে আনুকূল্য করাই তাঁর কাজ; তিনি শিশুদের কাছে বসে কথোপকথনের সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মিলন ঘটিয়ে দেবেন। মুখে মুখে যে সংবাদ শিক্ষিকা শিশুর মনের দ্বারে পৌছিয়ে দেবেন, তাতেই তাদের স্বাভাবিকরূপে মানসিক শক্তির বিকাশ হবে। এ যেন "এক দীপশিখা হইতে আর একটি দীপশিখা জ্বালিয়ে নেওয়া, ইহাতে শিশু যেটুকু শিখিবে তাহাই প্রয়োগ করিতে শিখিবে, শিক্ষা তার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে।"

এই শিক্ষাসম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে আমরা শিশুকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে কথোপকথনের সাহায্যে ভাষাশিক্ষা দিতে চেষ্টা করি তারই কয়েকটি নমুনা দেওয়া ভাল। যেমন যখন শিশুরা পুতুল খেলে—তখন পুতুল সংক্রান্ত যে সকল কথাবার্ত্তা সচরাচর হয়ে থাকে তার একটি তালিকা রচনা করা হয়েছে :—

ক (১) পুতুলের নাম, সৌন্দর্য্যের বিবরণ, পোষাক ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

(২) পুতুলের আহার্য্য ও তৎসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা।

(৩) পুতুলের বিশ্রাম ও আনুসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা।

(৪) পুতুলের অসুখ ও চিকিৎসা।

(৫) পুতুলের ব্যবহার, তার জন্য পুরস্কার, প্রশংসা, তিরস্কার, দণ্ড ও শাসনবিধি।

(৬) পুতুলের মলমূত্র ত্যাগ, স্নান ও পরিচ্ছন্নতা।

(৭) পুতুলের খেলাধুলা ও খেলনা।

(৮) পুতুলের জন্মোৎসব, বিবাহ ও মৃত্যু ইত্যাদি।

খ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা।

(১) দিনের আবহাওয়া।

(২) বাগানের কথা।

(৩) পশু-পক্ষী পালন।

৪) মাটি, জল, বালির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা।

(৫) ঋতু পরিবর্ত্তন।

(৬) পাখীর পালক, নানারকম পাতা, ফুল, ঝিনুক সংগ্রহ।

(৭) বনভোজন।

গ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা।

(১) মলমূত্র ত্যাগ।

(২) স্নান।

(৩) পোষাক-পরিচ্ছদ।

(৪) জলপান।

(৫) ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

(৬) সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

ঘ শিক্ষায়তনের দৈনিক কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

(১) কে কে এসেছে।

(২) কে কে আসেনি।

(৩) কে ফুল সাজাবে।

(৪) কে আসন পাতবে।

(৫) কে ঘরে ঝাঁটা দেবে।

(৬) কে খাতা পেন্সিল দেবে।

(৭) কে সরঞ্জামগুলি উঠাবে। ইত্যাদি।

ঙ উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা।

বিদ্যালয়ের সকল উৎসব, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে তবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চ অন্যান্য কাজ বা খেলা সম্বন্ধে আলোচনা।

(১) চিত্রাঙ্কন।
(২) কাগজ কেটে চিত্র প্রস্তুত করা বা অন্যান্য কাজ।
(৩) আলু, ঢেঁড়স, কাপড়ের বা রবারের ছাপ।
৪) মাটির খেলনা তৈয়ারী।
(৫) কাঠের খেলনা তৈয়ারী।
(৬) কাগজের ফুল, গহনা ইত্যাদি তৈয়ারী।
(৭) সেলাই করা, বোনা ইত্যাদি।

ছ গল্প ও রূপকথা, আবৃত্তি, অভিনয়, পুতুলনাচ ইত্যাদির দ্বারা কথোপকথন।

জ অন্যান্য নানাবিষয়ক—ডাকপিয়ন, পুলিশ, গোয়ালা, ধোপা, মুদি, গাড়ীর কনডাক্টর, চালক, দোকান, ডাকটিকিট ও ট্রাম টিকিটের সংগ্রহ ও ব্যবহার।

দুই বৎসর হতে অনবরত এতগুলি বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলতে সুযোগ পেলে এবং শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে শিশুর কথার জড়তা কেটে যাবে, আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রমে তারা সুন্দরভাবে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে শিখবে। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে যে কথা তারা বলতে সুরু করেছিল একদিন, তা শিশুর স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে, খেলাধূলা, আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে যোগ রেখেই অগ্রসর হবে। তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কৌতূহল তৃপ্ত হবে, জৈব প্রয়োজন ভিন্ন ভাষার যে অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে তা শিশু ক্রমশঃ বুঝতে পারবে এবং তার মধ্যে রসের আস্বাদন পাবে। সে তখন কেবল সেই রসের সচ্ছলতায় খুশি হবে না, সে চাইবে রসের উচ্ছলতা—এবং কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয় ও লিখিত রচনার দ্বারা এই সাহিত্যরসের গোড়া পত্তন করা হবে।

প্রাক্-পঠন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে পড়াশুনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত

করার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এখন ধরে নেওয়া যাক যে শিশু বই পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এইবার শিক্ষিকা কিভাবে অগ্রসর হবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। বই পড়বার ক্ষমতা অর্জ্জন করা সহজ নয়। সমস্ত প্রণালীটি অত্যন্ত জটিল। বয়স্ক ব্যক্তি যখন একটি সাধারণ বই পড়ে, তখন প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতে তাকে ৩ হতে ৫ বার থামতে হয়। কোন অপরিচিত ও অজানা বিষয় যথা—বিদেশীভাষা, ডাক্তারী বই ইত্যাদি পড়ে বুঝতে হলে তাকে প্রতি পংক্তিতে অনেকবার থামতে হয়। এমনও দেখা যায় যে সেই পঠিত পংক্তিটি দ্বিতীয়বার পাঠ করে' তবেই পাঠক সমস্ত অর্থটি বুঝতে পারে। শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন ঠিক এইভাবে প্রতি পংক্তিতে সে অনেকবার থামে এবং বেশ অনেকক্ষণের জন্য থামে। বার বার সে একই পংক্তি পড়ে পাঠ্য বিষয়টির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন যে ঠিক পড়বার সময়ে অর্থাৎ দৃষ্টি যখন একটি শব্দ হতে অন্য শব্দে এগিয়ে যায়, তখন শিশু প্রত্যেক শব্দের অর্থগ্রহণ করতে পারে না—দৃষ্টিবিরতির সময়েই সে প্রতি শব্দ বা বাক্যের অর্থগ্রহণে সমর্থ হয়। যখন শিশু পড়বার ক্ষমতা বেশ আয়ত্ত করেছে, তখন দেখা যায় যে সে ২০ সেকেণ্ডে ৩ হতে ৪টি শব্দ এক দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারে এবং তার পরেই আসে বিরতি। কাজেই শিশু প্রত্যেক শব্দের অক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করে পড়তে সুরু করে এই যে ধারণা অনেকের মনে আছে তা ঠিক নয়। পড়বার সময়ে শিশু একটি শব্দের বা বাক্যের সম্পূর্ণ ছাঁদটি (pattern) মনোমধ্যে গ্রহণ করে এবং যখন প্রত্যেক বার থামে তখনই সেই সম্পূর্ণ ছাঁদটির মধ্যে যে শব্দগুলি আছে তার অর্থগ্রহণ করতে চেষ্টা করে। শিশুকে প্রথম পাঠ দেওয়ার সময়ে এই তথ্যটি মনে রাখলে শিশুকে পড়তে শেখানো বেশ সহজ হবে বলেই বোধ হয়।

এখন দেখা যাক ধারাবাহিকভাবে কোন্ প্রণালীতে শিশুকে শিক্ষা দিলে তার ভাষাশিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে আমরা পাঁচ বৎসরের শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হয়ে চুপ করে বসতে বলেছি, তারপরে তাদের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিমূর্ত্ত (abstract) বর্ণগুলি মুখস্থ করিয়েছি। এই বিমূর্ত্ত বর্ণগুলি মানবের পরিণত মনের বিশ্লেষণের ফলে নিজেদের সুবিধামত ক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথমে স্বরবর্ণ, তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপরে আকার, ইকার

ইত্যাদি শিক্ষিকা নিজের সুবিধানুযায়ী শিশুর সম্মুখে পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু শিশু যখন কথা বলে তখন সে এইরূপ ক্রমিকভাবে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সাজিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না—কাজেই শিশুকে তার কাছে অর্থহীন বর্ণ শিক্ষা দিলে তার নিজস্ব প্রয়োজন বোধ মেটে না, কৌতূহলও পরিতৃপ্ত হয় না। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের নিবিড় মিলন হওয়ারও সম্ভাবনা ক্রমশঃ হয়ে যায় সুদূরপরাহত।

শিশুর বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আমরা তাকে কতকগুলি অকার, আকার, ইকারান্ত ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পরিচিত করে দিই, পরিশেষে শেখাই বাক্য। এই শব্দ ও বাক্যগুলির অর্থবোধ হলেও শিশুর জীবনে সেগুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং "অচল, অটল, ঐক্য, বাক্য" এ সকলের মধ্যে সে কোন রসের সন্ধান পায় না। এই অতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়াতে তার মনে দারুণ বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে দেখে আজকাল দেখা যায় যে বইএর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একটি করে ছড়া বা ছবি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এতেও যে ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যানুরক্তির গোড়াপত্তন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে তা বলা চলে না—কারণ বহু শিশুপুস্তক, অতি মনোযোগের সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করে দেখেছি যে বর্ণশিক্ষাই এসকল পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। এর ফল যেমন হওয়া উচিত তেমনই হয়ে থাকে। শিশু বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা নিয়ে শিক্ষিকার কাছে নিজের আসনটি পাতে কিন্তু ক্রমশঃ তার জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায় ও পরিশেষে পঙ্গু মন নিয়ে কোনরকমে বিদ্যাশিক্ষার দিনগুলি অতিবাহিত করে। এমনিভাবেই শিশুর লেখাপড়া অগ্রসর হতে থাকে তার স্বভাবের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধ পথে। শিশু যে তার নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে একথা আমরা একরূপ ভুলেই যাই এবং তাকে প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার, তিরস্কার এবং দণ্ডের দ্বারা কয়েকটি বই পড়িয়ে দিই মাত্র। "বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে।"(৪৭)

শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুর নিজস্ব জিনিষগুলিতে তার নিজের নাম লেখা থাকে। শিশু খুব তাড়াতাড়ি নিজের নামটি চিনতে ও পড়তে পারে। ক্রমে

---

(৪৭) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা—শিক্ষার হেরফের ; ১৯ পৃষ্ঠা

তার নামের পাশে আর যে একটি শিশুর নাম লেখা আছে সেটিও চিনতে ও পড়তে পারে। এরপরে দরজা, জানালা, চেয়ার, আসন, কাগজ, খড়ি, বই, খাতা ইত্যাদি বেশ ভাল করে চিনতে ও পড়তে শেখে। এগুলি খেলার সাহায্যেই শেখানো হয়ে থাকে। কার্ডবোর্ডের ওপরে বড় বড় হরফে "দরজা" লিখে দরজার হাতলে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলে শিক্ষিকা বল্লেন "চল দরজা খুলি"। দরজার কাছে গিয়ে শিশু লেখাটি দেখে বুঝলো যে কার্ডে দরজার নাম লেখা আছে। পঠনের প্রথম স্তরে শিশু প্রত্যেক জিনিষের নাম শিখে মহা আনন্দ উপভোগ করে। এইভাবে প্রকৃতি পাঠের দ্বারা বা কোন বিশেষ আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিশুর পাঠ প্রস্তুত করা যেতে পারে। সৃজনাত্মক কাজ যেমন শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইরকম শিশুশিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হলো পরিবেশ পরিচিতি। প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ফলে শিশু গাছ গাছড়া, পাখী, পাখীর ডিম, নানারকম ফুল, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ দেখবে, জানবে, চিনবে এবং সংগ্রহ করবে। শিশুচিত্তে অধিকার বোধ অত্যন্ত তীব্র, কাজেই সংগ্রহ প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করলে সংগৃহীত জিনিষগুলির দ্বারাই তাদের লেখাপড়া আরম্ভ হতে পারে। শিক্ষিকার সাহায্যে জিনিষগুলি ভাগ করে, কাগজের টুকরায় (label) নাম লিখে, তারিখ, বার এবং নিজের নাম লিখে সেদিনকার পরিবেশ পরিচিতির ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হবে। পাখীর ডিম, বাসা, নুড়িপাথর ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের আলমারীতে সংগৃহীত হবে। গাছের পাতা ব্লটিং কাগজের মধ্যে চেপে রেখে দিয়ে পাতার জলটা শুষে গেলে, সেই পাতাগুলি সংগ্রহ-পুস্তকে সুবিন্যস্তরূপে সাজাতে হবে। পরে ছুটি সরু কাগজে আঠা লাগিয়ে পাতার বোঁটা ও মুখটি চেপে দিলে পাতাগুলি পুস্তকের পাতার গায়ে লেগে থাকবে।

পরিবেশ পরিচিতির সময়ে পথে চলতে চলতে শিশুরা সেদিনের আবহাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করবে। সকাল বেলায় কেমন রোদ উঠেছে ইত্যাদিও বেশ সম্যক-রূপে আলোচনা করা যেতে পারে। তারপরে শ্রেণীকক্ষে সেদিনকার পর্য্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হবে।

এই পঞ্জিকাটি নিয়মিতভাবে সারা বৎসরই রাখা যেতে পারে এবং শিশু ও শিক্ষিকার সম্মিলিত উৎসাহে প্রতিদিনের বৈচিত্র্যময় সংবাদ লিপিবদ্ধ করে একটি চমৎকার শ্রেণীপুস্তক প্রস্তুত করা যেতে পারে। এইভাবে সুরু হয় শিশুর

পুস্তকহীন শিক্ষা। এই সঙ্গে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে কেবল কতকগুলি সংবাদ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হলে চলবে না ; এতে শিশুর মানসিক, আনুভূতিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যে একটি সমগ্রতা রচনা না করে কেবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হবে। শিশুর অভিজ্ঞতা, জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ও বুদ্ধিকে সমগ্রভাবে দেখলে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

শিশুরা শ্রেণীকক্ষে সমবেত হলে পর প্রত্যেকদিন দিনের নাম, তারিখ আলোচনা করে তাদের সাহায্যে দিনপঞ্জিকার পৃষ্ঠাগুলি বদলাতে হবে। এই সঙ্গে মাসের নামের পুনরালোচনা করাও ভাল। তারপরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা সেদিনের আবহাওয়া বর্ণনা করা হবে। শিশুদের নিজস্ব ভাষা প্রয়োজনানুসারে কিছু অদল বদল করে শিক্ষিকা কার্ডে লিখে দিনপঞ্জিকায় টাঙ্গিয়ে দেবেন। প্রয়োজন না হলে শিশুরা যা বলেছে তাই সম্পূর্ণভাবে লিখে দেওয়াই ভাল কিন্তু কখনও আমূল পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়। শিশু সত্য সত্যই সেই মাসের নাম ও বারের নাম এবং জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিখতে পেরেছে কিনা তা প্রতি সপ্তাহের শেষে নানা রকম খেলার সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা শিশুদের প্রগতি পরীক্ষা করে থাকি :—

(১) মাসের নাম, বারের নামগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরায় লিখে একটি বাক্সে করে শিশুদের সামনে ধরা হলো। প্রত্যেক শিশু পালা করে একটি কাগজ তুলে দেখবে তাতে যা লেখা আছে তা সে চিনতে ও পড়তে পেরেছে কিনা।

(২) প্রত্যেক শিশুর সামনে ছোট ছোট বাকসে বারের নামগুলি কাগজে লিখে একসঙ্গে জমা করে দেওয়া হবে। শিশু সেই কাগজগুলির মধ্য হতে সেইদিনের নামটি খুঁজে বার করবে।

(৩) "আজ বৃষ্টি পড়েছে," "আজ রোদ উঠেছে," "বাবলু ছাতা এনেছে," "কদম ফুল ফুটেছে," "ইলিশ মাছ খেয়েছি" ইত্যাদি বাক্যগুলি কাগজে লিখে শিশুদের সামনে ধরে বলা হবে—"যা কাগজে লেখা আছে, পড়ে সেই বিষয়ে ছবি আঁক।"

(৪) যখন শিশুরা যথার্থরূপে এই জাতীয় খেলার সঙ্গে পরিচিত হবে, তখন দুটি বাক্যের মধ্যে যে দুটি শব্দ একরূপ, সেইগুলি তাদের খুঁজে বার করতে বলাও বেশ মজার ও শিক্ষাপ্রদ খেলা :—আজ বৃষ্টি পড়ছে, আজ রোদ

শ্রাবণ মাস
বুধবার
১৯ তারিখ
বাবলু ছাতা এনেছে
আজ বৃষ্টি পড়ছে
শ্রাবণ মাসে প্রায় বৃষ্টি পড়ে
শিশুর নাম

শ্রাবণ মাস
বুধবার
১৭ তারিখ
বাবলু ছাতা এনেছে
আজ বৃষ্টি পড়ছে
শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি পড়ে
শিশুর নাম
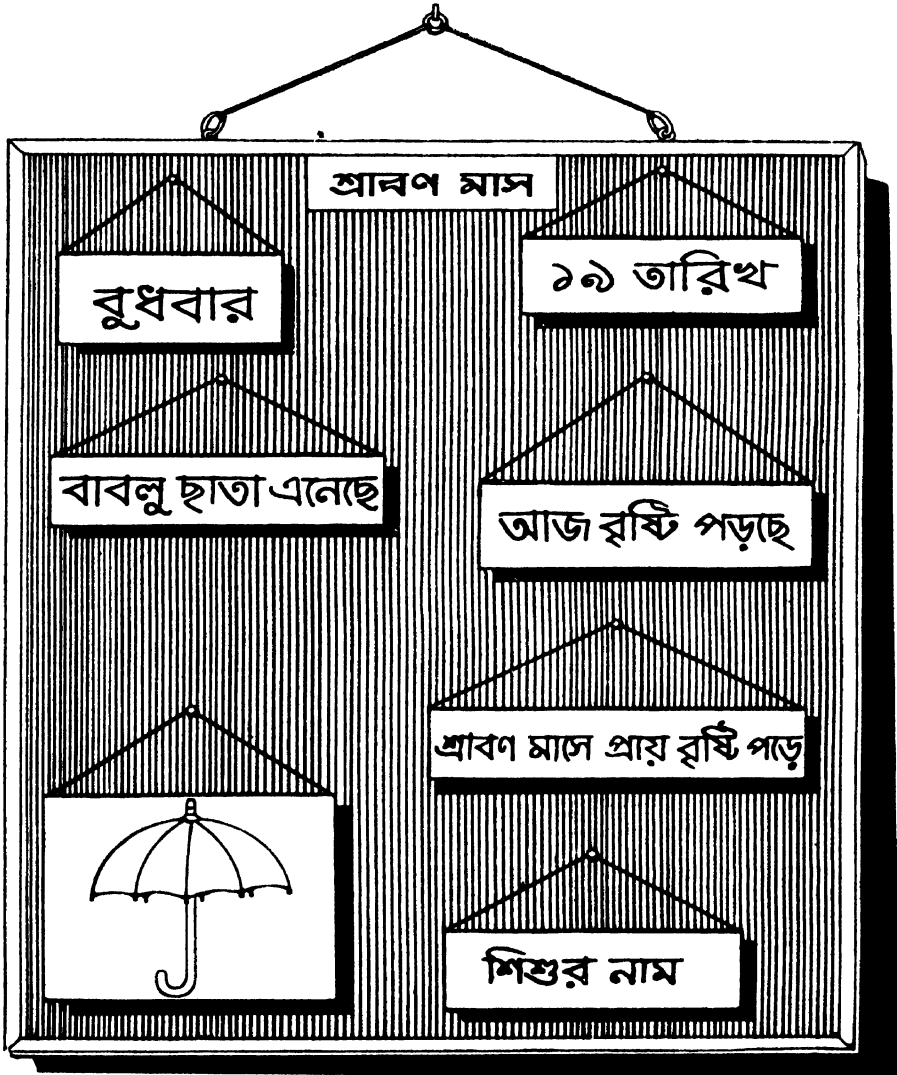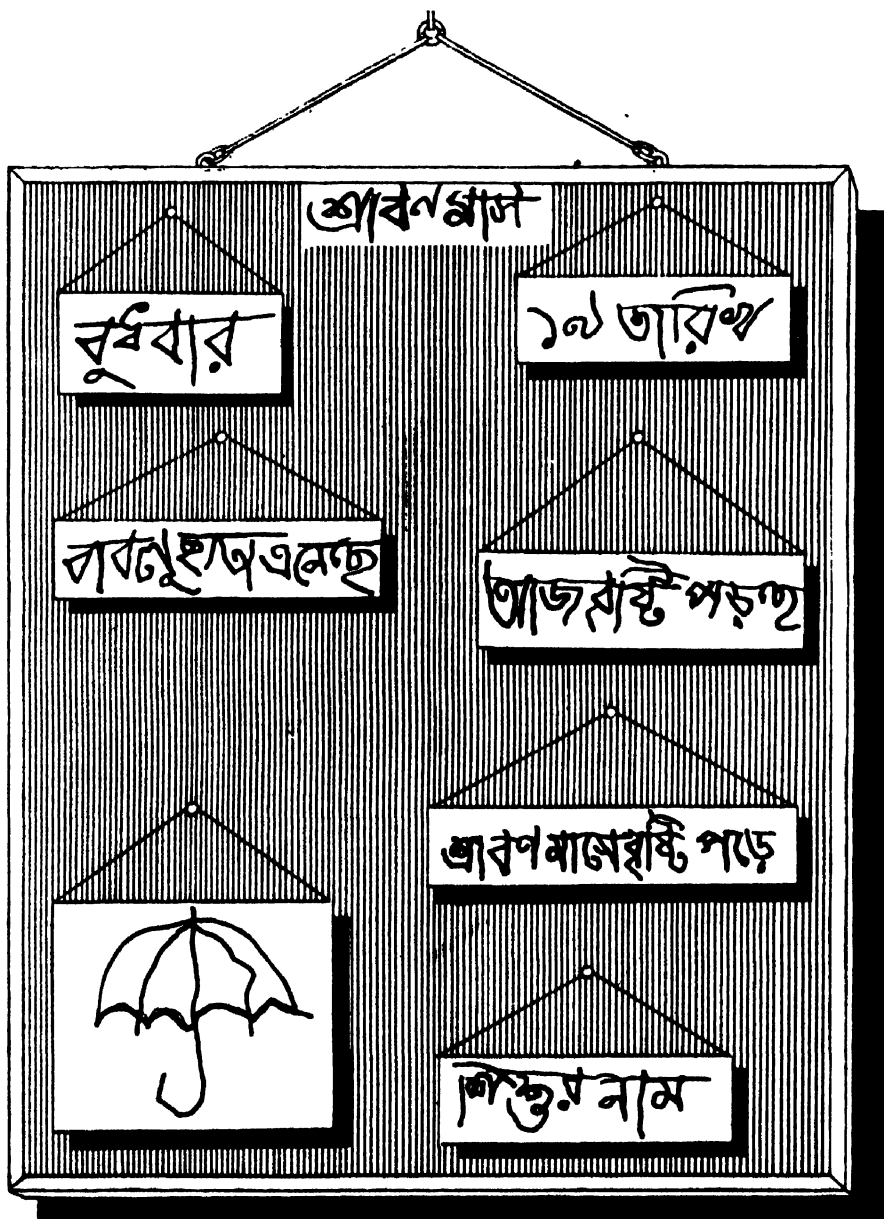
উঠেছে—এই দুটি বাক্যের মধ্যেই "আজ" শব্দটি রয়েছে। শিশুরা এই খেলাতে বেশ অনেকক্ষণ মেতে থাকে।

(৫) বৎসরের শেষে শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে এক একটি খাতা রাখতে স্থুরু করবে। এই খাতাতে তারা প্রত্যেক দিন নিজ নিজ বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি আঁকবে যথা :—বেলা কদম ফুল এঁকে রং দিয়েছে, উজ্জ্বলা এঁকেছে ইলিশ মাছ আর বিতান এঁকেছে ভরা নদীতে নৌকা ভেসে চলেছে। তারপর শিক্ষিকা প্রত্যেকের খাতায় উপযুক্ত শব্দসমষ্টির দ্বারা বাক্য রচনা করে দেবেন এবং শিশু সেই লেখা দেখে মোটা কালো পেন্সিল দিয়ে খাতায় নকল করবে।

সংখ্যা জ্ঞানের জন্য এই সঙ্গে শিশুকে একটি সাদা কাগজে মাস পঞ্জিকার মত ঘর কেটে দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে শিশু প্রত্যহ তারিখ ও বারের নাম লিখবে। পঞ্জিকাটির মাথায় মাসের নাম লিখবে এবং পরে গুণে দেখবে সেই মাসে কয়টি রবিবার আছে, এক সপ্তাহে কয়দিন, দুই সপ্তাহে কয়দিন, মাসের কয় দিন হয়ে গেল ইত্যাদি। শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট খাতা তৈয়ারী করে এইসঙ্গে লিখতে আরম্ভ করতে পারে। এইভাবে শিশুদের আনন্দ, আগ্রহ ও কৌতুহলের সঙ্গে যোগ রেখে, ছোট ছোট অর্থপূর্ণ বাক্য ও শব্দের মধ্য দিয়ে তাদের পড়তে ও লিখতে শেখার সূত্রপাত হবে। এই সময়ে শিক্ষিকা বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার কয়েকটি মুলনীতি অনুসরণ করবেন :—

(১) বাক্যগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল হবে।

(২) এক একটি পৃষ্ঠায় একটি বা দুটির বেশী বাক্য থাকবে না, সঙ্গে উপযুক্ত চিত্র থাকবে।

(৩) বাক্যের মধ্যে নূতন শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে।

(৪) শিশুর স্বাভাবিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের বাইরে কোনও শব্দ ব্যবহার করা হবে না।

(৫) নূতন শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি হবে।

(৬) পুরাতন শব্দের যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি হবে।

(৭) চিত্রগুলি বর্ণিত বাস্তব ঘটনাকেই চিত্রিত করবে, যাতে চিত্রের সাহায্যে লেখাগুলি আরও সহজে পড়া যেতে পারে।

(৮) পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিত্য নূতন ঘটনার দ্বারা শিশুর পাঠ্য বিষয় অগ্রসর

হতে থাকবে যেন প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিশুর আগ্রহ অব্যাহত থাকে।

(৯) সর্ব্বসমেত বিষয় বস্তুটি এত বড় হবে না যাতে শিশুর মনে ক্লান্তি আসতে পারে।

আরও দু' একটি উদাহরণ দিলে শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তা বিশদরূপে বোঝা সহজ হবে। একদিন শিশুদের নিজস্ব সংবাদ বলার সময়ে হেনা বেশ দুঃখের সঙ্গে জানালো ; "আমি আর স্কুলে আসবো না।"

সকলে—"কেন ?"

হেনা—"আমরা এই বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব।"

সকলে—"অনেক দূরে গেলে গাড়ী করে আসবে।"

হেনা—"আমাকে কেউ পৌছে দিয়ে যেতে পারবে না।"

এই আলাপ আলোচনার পরে শিশুরা স্থির করলো যে হেনার জন্য তারা একটি বাড়ী তৈয়ারী করবে এবং সেই দিনই কতকগুলি ইঁট সংগ্রহ করে বাড়ী তৈয়ারী সুরু হয়ে গেল। পরের দিন হেনা এসে বললো "আমরা এখন এ বাড়ী ছেড়ে যাব না।" কিন্তু তাতেও শিশুরা দমলো না। বাড়ী তৈয়ারীর কাজে তারা বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে চঞ্চল বললো যে, "আমরা আমাদের পুতুলের জন্যে বাড়ী তৈরী করবো।" বাড়ী তৈয়ারী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে পড়া ও লেখাও অগ্রসর হতে লাগলো।

ক সেইদিনই সুভাষের খাতায় একটি বাড়ীর ছবি আঁকা রয়েছে দেখা গেল। সুভাষের এই বাড়ীটি অবলম্বন করে সুভাষ ও তার দলের আর পাঁচটি শিশুকে পাঠ দেওয়া হলো—

বাড়ী।
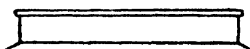
রুণুর বাড়ী।

বাড়ীতে দরজা আছে।

বাড়ীতে জানালা আছে।

বাড়ীতে ছাদ আছে।

বাড়ীতে সিঁড়ি আছে।

রুণু।

রুণুর মাথা আছে।

রুণুর চোখ আছে।

রুণুর কাণ আছে।

রুণুর মুখ আছে।

রুণুর নাক আছে।

রুণুর চুল আছে।

রুণুর হাত আছে।

রুণুর পা আছে।

রুণুর চুল কালো।

রুণুর জামা লাল।

জামায় বোতাম আছে।

এই ভাবে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মা, বাবা, দাদা, দিদি, খোকা, খুকু, ঠাকুমা, দিদিমা, পিওন, গোয়ালা, মেথর, ভৃত্য, পরিজন, বাড়ীর আসবাবপত্র, বাসনপত্র আলোচনা করে শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়, অঙ্কশিক্ষা দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃজনাত্মক কাজের দ্বারা উৎসাহ ও আগ্রহ অব্যাহত রাখা যায়। তবে এই সকলের মধ্যেও শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও নিজস্ব খবরাখবরগুলি মেনে তার উপযোগী করে পাঠ প্রস্তুত করতে হবে। যথা ঃ—বাবার কার্য্যাবলীর আলোচনা কালে জানা গেল যে সুভাষের বাবা দোকানে যান, জয়ন্তীর বাবা কোর্টে যান, সিন্টুর বাবা অফিসে যান এবং আশীষের বাবা ডাক্তার। কাজেই প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান অনুসারে পিতার কাজ সম্বন্ধে সংবাদ দিল এবং তাদের খাতাতেও ঠিক এই ভাবে সংবাদগুলি লিপিবদ্ধ করা হলো। প্রত্যেকের খাতায় রুণুর বাবার পৃথক পৃথক কাজের তালিকা থাকলে কোনও ক্ষতি নেই কেননা প্রত্যেক শিশুই রুণুর সঙ্গে নিজে একাত্ম হয়ে এই খবরগুলি বলতে ও লিখতে আনন্দ পায়।

খ শীতকাল

(১) শিশুরা বাগানে ফুল ও তরকারি লাগিয়েছিল।

(২) বাজারে গিয়ে শীতকালের তরকারি ও ফল দেখে, হিসাব করে কিছু ফল কিনেছিল।

(৩) শীতকালের আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করেছিল।

(৪) শীতকালের ফুল, ফল, তরকারি মাটি দিয়ে গড়েছিল ও রং দিয়েছিল।

(৫) ছবি এঁকে শীতকালের রূপ নানাভাবে বর্ণনা করেছিল।

(৬) রঙ্গীন কাগজে ফুল, ফল, পাখী কেটে শ্রেণী পুস্তক তৈরী করেছিল।

(৭) শীতকালের পরিবেশের মাধ্যমে তাদের লেখাপড়া ও সংখ্যাজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।

(৮) যারা সামান্য লিখতে পারতো তারা শীতকাল সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নের উৎসাহে এক একটি সম্পূর্ণ খাতা লিখেছিল।

(৯) শীতকালের গান ও ছড়ার মধ্য দিয়ে হয়েছিল সঙ্গীত শিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং প্রচুর আনন্দলাভ।

শিশু শিক্ষায়তনে ৫।৬ বৎসর যাদের বয়স তারা পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্যে পুরাতন পদ্ধতি অপেক্ষা এই ধরণের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সহজে ও সাগ্রহে লেখাপড়া শেখে। শিক্ষক ও শিশুদের সহযোগিতায় পাতার পর পাতা পুস্তক তৈরী হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের লেখাপড়া অগ্রসর হতে থাকে। নানাবিষয়ে এইরূপ শ্রেণীপুস্তক তৈয়ারী করা যেতে পারে।·· যথা ঃ—

(১) বিদ্যালয়ের যে কোন উৎসব অনুষ্ঠান—মায়েদের আসর, নববর্ষ, সরস্বতীপূজা।

(২) শিশুদের খেলার কোনও পরিকল্পনা। যথা—পুতুলের বিয়ে, খেলনার দোকান বা বনভোজন।

(৩) বিদ্যালয়ের উদ্যানরচনা বা যে কোন সৃজনাত্মক কাজ।

(৪) শিশুদের প্রিয় কোন গল্প বা নাটক।

(৫) শিশুদের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মধ্য হতে যে কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় যথা ঃ—চড়কের মেলা, রথের মেলা, ঋতু পরিবর্ত্তন, গুটিপোকার জীবনী, ব্যাঙাচির জীবনী ইত্যাদি।

এখন আমাদের দেখতে হবে কি প্রণালী অবলম্বন করলে শিশু পঠন, লিখন ও ভাষায় আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারবে। পঠন প্রণালী বলতে আমরা এতদিন কেবল বর্ণক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির কথাই জানতাম। এতে দেখা যায় যে এখানে ভাষাকে প্রথম থেকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; কিন্তু শিশুর মন

বিশ্লেষণধর্ম্মী নয়। এইজন্য কতকগুলি নীরস বর্ণ মুখস্থ করতে গিয়ে শিশুর সময়ের অনর্থক অপব্যবহার হয়। কোন কোনও ক্ষেত্রে ঠিক বর্ণক্রমিক না হলেও বর্ণ হতে শব্দ এবং শব্দ হতে বাক্য, এরূপ শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীও শিক্ষিকা অনুসরণ করে থাকেন। এতে যে নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা এইরূপ :— বাংলা ভাষায় এমন অনেকগুলি অক্ষর আছে যাদের আকৃতি প্রায় এক রকমের। যথা :—

ব র ক ধ ঝ

ত অ আ ভ

হ ই ঈ থ

ড ড় উ ঙ ইত্যাদি,

অনেকের বিশ্বাস যে শিশুকে যদি কোন প্রকারে "ব" অক্ষরটি শেখানো যায় তাহলে র, ধ, ঝ ইত্যাদি অক্ষরগুলি খুব দ্রুতগতিতে শেখানো যাবে। পরে এক এক আকৃতির বর্ণ শিক্ষার শেষে শব্দ ও বাক্য তৈরী করে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হবে।

যথা :—**ধর, কর, বক, বর, বধ**

পরে, **বক ধর।**

বধ কর। ইত্যাদি

শিশুমনস্তত্ত্বের সহজ নীতিতে এইরূপ শিক্ষা কোনমতেই শিশুশিক্ষায় গ্রাহ্য হতে পারে না। তাছাড়া পাঠের বাক্য বয়স্কগণের দৃষ্টিতে সহজ হলেও শিশুর দৃষ্টিতে মোটেই সহজ নয়। অক্ষরগুলির আকৃতিগত পার্থক্য এতই সামান্য যে শিশু সে সম্বন্ধে প্রথম প্রথম সতর্ক হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যায় যে মাঝে মাঝে শিশু শব্দটি উল্টো করে পড়ে। এই পদ্ধতির দ্বারা লিখনশিক্ষা কিছুটা সহজ বটে কিন্তু পঠনশিক্ষা সহজ হয় না।

এর পরে আসে শব্দক্রমিক প্রণালী। এই প্রণালীতে শব্দকেই (whole) পূর্ণ বিষয় ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষিকা কতকগুলি সাধারণ শব্দ নির্ব্বাচন করে ছবিসমেত বড় বড় অক্ষরে কার্ডে লিখে আনবেন। বিড়াল, কুকুর, কদমফুল, আম, শশা, কলা, মাছ, মোটর গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি। আর এক প্রস্থ কার্ড প্রস্তুত করা হবে যাতে কেবল শব্দগুলি লেখা থাকবে কিন্তু কোন ছবি থাকবে না। আর এক প্রস্থ কার্ডে ছবি থাকবে কিন্তু শব্দগুলি থাকবে না।
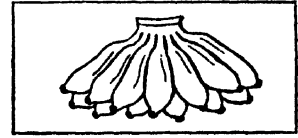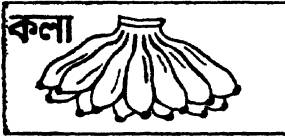
প্রথমে ছবির সঙ্গে শব্দগুলি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে যাতে শিশু ছবিটি দেখে বস্তুটি চিনতে পারে। ধরা যাক শিক্ষিকা শিশুকে কলার ছবি সমেত কার্ডটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, "এতে কি লেখা আছে ?" এতক্ষণে শিশু ছবির সাহায্যে বুঝে নিয়েছে যে কার্ডে লেখা আছে "কলা"।

দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষিকা শিশুদের বড় কার্ডের সঙ্গে ছোট কার্ড মিলিয়ে সাজাতে বলবেন। এইভাবে ক্রমশঃ নানা পরিচিত বস্তু ও শব্দের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটবে। বেশ কয়েকটি শব্দ শেখা হলে পর শিক্ষিকা এই স্তর হতে অন্য স্তরে অগ্রসর হতে পারবেন—অর্থাৎ শব্দকে ভেঙ্গে অক্ষর শিক্ষা দিতে পারেন এবং শব্দ হতে বাক্য রচনা করেও শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন। তবে শব্দক্রমিক ভাষাশিক্ষা প্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি যে সেখানে সর্ব্বদা অর্থের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

শব্দক্রমিক ভাষাশিক্ষা প্রণালী ভিন্ন আরও এক প্রকার প্রণালী আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত। সেটিকে বলা হয় বাক্যক্রমিক পদ্ধতি (sentence method)। আধুনিক শিশুশিক্ষায় এই পদ্ধতিটিকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত বলা হয়েছে, কারণ আমাদের প্রত্যেক চিন্তা বাক্যে পর্য্যবসিত। কাজেই শিশুকে যদি তার পরিচিত বাক্যের দ্বারা ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তার পক্ষে সেটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ হওয়া উচিত। কিন্তু

শিক্ষিকা যখন বাক্যক্রমিকভাবে শিক্ষা দেবেন, তাঁকে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের সংযোগ না থাকলে ভাষাশিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। সেইজন্য গল্প, ছড়া, গান, প্রকৃতিপাঠ, সৃজনাত্মক কাজ, পরিবেশ পরিচিতি, এইভাবে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করলে বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের সংযোগ রাখা সহজ হয়ে উঠবে। প্রথম পাঠে যে দুই তিনটি বাক্য থাকবে—তার মধ্যে অর্থের সংযোগ থাকবে, পরে দ্বিতীয় পাঠে অগ্রসর হওয়ার সময়ে সেই চিন্তাধারাতেই অগ্রসর হলে চিন্তাধারার পারম্পর্য্যের জন্য প্রথম পাঠের বাক্যগুলি কিংবা বাক্যের কয়েকটি শব্দ দ্বিতীয় পাঠে পুনরাবৃত্তি করা হবে। এই স্বচ্ছন্দগতি ও ভাষার অর্থবোধ বাক্যক্রমিক পদ্ধতির বিশেষত্ব। যাতে শিশু সম্পূর্ণ বাক্যটি পড়ে যেতে পারে—এইরূপে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। বিচ্ছিন্ন বাক্য তাদের সামনে উপস্থিত করলে পাঠের সাবলীল গতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুরা পরিচিত শব্দগুলি আর বানান করে পড়ে না—শব্দের সমগ্র রূপটি দেখেই তারা শব্দ চিনে ফেলে। অবশ্য নূতন শব্দের ক্ষেত্রে শিশু কিছুটা বিশ্লেষণ করে পড়ে, তবুও শব্দাংশগুলি যথা ঃ, া, ু, ৃ আর তাদের বিশ্লেষণ করে পড়তে হয় না—এইজন্য পঠনক্রিয়া বেশ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে কেবল বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেই যে ভাষাশিক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে একথা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। নীরস, কঠিন, অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করলে এই পদ্ধতিও শিশুর কাছে একান্তই বিড়ম্বনায় পরিণত হতে পারে। শিশুর আবেষ্টনী হতে তার পরিচিত ও প্রিয় বিষয়ের মধ্য দিয়ে সহজ দুটি তিনটি শব্দগঠিত বাক্য রচনা করে প্রথম পাঠ প্রস্তুত করা উচিত। ক্রমে বহুল পুনরাবৃত্তি সহযোগে কঠিনতর ও জটিলতর শব্দ ও বাক্য উপস্থিত করে নিজেদের পুস্তক প্রস্তুত করে শিশুরা পড়বে। এর পরে তাদের হাতে সহজ ও ছোট ছোট উপযুক্ত বই দিলে তারা নিজেদের অবসর মত সেগুলি পড়ে নিজেদের পাঠের আগ্রহ অব্যাহত রাখবে। এইভাবে শিশুদের পক্ষে পাঠে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে না বলেই আমাদের অভিজ্ঞতা।

পাঠাভ্যাসের ও পৌনঃপুনিক চর্চ্চার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল ঃ—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	এইখানে পৃথক পৃথক ভাবে লেখা অক্ষরের টুকরাগুলি রাখবার জন্য দুটি থাম বা বাক্সের ব্যবস্থা করা যায়।
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল	ব	শ	
ষ	স	হ	ড়	ঢ়	
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ	

একটি বড় কার্ডবোর্ডে ছক কেটে প্রয়োজন মত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লিখতে হবে। তারপরে অনেকগুলি ছোট ছোট টুকরো কার্ডে এই অক্ষরগুলি লিখে দুটি থামে ভরে দুজন শিশুর হাতে দিতে হবে। যে এখানে আগে অক্ষর চিনে ছকগুলি ভরে ফেলতে পারবে সেই জিতবে। এই খেলায় দুজন প্রায় সমপারদর্শী শিশু নির্ব্বাচন করা উচিত।

২। —পান্তাবুড়ীর ভাত খেয়ে নিত।

পান্তাবুড়ীর—কাছে নালিশ করতে গেল।

—সেপাইকে—ধরতে বললেন। ইত্যাদি।

এখানে শিশু নিজের পরিচিত শব্দের দ্বারা শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করবে।

৩। তোমার নাম কি ?

তোমার বয়স কত ?

আজ কি বার ?

তোমার পাশে কে বসেছে ? ইত্যাদি

শিশু এই বাক্যগুলি পড়ে মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে ; আগ্রহ প্রকাশ করলে লিখতেও পারে।

৪। আজ অনিল গাছে জল দেবে।
আজ বিতান মাদুর পাতবে।
আজ শিবানী খেলনা তুলবে। ইত্যাদি

নির্দেশ অনুসারে শিশুরা কাজ করবে।

৫। প্রত্যেক ছেলের হাতে এক খণ্ড করে কাগজ দেওয়া হবে। প্রত্যেক খণ্ডে এইরূপ লেখা থাকবে—

(ক) পুতুলকে কোলে নাও। দোলা দাও। পুতুল রেখে দাও।
(খ) পুতুলকে কোলে নাও। দোলা দাও। গান কর।
(গ) পুতুল কাঁদছে। খেতে দাও।
(ঘ) পুতুল ঘুমিয়েছে। খাটে শুইয়ে দাও।
(ঙ) পুতুল জেগেছে। বেড়াতে নিয়ে যাও।
(চ) বাগানে ফুল ফুটেছে। ফুল তুলে আন।
(ছ) পুতুলের বাড়ী ফুল দিয়ে সাজাও।

প্রত্যেক শিশু নিজের অংশটি পড়ে পালাক্রমে নিজের কাজটি করবে এবং অন্য শিশুরা অনুমান করে বলবে শিশুটি কি করছে। এতে অভিনেতা নিজের অংশটি পড়তে শিখবে এবং দর্শক অভিনীত অংশটি ভাষায় প্রকাশ করতে শিখবে।

৬। আমি দেখতে গোল	আমার দাঁত আছে।
আমি লাফাতে পারি	আমি কাঠ কাটতে পারি।
আমি দৌড়াতে পারি	
কিন্তু—আমার পা নেই	কিন্তু—আমি কামড়াতে পারি না।
আমি কি ?	আমি কি ? ইত্যাদি

ধাঁধার খেলায় সকলের আগ্রহ চিরদিনই অব্যাহত, কাজেই সহজ ধাঁধা শিশুশিক্ষায় ব্যবহার করা উপযুক্ত বলে মনে হয়।

৭। আজ সোমবার। ভুল — ঠিক।
ঘাসের রঙ নীল। ভুল — ঠিক।
আকাশের রঙ সবুজ। ভুল — ঠিক।

এই সহরের নাম রাণাঘাট। ভুল — ঠিক।
মাছ জলে সাঁতার দেয়। ভুল — ঠিক।
ঠিক ও ভুল হিসাবে শিশুরা দাগ দেবে।

৮। একটি বড় গাছ আছে।
গাছে একটি পাখীর বাসা আছে।
বাসাতে তিনটি ডিম আছে।
গাছের ডালে পাখী বসে আছে।
ছবি আঁক।

পৌনঃপুনিক চর্চ্চা (Drill) সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে কোন জ্ঞান, ভাব, কাজ বা দক্ষতাকে স্বতঃ ও স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে তার বারম্বার চর্চ্চার প্রয়োজন। কিন্তু পুনরাবৃত্তি কালে শিক্ষিকাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে বিষয়ে শিশু পুনরালোচনা করছে সে সম্বন্ধে তার নির্ভুল ধারণা হয়েছে কিনা। প্রথমে ধারণা নির্ভুল ও স্পষ্ট হলে শিশু চর্চ্চাকালীন আনন্দ বোধ করবে, নতুবা প্রতিপদে তার গতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে, সস্নেহে ও সযত্নে শিশুকে ভাষাশিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে শিশু মাতৃভাষা সম্বন্ধে ভীতি বা বিতৃষ্ণা দেখাবে না এ অবশ্যসত্য, তবে শিশুশিক্ষিকার উপরে যে গুরুভার ন্যস্ত করা হয়েছে তার জন্য তাঁকে সম্যকরূপে প্রস্তুত হতে হবে।

এক হিসাবে লিখন পদ্ধতিকে পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা কঠিন বলা যেতে পারে। লেখবার সময়ে বিভিন্ন বাক্য ও শব্দের দৃশ্যরূপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় থাকা প্রয়োজন, কেননা তাদের চোখ ও হাতের পেশীগুলিকে স্ববশে আনা, সূক্ষ্ম পেশীগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে সেগুলিকে আয়ত্তাধীন করা (muscular co-ordination) শিশুর পক্ষে অতি জটিল কাজ। এর মধ্যে যদি বাক্যের সঙ্গে তার পরিচয় না থাকে তাহলে লেখার কাজ আয়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। সনাতন পদ্ধতিতে "দাগা" বুলানো ছিল অত্যন্ত নীরস, যান্ত্রিক, অর্থহীন ও শিশুর পক্ষে আনন্দ ও উদ্দেশ্যহীন।

শিশুকে লিখতে শেখাবার পূর্ব্বে দুটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে :—

(১) যে বাক্যটি শিশুরা লিখবে তার দৃশ্যরূপের সঙ্গে, তাদের গভীর পরিচয় থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

(২) লেখবার আগে শিশুকে এই জটিল ও আয়াসসাধ্য কাজটির জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

শিশুশিক্ষায় চিত্রাঙ্কনের কাজ হস্তলিপি শিক্ষার প্রধান সহায়ক। শিশুর আঁকা হিজিবিজি থেকে অক্ষরের মূলগত আকৃতি বার করে অক্ষরে পরিণত করবার কৌশল শিশুকে দেখিয়ে দিলে সে অত্যন্ত কৌতুকবোধ করবে এবং নিজেই হিজিবিজির মধ্যে অক্ষরের আকৃতি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে।
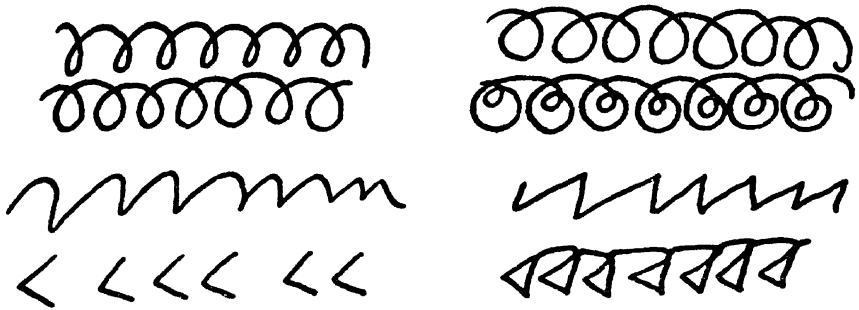
এইগুলির দ্বারা ক্রমে অ, ত, ব, র ইত্যাদি অক্ষরগুলি বেশ দ্রুত শেখানো যেতে পারে। এছাড়া প্রত্যেকদিন মনের মত কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর চোখ ও হাতের পেশীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হলে তাতেও শিশু লেখাব জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তারপরে যখন সে লেখার প্রয়োজন বোধ করবে বা ভাব প্রকাশ করবার তাগিদ অন্তর থেকে অনুভব করবে তখন সে লেখবার জন্য নিজেই এগিয়ে আসবে।

দুই একটি বাক্য যা সে লিখতে চায় তা শিক্ষিকা বোর্ডে, শ্লেটে বা মেঝেতে লিখে দেবেন। শিশু তাই দেখে নিজের খাতায় বাক্যটি লিখে নেবে। এইভাবে ক্রমশঃ তারা নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠানের বই, গাড়ী, বাড়ী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, পুতুল খেলার বই ইত্যাদি শিক্ষিকার সাহায্যে লিখে নেবে। বৎসরে ২।৩টি শ্রেণী পুস্তক এবং ২।৩টি ব্যক্তিগত পুস্তক প্রণীত হলে শিশুরা পালাক্রমে এক বৎসরে বেশ ১০।১৫ খানা বই পড়ে নিতে পারবে। পরস্পরের বই অদল বদল করলেই প্রত্যেক বই থেকেই প্রত্যেক শিশু কিছু নূতন তথ্য পাবে।

প্রথম স্তরে হস্তলিপির সৌন্দর্য্য, বানান বা ব্যাকরণের বিশুদ্ধির জন্য শিশুকে অতিরিক্ত ব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কোন কঠিন পরিশ্রম করবার সময়ে দেখা যায় বয়স্ক লোক কতরকম মুখভঙ্গী করে থাকে, তেমনি লেখার সময়েও দেখা যায় শিশুর শরীরে আয়াসজনিত নানা চিহ্ন—যথা উজ্জ্বল লেখবার সময়ে জিব বার করে, অনিল ডেস্কের উপরে খাতা রেখে, আসনে বসে লিখতে পারে না, হাঁটু মুড়ে বসে। এই আয়াসসাধ্য কাজে অনবরত তাদের লেখার সৌন্দর্য্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করলে তাদের লেখবার প্রেরণা ব্যাহত হবে। যদি শিক্ষিকা নিজে সর্ব্বদাই খুব সুন্দর ও পরিষ্কার ছাঁদে বোর্ডে লেখেন তাহলে শিশু স্বতঃই শিক্ষিকার হস্তলিপি অনুকরণ করবে এতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুর লেখার মধ্য দিয়ে তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবপ্রকাশকে প্রাধান্য দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

গণিত শিক্ষা—গণিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমতঃ কি উদ্দেশ্যে শিশুকে গুণতে শেখান হবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। শিশুশিক্ষায়তনে গণিতের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধেও শিশু-শিক্ষিকাকে অবহিত হতে হবে। যে কোন বিষয়ই পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হলে বিচার করে দেখতে হবে যে শিশুর দৈনন্দিন জীবনে এই পাঠ্য বিষয়টির ব্যবহারিক প্রয়োগ কি? দ্বিতীয়তঃ পাঠ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়টির দ্বারা অন্যান্য কিভাবে শিশুমনের প্রসারতা জন্মাবে সে বিষয়েও বিচার করা প্রয়োজন। এই দুইটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আমরা যদি শিশুকে সংখ্যাজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষা দিই তাহলে মনে হয় আমরা শিশুর অঙ্ক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলে তার উচ্চস্তরের জ্ঞানলাভের পথ সুগম করে দিতে সমর্থ হব।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু ৫ বৎসর পূর্ণ হলে তার "হাতে খড়ি" হয় এবং তারপরে তাকে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে যেভাবে অঙ্ক শেখানো হয়, তাতে প্রত্যেক শিশুর গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তারতম্যের দিকে কোনই লক্ষ্য রাখা হয় না এবং পাঠ্যক্রমের বিষয়ের সঙ্গে শিশুর দৈনন্দিন জীবনের যে সকল অভিজ্ঞতা তারও কোন যোগাযোগ থাকে না। ফলে শিশুর অঙ্কের জ্ঞান হয় অবাস্তব এবং কতকগুলি নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়া যন্ত্রচালিতের মত শিখে তার অঙ্কের প্রতি এক বিষম বিতৃষ্ণা জন্মায়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে শিশুশিক্ষায়তনে বা নার্সারি

স্কুলে শিশু দুই বৎসর বয়স হতে আসে এবং তাদের যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির স্ফুরণের জন্য যে সুযোগ তারা পায় তারই দ্বারা শিশুর গোড়াপত্তন হয়ে থাকে।

শিশুর গণিত শিক্ষার প্রথম ধাপে সে শেখে আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, পরিমাপ ইত্যাদি। নার্সারি স্কুলের শিক্ষা সরঞ্জামের মধ্যে এই সকল অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সুযোগ থাকে। এছাড়া বাড়ীতেও শিশু গুরুজনদের কথাবার্ত্তার মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে পায় যথা—মা দিদিকে বললেন, "রমা গোল করে রুটি বেল।" কিম্বা "চৌকা আসনটি দাও" ইত্যাদি। সন্দেশের ছাঁচ, চাকি বেলুন, থালা, গেলাস, ঘটি, বাটির দ্বারাও শিশুর আকার বা ওজন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

বড় থালায় ভাত খেতে, বড় আসনে বসতে, বড় খাটে শুতে কোন্ শিশু না আগ্রহ প্রকাশ করে? খুব ছোট থাকতেই শিশুর ছোট বড় সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা জন্মায়। ছোট গেলাসে জল দিলে শিশু অনায়াসে নিজ হাতে গেলাস তুলে জল খেতে পারে, বাবার গেলাসে পারে না। বাবার জুতা, লাঠি, বালিশ আনতে তার কত আগ্রহ কিন্তু ভারী বলে টেনে নিয়ে আসতে হয় অথচ নিজের জিনিষ বা ছোট বোনের জুতা, বালিশ, বিছানা তুলে আনতে কষ্ট বা শ্রম বোধ হয় না। হাতে একটি বিস্কুট দিয়ে বলা হলো, "ভেঙ্গে দুই ভায়ে খাও।" শিশু বিস্কুটটি দু'টুকরা করে বেশ নেড়ে চেড়ে দেখে যে ভাগ সমান হলো কি না এবং এমন শিশু খুব কমই দেখা যায় যে বিস্কুটের বড় টুকরাটি ভাইকে দিয়ে নিজে ছোটটি নেবে। তারপরে এলো সময়ের কথা। শিশুর সময় জ্ঞান প্রখর—ঠিক সময়মত আহার ও নিদ্রা না হলে সে অসুবিধা বোধ করে এবং ক্রন্দন ও অন্যান্য শব্দের দ্বারা অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করে। ক্রমে শিশু দিন ও রাত বুঝতে পারে, তারপরে বোঝে বাবার অফিসে যাওয়ার ও ফেরবার সময় ইত্যাদি। ক্রমে সকাল, দুপুর, বিকাল সম্বন্ধেও তার বেশ পরিষ্কার ধারণা জন্মায়। এছাড়া মার শাড়ীটি বড়, খোকার পূজার ধুতিটি লম্বায় ছোট, মাথার ফিতে চওড়া, সরু ইত্যাদি সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে শিশুর জ্ঞান

এই সকল ধারণা অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুকে প্রথমে গণিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এই প্রস্তুতির সময়ে ম্যাদাম মন্তেসরী প্রণীত ও প্রচলিত শিক্ষা সরঞ্জামগুলি ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। সেগুলি ভিন্ন নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ব্যবহার করেও আমরা সুফল লাভ করেছি।

১। একটি বাক্সে কয়েকটি নিব, বোতাম, সেফটিপিন, খালি রীল, বড় কাঠের পুঁতি, কাঁচের পুঁতি, কয়েকখণ্ড খড়ি ইত্যাদি রেখে, শিশুর সামনে বাক্সটি রাখা হলো। শিশুকে এক রকমের জিনিষগুলি পৃথকভাবে সাজাতে বললে সে মহা উৎসাহে এক রকমের জিনিষ পৃথক পৃথকভাবে সাজাবে। মনে রাখতে হবে যে জিনিষগুলি মাপে ও আকারে একই রকম হওয়া উচিত এবং যত রঙ্গীন হয় ততই শিশুরা আকৃষ্ট হয়ে এই কাজে মগ্ন হয়ে থাকবে। এতে বিভিন্ন জিনিষ ও বিভিন্ন আকারের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে।

২। একটি বাক্সে দুই মাপের একই রকম দুটি দুটি খেলনা রাখা হলো। ছোট ও বড় পুতুল, গাড়ী, জাহাজ, বাঁশী, পেন্সিল ইত্যাদি। শিক্ষিকা মেঝেতে খড়ি দিয়ে দুটি লম্বা দাগ কেটে শিশুকে নির্দ্দেশ দেবেন, বড় জিনিষগুলিকে এক সারিতে এবং ছোট জিনিষগুলিকে অন্য সারিতে সাজাও। এতে শিশুর বড় ও ছোট সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

৩। দুটি সমান আকারের বাক্সে একটিতে বালি পুরে বন্ধ করা হলো, অন্যটি খালি রাখা হলো। কোন্‌টা ভারী এবং কোন্‌টা হালকা শিশুকে অনুভব করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। এতে শিশুর ওজন সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। খালি কাগজের বাক্স, খালি বোতল, টিন, দেশলাইএর বাক্স ইত্যাদি এই প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলিকে $\frac{1}{2}$ ছটাক থেকে ১ পোয়া পর্য্যন্ত বালি ভরলে ওজন সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান আরও পরিষ্কার হয়।

৪। একটি ছোট বাক্সে কতকগুলি কাঁচের পুঁতি, অল্প কয়েকটি কাঠের পুঁতি, অনেকগুলি পেন্সিল, দুটি একটি কলম, অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি, দুই একটি বড় ছবি রেখে "কম" ও "বেশীর" ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলা যায়।

৫। বিভিন্ন মাপের দড়ি, লাঠি, পেন্সিল, মাথার ফিতে, কাগজ ইত্যাদির

দ্বারা লম্বা ও ছোট সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায়। যদি কোন কাজে শিশুরা এক-সারিতে দাঁড়ায় তাহলে কে কার চেয়ে লম্বা জিজ্ঞাসা করলে শিশুরা উচ্চতা সম্বন্ধে বেশ সহজভাবে জ্ঞানলাভ করবে।

শিক্ষায়তনে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যেমন শিশুর অঙ্ক শিক্ষা সুরু হয়, তেমনি ভাষা শিক্ষা ও খেলার মধ্যেও অঙ্ক শিক্ষার নানা সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। যথা—"মামাদের দরজায় বাঘা থাকে এক"; "এক দুই শুই শুই"; "দশটি পাখী কিচির মিচির", "হারাধনের দশটি ছেলে", "একটি বিড়াল একা একা গাছের তলায় রয়" ইত্যাদি ছড়াগুলির সাহায্যে দেখা গেছে শিশু এক হতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির নাম সহজেই শিখে ফেলে। কিন্তু গণনা শিক্ষা এবং সংখ্যার নাম জানা যে পৃথক ব্যাপার একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই। অনেক অভিভাবক শিশুকে শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি করবার সময়ে বলেন যে সে ১০০ পর্য্যন্ত গুণতে জানে। পরীক্ষা করে দেখ গেছে যে সে ১০০ পর্য্যন্ত সংখ্যার নাম জানে ঠিকই কিন্তু ১২টি জিনিষ ঠিকমত গুণতে জানে না। অবশ্য সংখ্যার নাম না জানলে কোন শিশুই গুণতে পারবে না একথা সত্য কিন্তু যেমন সংখ্যার নাম বলতে শিখবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগুলি গুণতে শিখবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রত্যেক শিক্ষিকার কাজে নামা উচিত। ডাঃ ব্যালার্ড (Dr. Ballard) বলেছেন যে, "All the rules of arithmetic are but expedients for shortening the time and labour for counting, and the results we arrive at tells us no more than we could discover by counting, they only tell it more quickly. Addition is counting forwards, subtraction is counting backwards; in multiplication and division we count forwards or backwards by leaps of uniform length." (৪৮) অর্থাৎ অঙ্কের যে কোন নিয়ম বা প্রক্রিয়াই আমরা শিশুকে শেখাই না কেন—সকল নিয়মের উদ্দেশ্যই সহজভাবে গুণতে শেখানো—এইজন্য প্রথম থেকেই শিশুকে সংখ্যার নাম জানতে ও চিনতে যেমন সাহায্য করতে হবে তেমনি সংখ্যার সাহায্যে প্রথমে মূর্ত্ত, তারপরে বিমূর্ত্তভাবে গুণতে শেখাতে হবে।

---

(৪৮) Ballard—Teaching the Essentials of Arithmetic—pp. 58 and 59.

আমাদের শিশুশিক্ষায়তনে যে সকল প্রণালীতে শিশুকে গুণতে শেখানো হয় তারই দুই একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো।
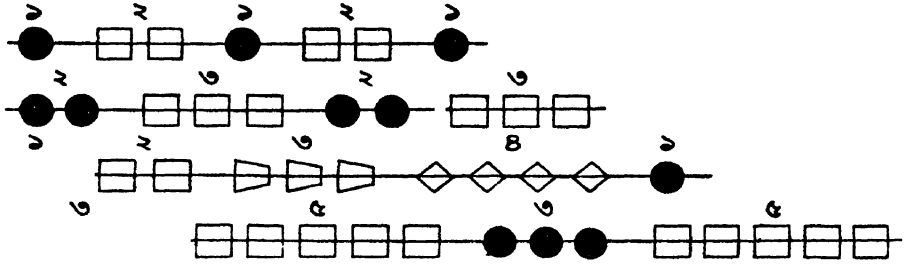
এইভাবে পুঁতি গেঁথে পুতুলের জন্য মালা তৈয়ারী করা শিশুরা খুব ভালবাসে।
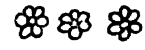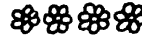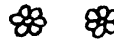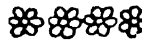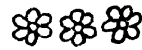
ছবি ও সংখ্যা মেলাবার খেলা।

ছবিগুলি খণ্ড খণ্ড করে কেটে একটি বাক্সে রাখতে হবে। ১০ এর পরে যে দুটি খালি জায়গা আছে সেখানেও ছোট খামে ভরে রাখা যায়।

সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশু বুঝতে পারলে সংখ্যার যে একটা সমষ্টিগত অর্থ আছে এ শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। পাঁচ বললে পাঁচটি ছেলে হতে পারে,

পাঁচটি বই হতে পারে, পাঁচটি মার্বেল হতে পারে কিম্বা পাঁচটি বিন্দু হতে পারে। সেই বিন্দুগুলি আবার নানাভাবে সাজানোও থাকতে পারে। যথা ঃ—

```
o  o    o o      ooooo,      o        o o o       o       o o o
ooo,   o o o,             o    o      o o ,   o o o ,      o
                        o        o,                o       o
```
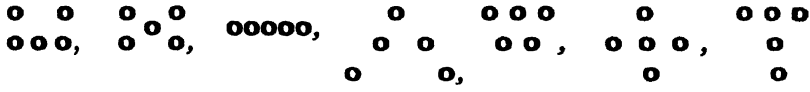
যে বস্তুই হোক না কেন পাঁচ বললে সমষ্টিগত বা দলগতভাবে পাঁচটি জিনিষের বিষয়ে যে বলা হচ্ছে একথা শিশু যেন প্রথম থেকে বুঝতে পারে। প্রত্যেক দিনের কাজের মধ্যেও এই ধারণা স্পষ্টীকৃত হয়। যথা—'রমা তুমি কটা কাগজ চাও? বিতান কটা খুরপী চাও? ক্লাশে তোমরা কজন এসেছ? কটা খাতা লাগবে? কটা প্লেট লাগবে? ঘরে কটা দরজা আছে? তোমরা কয় ভাই বোন, বাড়ীতে কজন লোক থাকে? কবার দৌড়ালে? কটা পুতুল গড়লে? কটা ফুল তুলেছ? এই ফুলটিতে কটা পাপড়ি আছে?" ইত্যাদি। সংখ্যার যে সমষ্টিগত অর্থ আছে শিশুর কাছে, সুস্পষ্ট হলে শিশুকে বুঝতে হবে যে সেই সংখ্যার সঙ্গে কোন প্রত্যয় বা "নম্বর" যোগ দিলে সেটি একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুজ্ঞাপক হয়। যথা—"পাঁচের পৃষ্ঠাটি খোল, দশ নম্বরের ছেলের হাতে বই নেই, তিন নম্বরে ছেলের পালা ইত্যাদি। তিন নম্বর বললে একটি বিশিষ্ট ছাত্রকে বোঝায় এবং তিনজন ছেলে বললে ৩ জন ছেলের সমষ্টি বোঝায়, এই স্তরে শিশুকে ক্রমশঃ বুঝতে হবে। এই সময়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি শেখাবার প্রয়োজন নাই।

এর পরে সংখ্যা যে এককের গুণিতক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাও শিশুকে বুঝতে হবে। যথা—আমাকে তিনটি পেন্সিল দাও আর আমাকে তিন বাক্স পেন্সিল দাও। তিনটি পেন্সিল আর তিন বাক্স পেন্সিল এই উভয় স্থলেই পরিমাণ বোঝাবার জন্য তিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তবুও পেন্সিলের সংখ্যা যে বিভিন্ন হয়েছে এ সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এইভাবে কিছুদিন শিশু গুণতে শিখলে পর ১০০-র মধ্যস্থ দশের গুণিতকগুলির নাম শিখিয়ে দিলে গণনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আমাদের ছেলেরা একটি খেলা সচরাচর খেলে থাকে যাতে দশের গুণিতকগুলির নাম ব্যবহার করা হয়। এই খেলাটি বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতি সুপ্রচলিত।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়ায়। গোলের মাঝখানে একটি শিশু দাঁড়িয়ে প্রত্যেক শিশুকে নির্দ্দেশ করে গোণে, "উবু দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশী, নব্বই, শ।" যে শিশু গণনায় "শ" হয় সে দল থেকে সরে দাঁড়ায়। পরে আবার গণনা সুরু হয়। এইভাবে যে সবশেষে "নব্বই" হয় সেই চোর হয়। এই খেলাটির দ্বারা শিক্ষিকা অনায়াসে শিশুদের দশের গুণিতক বুঝিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই নির্ভুল ভাবে গুণতে শেখাতে পারবেন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ১ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির নাম শেখবার সময়ে শিশু কয়েকটি নাম প্রথমে বুঝতে পারে না। যথা উনিশ, উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনআশী, তার পরেই **নিরানব্বই**। কিম্বা এগারো, একুশ, একত্রিশ, একচল্লিশ, একান্ন ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষায় 20 পর্য্যন্ত মুখস্থ করবার পর শিশু বেশ অনায়াসেই 21, 22 বুঝতে পারে কিন্তু বাংলাভাষায় সংখ্যার নামগুলি এরূপ স্বপ্রকাশিত নয়। সেইজন্য সংখ্যার নাম শেখাবার সময়ে শিক্ষিকা ধৈর্য্য সহকারে শিশুদের ভুলগুলি সংশোধন করে দেবেন।

সংখ্যার নাম ও বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হলে পর শিশুকে সংখ্যা লিখন ও পঠন শেখাতে হবে। সাধারণতঃ শিশুর গণিতের জ্ঞান এই স্তরে পৌছাবার আগেই সে বই পড়তে ও লিখতে শেখে। শিশু প্রথমে ১, ২, ৩, প্রভৃতি দশটি রাশি ভাল করে সরঞ্জাম সহযোগে অক্ষর লেখার মত লিখতে ও পড়তে শিখবে। তার পরে এক দশ এক এগারো শেখবার সময় শিক্ষিকা সরঞ্জামের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষা দেবেন। প্রত্যেক শিশুকে ১১টি করে সরু রঙ্গীন কাঠি ও একটি করে ফিতে দেবেন। তার পরে প্রত্যেককে কাঠির সাহায্যে ১, ২, ৩, ৪, করে দশ পর্য্যন্ত গুণতে নির্দ্দেশ দেবেন। দশটি কাঠি গোণা হলে পর ফিতে দিয়ে বাঁধতে সাহায্য করবেন। দশটি কাঠি এক সঙ্গে বাঁধা হলে সেটিকে ১ দশ বলে এবং যেটি অবশিষ্ট রইলো সেটি দিলে হয় ১১ এই ভাবে ১৯ পর্য্যন্ত শেখানো হবে। তার পরে ২০ হলে দশের দুটি আঁটি বেঁধে বিশ শেখানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা বোর্ডেও ছক কেটে ১১, ১২ ইত্যাদি লিখে ধারণা আরও স্পষ্ট করে দেবেন। এইভাবে প্রত্যেক দিনের কাজের সঙ্গে যোগ রেখে নানা সরঞ্জাম সহকারে শিক্ষায় অগ্রসর হতে হবে।

দশ কাঠির জায়গা দশক	আলাদা কাঠির জায়গা একক
১ দশ	১ এক

এই ভাবে ১৯ পর্য্যন্ত শিখিয়ে ২০ শেখবার সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ২০ বললে দশকের স্থানে ২ বসিয়ে এককের স্থানে কেন 0 বসবে, এই রীতিটি বিশেষ যত্ন সহকারে শেখাতে হবে। যেহেতু দুই দশে কুড়ি হয়, কাজেই দশ কাঠির দুইটি আঁটি হলেই কুড়িটি কাঠি হলো এবং সাজাবার সময়ে পৃথক কাঠির স্থানে কোন কাঠি বসাতে হয় না বলে 0 বসাতে হয় এই ধারণা শিশুর মনে পরিষ্কার করে এঁকে দিতে হবে।

শিশুশিক্ষায়তনের শেষ শ্রেণীতে শিশু ৫০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গুণতে, চিনতে ও লিখতে অবশ্যই শিখবে এবং কোন কোন শিশু ১০০ পর্য্যান্তও শিখতে পারে। শিশু তার নানাবিধ কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়ে যত বেশী বিভিন্ন সংখ্যার সংস্পর্শে আসবে ও ব্যবহার করবে, ততই তার সংখ্যা চেনবার ও লেখবার সুযোগ হবে। সেইজন্য নার্সারি স্কুলে সহজ ও আনন্দপূর্ণ খেলার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

একদিন বড় ছেলেমেয়েরা ও শিক্ষিকা সম্মিলিত ভাবে স্থির করলেন যে সৃজনাত্মক কাজের সময়ে লেখার খাতা বাঁধা হবে এবং যে সকল বই ছিঁড়ে গেছে সেগুলি আঠা দেওয়া ফিতে (adhesive tape) দিয়ে বাঁধতে হবে। এর জন্য একটি দোকান সাজানো হলো। একটি টেবিলের ওপর ৮″ ও ১০″ দুই সাইজের কাগজ রাখা হলো এবং দুই রীল ফিতে রাখা হলো। আগেই মেপে দেখা হয়েছে যে ছেঁড়া বইগুলি ৮″ ও ১০″ দুই সাইজের। পরে চার জন বিক্রেতা নির্ব্বাচিত হলো। চার জনকে ৪টি গজফিতে দেওয়া হলো। গজফিতে শিক্ষিকা নিজ হাতে তৈরী করে রেখেছেন। তাতে কেবল ইঞ্চিগুলি দাগ দেওয়া

আছে। স্থির হলো যে নিম্নলিখিত ভাবে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হবে। যথা:—

(১) এক টুকরা ৮″ ফিতে ১ পয়সা
(২) এক টুকরা ১০″ ফিতে ২ পয়সা
(৩) ১২টি ৮″ কাগজ ৩ পয়সা
(৪) ১২টি ১০″ কাগজ ৫ পয়সা

বড় বড় হরফে নির্দ্ধারিত মূল্য লিখে দোকানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো।

অন্য ১৬টি ছেলেমেয়ের হাতে ১০টি করে কাগজের পয়সা দেওয়া হলো। তারপরে কেনাবেচা স্থরু হলো। বিক্রেতাদের প্রত্যেকের কাছে একটি করে হিসাবের খাতা ছিল এবং ক্রেতারাও নিজের নিজের খাতায় হিসাব লিখে রাখছিল।

দোকান দোকান খেলায় প্রথমে বেশ গণ্ডগোলের স্থষ্টি হয়। এই চেঁচামেচি উৎসাহ ও আনন্দের পরিচায়ক। খেলার আরম্ভে শিক্ষিকা নিজে বিক্রেতা হবেন এবং প্রত্যেক শিশুকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে জিনিষ বিক্রি করবেন। তার পরে শিশুরা বিক্রেতার স্থান গ্রহণ করবে। এতে শিশুরা সহজে খেলাটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে এবং বেশী চীৎকার ও চেঁচামেচি করবে না। এই খেলার আর একটি অস্থবিধা হচ্ছে এই যে যখন ৪জন শিশু বিক্রি করছে এবং আর ৪ জন শিশু কিনছে ও হিসাব রাখছে, তখন অন্য ১২ জন শিশু বসে থাকতে পারে। এর জন্য বোর্ডে আগে থেকে ছক কেটে রাখলে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা ছকের মধ্যে বসিয়ে দিলে অন্য শিশুরাও এই সঙ্গে হিসাব রাখতে পারবে। এইজন্য 'দোকান' খেলায় দুই জন শিক্ষিকা থাকলে স্থবিধা হয়। এইভাবে "মাপের" খেলা বেশ কয়েকদিন চালানো হলো অন্যান্য নানা কাজের সাহায্যে যথা:—পুতুলের কাপড়-জামা, থলি সেলাইএর জন্য চট, পশম, স্থতা, ফিতে, রিবন, লেশ ইত্যাদি প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে' বেচাকেনা হলো এবং ১ গজের মাপে ক্রমশঃ ১″ থেকে ১২″ পর্য্যন্ত ব্যবহারও করা হলো।

এর পরে স্থির হলো যে খেলনার দোকান দেওয়া হবে। ছেলেমেয়েরা স্থজনাত্মক কাজের সময়ে যে সকল খেলনা প্রস্তুত করে সেগুলি বৎসরে দু'বার পিতামাতা ও অন্যান্য দর্শকবর্গকে দেখানো হয়, তারপরে প্রত্যেকের খেলনা

প্রত্যেককে দিয়ে দেওয়া হয়। খেলনাগুলি হাতে হাতে না দিয়ে একটি দোকান-ঘর সাজিয়ে বেচাকেনা হবে ঠিক হলো। প্রত্যেক খেলনার মূল্য নির্দ্ধারণ করে শিশুরা টিকিট তৈরী করলো, সেগুলি খেলনার গায়ে লাগিয়ে দিল। তারপরে বেচাকেনা সুরু হলো। এ খেলাও দুই দিন ধরে চললো। তারপরে এলো বনভোজনের পালা। এটি বেশ ব্যাপকভাবেই হলো। প্রথমে বাড়ীতে চিঠি লেখা হলো। তাতে শিশুরা লিখল কবে চড়ুইভাতি হবে, কি রান্না হবে, তার জন্য কি কি লাগবে, প্রত্যেকে কত করে চাল, ডাল, আলু, পয়সা ইত্যাদি দেবে। প্রত্যহ রসদ পৌছাতেই তা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে রাখা, পয়সা গণে হিসাব করা, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি ঠিকমত সাজিয়ে, গুছিয়ে ভাঁড়ারে তুলে রাখা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক কাজও প্রত্যহ চলতে লাগলো। বনভোজনের দিনে বড় ছেলেমেয়েরা (বয়স ৬ বৎসর) চাল, ডাল, তেল, লবণ, চিনি, মশলা, সব্জী মেপে, গুণে ভাঁড়ার থেকে বার করে দিল। কজন ছেলেমেয়ে খাবে, কটি পাতা পড়বে, কটি গেলাস চাই, হাঁড়ি, খুন্তি, কাঠ ইত্যাদিরও হিসাব রাখা হলো। বনভোজনের পরের দিন সমস্ত বিষয়ের হিসাব আর একবার খতিয়ে দেখা হলো। সকলের জিনিষপত্র যথা—কেউ থলি করে চাল দিয়েছিল, কেউ বাসনপত্র দিয়েছিল, ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা, জায়গা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে কিনা শিশুরা শিক্ষিকার সঙ্গে তদারক করে কাজ শেষ করলো। এইভাবে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল বলেই মনে হয়। এই সম্পর্কে শিশুদের সময়, বার, তারিখ, ক্রমে মাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় করানো যেতে পারে এবং হাতে না রেখে দুই ঘর সম্বলিত সংখ্যার সরল যোগ ও বিয়োগ শেখানো যেতে পারে।

শিশুকে কিরূপে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিলে ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে মনে হয় :—

১। বাগানের কাজের মধ্যে :—

কয়জন ছেলেমেয়ে বাগানের কাজ করবে ?
কয়টি খুরপী চাই ?
কয়টি ঝারি চাই ?

কয়টি নিড়ান চাই ?

কয়টি কোদাল চাই ?

কয়টি ঝুড়ি চাই ?

মোট কয়টি জিনিষ নিলে ?

কয় সারি গাছ লাগাবে ?

এক সারিতে কয়টি গাছ লাগাবে ?

দশটি করে কাঠি গুণে বেড়া বাঁধ। —ইত্যাদি

২। রান্নাবান্নার খেলা :—

কে কে খেলবে ?

বাসন-পত্র কয়টা লাগবে ?

কয়জন খাবে ?

কয়টি পাতা পড়বে ?

কয়টি আসন চাই ?

কয়টি গেলাস চাই ?

কয় পয়সার বাজার হবে ?

মাছ কত করে পেলে ?

আলুর দর কত ?

কয় গেলাস জল চাই ?

একটি বড় ঘটিতে করে সব জলটা আন।

প্রত্যেক গেলাসে জল ভর। —ইত্যাদি

৩। বাড়ী বাড়ী খেলা :—

বাড়ীটা কত উঁচু হবে ?

তুমি ঢুকতে চাও ?

তা হলে তুমি মাথায় কতটা উঁচু ?

(এবার সবাই নিজেদের মাপতে চাইবে)

বাড়ীটা কত লম্বা হবে ?

বাড়ীটা কত চওড়া হবে ?

কয়খানা ইঁট লাগবে ?

কয়টা দরজা জানালা দেবে ?

কত ঝুড়ি মাটি লাগবে ? —ইত্যাদি

পরে abacus বা বল ফ্রেম দিয়েও সংখ্যা গণনার পুনরাবৃত্তি করা হবে। এছাড়া অন্যান্য খেলার মাধ্যমে ঠিক এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

১। উপকরণ :—একটি ঝুড়ি, একটি বল ও হিসাব রাখবার জন্য একটি বড় বোর্ড।

একটি বড় বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে ঝুড়িটি রাখতে হবে। শিশুরা বৃত্তের চারিপাশে বসবে। যার পালা সে উঠে দাঁড়িয়ে বলটি ঝুড়ির মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করবে। কে কবার পারলো তার হিসাব রাখা হবে। প্রথমে শিক্ষিকা বোর্ডে হিসাব রাখবেন, পরে ছেলেমেয়েরা হিসাব রাখবে।

২। উপকরণ :—দশটি ৩″ লম্বা পাতলা কাঠের মাছ। মাছের গায়ে ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকবে।

একটি ছোট বৃত্ত আঁকতে হবে। তার চারিধারে পাঁচফুট দূরে আর একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বড় বৃত্তের চারিধারে শিশুরা বসবে এবং পালাক্রমে শিশুরা দশটি মাছ ছোট বৃত্তের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। প্রত্যেকে দু'বার করে পালা পাবে। বৃত্তের মধ্যে যত সংখ্যক মাছ পড়বে, সেই সংখ্যাগুলি সেই শিশুর নামে হিসাবে যোগ দিতে হবে।

(ক) এইভাবে মাছের নাকে নথ পরিয়ে, ছিপে চুম্বক বেঁধে দিয়ে মাছ টেনে তোলার খেলা হতে পারে।

(খ) দেওয়ালে কাঠের বোর্ড লাগিয়ে তাতে একটি পেরেক ঠুকে দিতে হবে। এতে রবারের বা দড়ির বিড়ে (ring) ছোড়ার খেলাও হতে পারে।

৩। যখন শিশুরা শান্ত হয়ে দুপুর বেলায় বই পড়ে তখন লুডো খেলা, ডমিনো খেলা, সাপ ও মই খেলা ইত্যাদি আরম্ভ করা যায়। তবে এইসব খেলার জটিল নিয়মগুলি বাদ দিয়ে কেবল ঘর গণে এগিয়ে যাওয়া, মারা ও ঘরে ওঠা এই তিনটি নিয়ম মানলেই খেলা শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দজনক হবে।

৪। এর পরে শিশুরা নানা জিনিষের দোকান দিতে পারে। প্রত্যেক দোকানই তাদের পরিচিত জিনিষপত্র দিয়ে সাজাতে হবে। দোকানের জন্য তাক ইত্যাদিও শিশুরা নিজ হাতে তৈরী করতে পারে ; জিনিষ-পত্রগুলিও

তাদের হাতে তৈরী হলে ভাল হয়। এই সকলের সাহায্যে যাতে লেখা-পড়া ও গণনা হতে পারে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার মধ্যে যতদূর সম্ভব সমগ্রতা ও অখণ্ডতা রাখা গেলে শিক্ষার বিষয় সহজ ও স্বাভাবিক হয়। দোকানের সাহায্যে জিনিষের আকার, ওজন, আয়তন, পরিমাণ ও মাপ সম্বন্ধে ধারণাগুলি সুস্পষ্ট হয়।

৫। পরিবেশ পরিচিতির দ্বারা প্রকৃতি-পাঠ, প্রকৃতি-পঞ্জিকা, দিন-পঞ্জিকা, খবরাখবর, ঘড়ি দেখা, সময়, তারিখ, বার, মাস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৬। টিকিট সংগ্রহ করে বাস, ট্রাম, রেলগাড়ী চালানোর খেলা বেশ সুখপ্রদ ও আকর্ষণীয় হয়। মুদ্রা প্রস্তুত, কয়জন আরোহী চড়বে, কত মুল্যের টিকিট বিক্রয় করা হবে, কোন্ কোন্ স্থানে গাড়ী থামবে—ইত্যাদির দ্বারাও গণিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৭। এ সকল ছাড়াও পৌনঃপুনিক চর্চা ও পুনরালোচনার জন্য যত বেশী রকমের ব্যক্তিগত কাজ দেওয়া যেতে পারে ততই ভাল। প্রথমে "কার্ড" প্রস্তুত করে শিশুদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে —তারপর খাতায় পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করবে।

গণিত শিক্ষার সময়ে শিক্ষিকাকে মনে রাখতে হবে যে প্রথম ধাপে শিশুকে কোন মতেই বিমূর্ত্ত (abstract) ভাবে সংখ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় এবং অঙ্কের প্রণালী, পদ্ধতি ও নিয়মগুলি প্রত্যেক ধাপে পুনরালোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট না হলে নূতন ধাপে অগ্রসর হওয়া শিশুর পক্ষে মহা বিপদের কথা। শিশু একটি ধাপ না বুঝে অন্য ধাপে অগ্রসর হলেই সে আর অঙ্ক বুঝতে পারে না এবং এইজন্যই অঙ্কের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও ভীতি জন্মায়। অঙ্ক শেখবার জন্য শিশুর কৌতূহল জাগাতে হবে, তার প্রয়োজনবোধ স্পষ্ট করে করে তুলতে হবে, তারপরে তার শিক্ষা আরম্ভ হবে। অঙ্ক অনুশীলনের সময় যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দানুভূতির দ্বারা সংখ্যার উপলব্ধি হলে শিশু সহজেই অঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

অষ্টম অধ্যায়

শিশুশিক্ষাসংস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষা

শিশুশিক্ষাসংস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষা

শিশু-শিক্ষায়তনে যে ভাবে শিশুর লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয় ; তার দেহ, মন ও আত্মার সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য যে সহায়ক পরিবেশ রচনা করা হয় তারজন্য চাই উপযুক্ত গৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষাসরঞ্জাম ও শিক্ষিকা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষার আয়তনকে আরও সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি। মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার, থালারও দরকার একথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই ভালো। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া শিক্ষার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিব। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈয়ারী করার মতোই হইবে।"(৪৯) আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুরা যতটা উন্মুক্ত স্থানে, গাছের নীচে খেলাধুলা, আহার বিশ্রাম করতে পারে ততই ভাল, কিন্তু যেখানে জলবায়ুর প্রচণ্ডতা উপেক্ষা করা যায় না সেখানে প্রত্যেক শিশুর জন্য গৃহাভ্যন্তরে ন্যূনপক্ষে ১৫ বর্গ ফুট স্থান নিরূপণ করা উচিত। শিশু-শিক্ষায়তনে ডেস্ক, টেবিল, চেয়ারের খুব বেশী প্রয়োজন নেই, তবে বড় ছেলে-মেয়েরা যখন লেখাপড়ার কাজ করবে তখন তারা মেঝেতে আসন পেতে বসবে, তাদের সামনের দিকে হেলানো ডেস্ক দিলে তারা আরামে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে কাজ করতে পারবে।

প্রধান শিক্ষিকার জন্য একটি পৃথক, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও সুরক্ষিত কক্ষের প্রয়োজন। কেননা এই কক্ষে তিনি পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবেন, চিকিৎসক শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করবেন, যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকবে এবং বিদ্যালয়ের মুল্যবান সরঞ্জামগুলি বন্ধ করে

(৪৯) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা : শিক্ষার বাহন, ১৫৫ পৃষ্ঠা

রাখার প্রয়োজন হলে এখানেই রাখা হবে। এছাড়া শিক্ষিকাবর্গের জন্য একটি বিশ্রামাগারের প্রয়োজন। শিশুদের সঙ্গে সর্ব্বদিনব্যাপী কাজকর্ম্মে শিক্ষিকার গুরু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হয়, সেজন্য তাঁর আধঘণ্টা সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। নিজের জিনিষপত্র রাখা, শিক্ষা-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা এই ঘরেই চলতে পারে। বিদ্যালয়ে ৬০—১০০ জন শিশুর খেলাধূলা, আহার-বিশ্রাম ইত্যাদির জন্য একহারা ইটের বাড়ী হলেও চলতে পারে, তবে প্রত্যেকের জন্য অন্ততঃ ১৫ বর্গ ফুট স্থান চাই এবং বিশ জন শিশুর জন্য একটি করে পৃথক কক্ষ থাকাই বাঞ্ছনীয়। শিশুদের ব্যবহারের জন্য পায়খানা ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের কাছে থাকা সুবিধাজনক। এ সকল কক্ষের ব্যবস্থা যেন শিশুউপযোগী হয় এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ বন্ধ করে রাখার জন্য একটি পৃথক কক্ষের প্রয়োজন। শিক্ষায়তনের কাজ সুরু হওয়ার কিছু আগে সেই কক্ষটি খুলে দিলে শিশুরা শিক্ষিকার সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনমত সরঞ্জাম নির্ব্বাচন করে নিতে পারবে। খেলার ও কাজের শেষে সরঞ্জামগুলি আবার সেখানে গুছিয়ে তুলে রাখবে। তোয়ালে, সাবান, গেলাস, চিরুণী প্রভৃতি শিশুদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্রের জন্য ছোট ছোট (locker) আলমারী, অভাবে বাঁশের তাকে দূরে দূরে রেখে দেওয়া ভাল। তবে আমরা দরিদ্র বলে প্রত্যেক জিনিষেই দারিদ্র্যের লক্ষণ সূচিত হবে তা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। অল্পের মধ্যে, অনাড়ম্বতা সত্ত্বেও প্রত্যেক জিনিষে যেন সুসঙ্গতি, মাৰ্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশিত হতে পারে, এ সম্বন্ধে দৃষ্টি থাকা উচিত। এইভাবে শিশু-শিক্ষায়তন গড়ে তোলা শিক্ষিকার উদ্ভাবনীশক্তি, নিষ্ঠা ও কর্ম্মনৈপুণ্যের উপরে নির্ভর করে।

শিশুশিক্ষায় শিক্ষিকা শিক্ষা-পরিবেশের প্রধান অঙ্গ। যদিও মন্তেসরী, এ, এস, নীল (A. S. Neill) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ বলেছেন যে শিক্ষিকা যবনিকার অন্তরালে প্রায় নিরপেক্ষ দর্শকরূপে অবস্থান করবেন তবুও আমরা জানি যে শিশুকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা বিষয়ক ব্যবহারে এবং চরিত্র গঠনে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া সর্ব্বদা সঙ্গত হয় না—কারণ সে আপনার ইষ্টানিষ্ট সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। এইজন্যই শক্তি, সামর্থ্য ও প্রস্তুতি অনুসারে প্রত্যেক শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাই শিশু-শিক্ষিকার দায়িত্ব গুরু। শিশুর

অন্তর্নিহিত পূর্ণ শক্তির অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার, তার যথাযথ উন্মেষ, সুনিয়ন্ত্রণ ও পরিণতির জন্য সুযোগ ও সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষিকার ওপরেই ন্যস্ত করেছে। সেইজন্য তাঁর পরিপূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

যিনি শিশুশিক্ষার কাজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তিনিই প্রকৃত শিশুশিক্ষিকা। কেবল উপজীবিকা হিসাবে এই কাজ নির্ব্বাচন করলে ক্রমে নিজের কাছেই নিজেকে প্রতারিত হতে হবে। প্রথমে নিজের মনকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে শিশুকে যথার্থরূপে তিনি ভালবাসেন কিনা। স্নেহ-সম্পর্ক-বিহীন, অনাত্মীয় যে শিশু, তার কার্য্যকলাপ, মলমূত্রাদি ত্যাগ, আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে শিক্ষিকার মনে বিরাগ জন্মাতে পারে। শিশুর খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করা বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সময়ে বুদ্ধিমতী শিক্ষিকার পক্ষে সহজ কিন্তু শিশুর অসহায় অবস্থায়, যথা হঠাৎ কাপড়-জামা নষ্ট হয়ে গেলে, নাক দিয়ে সর্দ্দি পড়লে, থাওয়ার সময়ে বমি করে ফেললে বা অসুস্থ হলে শিক্ষিকা আপন সন্তানবৎ তাকে স্নেহ ও যত্নের দ্বারা শুশ্রূষা করতে পারবেন কিনা তাও বিবেচ্য।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করবার জন্য শিক্ষিকার বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এইজন্য তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। শিশু ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, পুঁথিগত বিদ্যা, শিল্প-কলা ও সঙ্গীত-বিদ্যা এবং স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে তাঁকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। শিশুর মনের সন্ধান পাওয়া বড় সহজ কথা নয়, সেইজন্য শিশু-মনোবিজ্ঞান জানা থাকলে শিশুর ব্যবহার লক্ষ্য করে', তার কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষিকা শিশুর সহজাত সম্পদগুলির বিকাশের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আজ এই জটিল জীবন-যাত্রার দিনে শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়তো সহজ নয় তবুও তাঁর সমস্ত জীবনই যে শিশুর কাছে জীবন্ত উদাহরণ ও প্রেরণা একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। "শিক্ষক যদি জানেন তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহা পণ্য দ্রব্য নহে, যাহা মুল্যের

অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে,—ধর্ম্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও, তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্ত্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।" (৫০) শিশুশিক্ষিকার গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে মানি, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় তাঁর হৃদয়বত্তার। তাঁর আসন ছেলেদের অতি নিকটে। তাদের সুখে, দুঃখে, অভাবে, অভিযোগে তিনি হবেন তাদের সমব্যথী। অন্তর দিয়ে তিনি সকলকে আলিঙ্গন করবেন। তাঁর নিকটে ধনী, নির্ধন, বুদ্ধিমান বা নির্ব্বোধ সকলেই সমান স্নেহের ভাগী। শিক্ষিকার আসন মা, মাসীদের আসনের চেয়ে একাংশে শ্রেয়ঃ কারণ সেখানে স্বার্থের কোন সংঘাত নেই।

শিশুদের যে সব বিষয়বস্তু শেখানো হবে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে শিক্ষিকা পরিচিত হবেন এবং যথাসম্ভব প্রত্যেক কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করবেন। শিশু অনুকরণপ্রিয়, কাজেই তিনি যা করবেন, শিশু তাই করবে। সেইজন্য তাঁকে কর্ম্মদক্ষ হতে হবে। তাঁর চলা, বলা ও মেলামেশার ভঙ্গি সুমার্জ্জিত হবে। তাঁর কথায় মিষ্টতা, সরলতা ও সভ্যতা থাকা প্রয়োজন। কোন শিশু সম্পূর্ণ বিশ্বাসভরে তাঁর হাতে সামান্য একটি বাঁশী বা ভাঙ্গা চুড়ি রাখতে দিল এবং তিনি সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে পরে ভুলে গেলেন, এমন যেন কখনও না হয়, কেননা তাতে শিশুর কাছে বিশ্বাসভঙ্গ হয়। স্থির, ধীর, চিন্তাশীলা ও বুদ্ধিমতী হলে ক্ষেত্র বুঝে শিক্ষিকা অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। এ সকল ছাড়া তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা চাই। হঠাৎ বিপদ হলে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে স্থিরতা, বিচক্ষণতা ও তৎপরতার প্রয়োজন—এর জন্য সর্ব্বদা সজাগ মনে চলাফেরা করতে হবে। শিক্ষিকা নিজের শরীরের ও মনের যত্ন গ্রহণ করবেন এবং স্বাস্থ্যচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা নিজেকে সকলের আদর্শস্থল, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলবেন।

শিশুশিক্ষালয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে দেওয়া উচিত এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে। লোহা, পিতলের মত ছাঁচে ঢেলে শিশুদের গড়ে তোলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। সেইজন্য

(৫০) রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা—শিক্ষা সমস্যা।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিশুশিক্ষা দিতে হবে। এইজন্য শিশুর সঠিক বয়স জানা গেলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে, সে দেহে ও মনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত কিনা তাও সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়। প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রগতিপত্র রাখা উচিত এবং বৎসরে তিনবার পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। এই প্রগতিপত্র বেশ সহজ ও সরল-ভাবে প্রতি সপ্তাহেই লিখে রাখলে শিশুকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টিলাভে সাহায্য করা সহজ হয়ে উঠবে।

প্রগতিপত্রের নমুনা ঃ—

শিশুর নাম— অভিভাবকের নাম—
জন্মের তারিখ— ঠিকানা—
ভর্ত্তির তারিখ— পেশা—
ভাইবোনদের মধ্যে শিশুর স্থান— সন্তানের সংখ্যা—

ব্যক্তিত্ব নিরূপক গুণাবলী ঃ—

(১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
(ক) ব্যক্তিগত
(খ) সামাজিক
(২) আগ্রহ
(৩) মনঃসংযোগ
(৪) আত্মবিশ্বাস
(৫) ধৈর্য্য
(৬) সহযোগিতা
(৭) সামাজিকতা
(৮) দায়িত্ববোধ
(৯) সততা
(১০) সু-অভ্যাস
(১১) পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা
(১২) স্নেহপ্রবণতা
(১৩) নির্ভীকতা
(১৪) চিন্তাশক্তি
(১৬) আত্মসংযম
(১৬) স্বাবলম্বিতা

এই সকল বিচারের ফলাফল পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং সেইসব শ্রেণীর পরিচায়ক 'ক' 'খ' প্রভৃতি এক একটি চিহ্ন থাকবে। যথা ঃ—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
অতি উত্তম	উত্তম	মধ্যম	সামান্য উন্নতি দেখা যায়।	উন্নতি দেখা যায় না

নার্সারি স্কুলে লেখা পড়া ও অঙ্কের জন্য সচরাচর প্রগতিপত্র রাখা হয় না কিন্তু শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার পূর্ব্বে তার জন্য একটি প্রগতিপত্র প্রস্তুত করা উচিত।

তারিখ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
পড়া	অতি উত্তম।	নির্ভুল পড়তে পারে। বুঝতেও পারে।	পড়া নির্ভুল কিন্তু থেমে থেমে পড়ে।	থেমে থেমে পড়ে। বুঝতে পারে না।	পাঠ বুঝা যায় না।
লেখা	অতি উত্তম।	অক্ষরের সমতা আছে। পরিষ্কার লেখে।	লেখা পরিষ্কার।	অপরিষ্কার ও অসম হস্তাক্ষর।	ভাল লিখিতে পারে না।
অঙ্ক	অতি উত্তম।	উত্তম।	সংখ্যা জ্ঞান ও গণনা শিক্ষা হয়েছে।	গণনা শিক্ষা হয়েছে, সংখ্যা জ্ঞান হয় নাই।	প্রস্তুত হয় নাই।

এই প্রগতিপত্রের সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্যপঞ্জী একত্র রাখলে শিশু সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ হবে। (৫১)

প্রগতিপত্র ও স্বাস্থ্যপঞ্জী প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক শিশুর বাড়ীতে গিয়ে শিশু কি ভাবে সেখানে থাকে, কি খায়, কি খেলা খেলে, পিতামাতা কি ভাবে তাকে আদর যত্ন করেন ইত্যাদি এবং যে সকল বিষয়ে শিশুর ক্ষতি হতে পারে তা লক্ষ্য করে অতি সন্তর্পণে, সতর্কতা ও সহানুভূতির সঙ্গে শিশুর জনক-জননীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা শিক্ষিকার কর্ত্তব্য। শিশুর ক্রমশঃ কি ভাবে উন্নতি হচ্ছে এবং সমস্ত কাজে সে কেমন ভাবে যোগদান করছে এসকলও পিতামাতাকে জানান উচিত। এতে তাঁরা খুশি হন এবং অধিকতররূপে সহ-যোগিতাদানে শিক্ষিকার কাজ সহজ করে তোলেন। বিদ্যালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানে পিতামাতাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আহ্বান করতে হবে এবং এই

(৫১) শিক্ষা ব্যবহারিকা—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার।

সকল অনুষ্ঠানে শিশুরা নিজেদের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী সাজিয়ে রাখবে, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের দ্বারা অতিথিগণের মনোরঞ্জন করবে। গৃহ ও শিক্ষায়তনের মধ্যে মধুর, সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়ে উঠলে শিশু ও শিক্ষিকার মধ্যেও সহজ সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। এ সমস্ত কাজেই প্রধান শিক্ষিকা অন্যান্য সকল শিক্ষিকার মতামত গ্রহণ করে তাঁদের সহযোগিতায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এ কথা বলাই বাহুল্য। শিশুশিক্ষায়তনে শিশুদের কিভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে আজকাল সকল দেশেই শিক্ষাবিদগণ চিন্তা করছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের একটা মোটামুটি ধারণা আছে যে ধর্ম্ম প্রার্থনীয় বটে কিন্তু কি ভাবে ধর্ম্মাচরণ করা যায় সে বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। আবার অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম সামাজিকতার একটি অঙ্গ মাত্র। অনেকে আবার যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্ব্বলতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন এবং ধর্ম্মকে জীবনের এক কোণে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন।

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন জোর নেই, কেননা রাষ্ট্র ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ তবে ধর্ম্মবিরোধী নয়। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিদিন অনুভব করছেন যে ধর্ম্মবিহীন যে শিক্ষা তা পূর্ণশিক্ষা নয়, অথচ আমাদের এই মহাদেশে নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় তরুণমতি বালকবালিকাদের কি শেখানো যায় এবং কেমন করে শেখানো যায়, এ সম্বন্ধে মহা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নানা পরামর্শ ও মন্ত্রণা করেও ধর্ম্মশিক্ষা যে কেমন করে যথার্থ রূপে দেওয়া যেতে পারে, তা স্থির করতে না পেরে মোটামুটি একটা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা করে সকলে শান্ত হয়েছেন। কিন্তু তার ফল যে কোন মতেই সুখকর নয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নানা ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। সেইজন্য শিশুর জীবনে কি ভাবে ধর্ম্মানুভূতি জাগানো যায় সেই বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ধর্ম্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত, ধর্ম্মশিক্ষা সেখানেই স্বাভাবিক।" আজ শিশুশিক্ষা জগতে এই বাণী আমাদের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করতে হবে। অতি শৈশবে ধর্ম্ম কি শিশু তা বোঝে না এবং উপদেশাবলীও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ও পরিবেশ। শিক্ষিকা যে উন্নত আদর্শ শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান তা তিনি নিজে

মনে প্রাণে গ্রহণ করে—তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, আচার ব্যবহারে পরিস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা করবেন। ক্রমে তাঁর আদর্শানুসারে শিশুদের আচার-ব্যবহার গড়ে উঠবে, কেননা, ধর্ম্ম ও নীতির গোড়ার কথা হচ্ছে, "শেখা নয়," "জানা নয়," এমন কি "করতেও নয়" কিন্তু "হওয়া"। আমরা আমাদের শিশুদের জন্য আনন্দ-ময় পরিবেশ রচনা করতে চেষ্টা করি। ঋষিগণ বলেছেন, "সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে এবং সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে।" এই যে ঋষি বাক্য তা সকল শাস্ত্রে, সকল ধর্ম্মে, সর্ব্বকালে মহা সত্য। এই আনন্দের মধ্যে যেন আমরা আমাদের শিশুদের লালন করতে পারি তাই আমাদের পরম ও চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা যে পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি তা আনন্দময়। রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন করে যেমনি চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠে, অমনি বনে উপবনে পাখীদের উৎসব পড়ে যায়। প্রতিদিন প্রভাতের আলোকস্পর্শে আমরা নূতন করে প্রাণশক্তির অনুভব করি। গৃহের আরাম, স্নেহ, প্রীতি তাও আমাদেরই জন্য। নব বসন্তের পুষ্প বৈচিত্র্য, গ্রীষ্মের আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধ, বর্ষার মেঘমেদুর রূপ, হেমন্তের সূর্য্যকিরণ, অগ্রহায়ণের পক্কশস্য-সমুদ্রে সোনার উৎসব—সেও আমাদেরই জন্য। এই যে রূপ, রস, গন্ধ-ভরা মধুময় পৃথিবী, এ তো আমাদেরই আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য এখনও নির্ভর করছে আমরা কে কতটা গ্রহণ করতে পারি।

পাশ্চাত্য জগতে মনীষী ও শিক্ষাবিদগণ, বিশেষ করে ফ্রোবেল বার বার আমাদের বলেছেন যে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আনন্দময় পরিবেশের নিতান্তই প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মুল কথা—শিশুকে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে লালন করে', প্রকৃতির প্রতি শিশুর লক্ষ্য নিবিষ্ট করে' তাকে সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে বড় হতে দিতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তা শিশু আকণ্ঠ পান করে যখন সে নিজে সংযত হতে শিখবে তখনই সহ-মনুষ্যের প্রতি তার ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ফ্রোবেল আরও বলেছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভগবান প্রকাশিত হয়ে আছেন কিন্তু আমাদের সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকী আছে। আনন্দময়, সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, এইজন্যই শিশুর জন্মের পর হতেই তার যা কিছু অভিজ্ঞতা

হবে তা সকলই সুখকর হওয়া উচিত। তা হলেই সকল শিক্ষাই নিতান্ত সহজ হবে, একেবারে নিঃশ্বাস গ্রহণের মত।

ঈশ্বরকে বিদ্যালয়ে আবাহন করবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না। প্রতিদিন, প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায়, প্রত্যেক বিশেষ কাজে যখন আমরা সকলে একত্র হই এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হই তখনই আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হয়। এই সত্য উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তি-নিকেতনে উৎসব পালনের রীতি প্রবর্ত্তিত করেছিলেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রেও উৎসবকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মাধ্যমে লেখা, পড়া, গণনাশিক্ষা খুব ভালোই হতে পারে সত্য, কিন্তু উৎসবের মূল কথাটি ব্যবহারিক নয়। উৎসব মানুষকে তার প্রতি দিনের গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তি দেয়, তার জীবনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। উৎসবের দিনে আমরা সকল সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিই, সকলের জন্য আমাদের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, আমরা নিশ্চেষ্টতা হতে জাগ্রত হয়ে মঙ্গলকর্ম্মে উদ্যোগী হই। এই উদ্যোগ আমাদের শিক্ষায়তনের মূল সুর। উদ্যোগের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বালক-বালিকা শিক্ষিকার সঙ্গে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে এবং এইজন্যই কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক দিনের কার্য্যাবলী আনন্দরসে পরিপূর্ণ। জগতে যেখানে আনন্দ, সেখানেই অব্যাহত কর্ম্মের ও শক্তির প্রচুর প্রকাশ এবং সেখানেই তো উৎসব। এই যে আনন্দময়, কর্ম্মময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় কর্ম্ম-কেন্দ্রিক শিশুশিক্ষায়তনে, সেখানে প্রেমে ও কর্ম্মে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায় এবং ন্যায়, দয়া ও সত্য আপনা হতেই নিজেদের স্থান খুঁজে পায়।

ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিগত। বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা আচার অভ্যাস করাকে ধর্ম্মশিক্ষা বলা যায় না। ধর্ম্ম কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় না বা ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কের মত শেখানোও যায় না। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা শিশুর মনে ধর্ম্মভাব জাগানো যায়। এইজন্য শিশুর সাধনার আসনের পাশে আপনার সাধনার আসন পেতে, শিক্ষিকা তার সঙ্গে আচারে, ব্যবহারে, কাজে ও কর্ম্মে ধর্ম্মাচরণ করবেন। যে শিক্ষায়তনে সকল কর্ম্মই ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সহজেই ধর্ম্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্যই মনে হয় সেবাগ্রামে গান্ধীজীর আশ্রমে প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই এক এক যজ্ঞ আখ্যা

দেওয়া হয়ে থাকে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সাধনা নিত্য প্রত্যক্ষরূপে বালক-বালিকাগণ দেখে ও অংশ গ্রহণ করে। ক্রমে নিজেদের জীবনে প্রেম, দয়া ও সত্যের মূল্য কি তা উপলব্ধি করে' আপনাদের জীবন দ্বারা তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এইজন্যই বৈদিক যুগে তপোবনের স্থান উচ্চে ছিল। বৌদ্ধ-বিহারগুলিতেও সাধনা ও শিক্ষা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্রে মিলিত হয়েছিল বলেই দেওয়া ও পাওয়া এত সহজ হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তাঁদের শিক্ষায়তনগুলিকে আশ্রমের ন্যায় গড়ে তুলেছিলেন যেন সেখানে তরুণমতি বালক-বালিকাগণ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্রে দেখতে পায় এবং নিজেদের কাজের মধ্যে প্রেম, দয়া, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণগুলি সহজেই প্রকাশ করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের দুইজন মহাত্মা প্রকৃত শিক্ষার জন্য আশ্রমিক পরিবেশকে প্রকৃষ্ট বলে মনে করেছেন এবং সেখানে শিশু আপনার চিত্তের গতি অনুসারে শিক্ষার বিষয়গুলি নিজেদের চোখে দেখে, কাণে শুনে, ভাবে, আভাসে প্রকৃতির মধ্য হতে খুঁজে বার করবে ও শিখবে তাঁরা এই নির্দ্দেশও আমাদের দিয়েছেন। গান্ধীজীর আশ্রমে প্রতি-মাসে নানা উৎসব প্রতিপালিত হতে দেখেছি। দেওয়ালী উৎসব, ঈদ উৎসব, খ্রীষ্ট জন্মোৎসব, মাঘোৎসব ও বুদ্ধ জন্মোৎসব পালিত হতে দেখেছি এবং নিজে এ সকলে অংশ গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকবারেই আমরা ছোট, বড় সকলে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই সকল উৎসব আয়োজনে যোগদান করে উৎসবটিকে অনুষ্ঠানে ও মঙ্গলকর্ম্মে সাফল্যমণ্ডিত করেছি। মহাপুরুষগণের জীবনী সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে, নাট্যে রূপায়িত করা হয়েছে, তৎসাময়িক বেশভূষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করা হয়েছে, উপযুক্ত স্তোত্র ও সঙ্গীত অভ্যাস করা হয়েছে, উৎসবের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরে সকলে একত্রে মিলিত হয়ে উৎসবটিকে আনন্দমুখরিত করে তুলেছি। এইভাবে শিশু, বালক-বালিকা ও গ্রামবাসিগণ পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের সাধনার ও সিদ্ধি-লাভ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছে। সেখানকার আশ্রমিক জীবন, শিক্ষাগুরুদিগের সরল ও নির্ম্মল জীবন যাত্রা, পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মে সমভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দ্বারা এবং প্রতিদিনের প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্মানুশীলন মনে করায় শিশুরা সহজেই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রণোদিত হয়।

নৈতিকশিক্ষা ভালো-মন্দের বিচার করতে শেখায় কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা ধর্ম্মকে জীবনে গ্রহণ করে' পালন করতে প্রেরণা দেয়। এই যে প্রতিদিন শিক্ষায়তনে ধর্ম্ম পালন করবার শিক্ষা—এর উৎস আছে এই উৎসবগুলিতে। একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে সমস্ত পরিকল্পনাটি (project) গড়ে তোলা যায় এবং প্রত্যেক দিন এক একটি আনন্দময় আয়োজনের দ্বারা উৎসবটি সফল করে তুলতে শিশুশিক্ষায়তনে যে পরিবেশের সৃষ্টি করতে হয় তাতেই ধর্ম্মাচরণ করবার জন্য শিশু নানা সুযোগ পায়। "Not long ago I met one of our great school masters—a veteran in that high service. "Where in your time-table do you teach religion ?" I asked him. "We teach it all day long", he answered. "We teach it in arithmetic, by accuracy. We teach it in language by learning to say what we mean—'yea, yea and nay, nay. We teach it in history by humanity. We teach it in geography by breadth of mind. We teach it in handicraft by thoroughness. We teach it in astronomy by reverence. We teach it in the play-ground by fair play. We teach it by kindness to animals, by courtsey to servants, by good manners to one another and by faithfulness in all things. We teach it by showing the children that we, their elders, are their friends and not their enemies." Finally he added a remark that struck me—"I do not want religion," he said, "brought into this school from outside. What we have of it we grow ourselves."

L. P. Jacks—A Living Universe.

আমাদের শিশুদের আমরা সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলতে চাই, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার বাগবিন্যাস ও ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আড়ম্বর থেকে রক্ষা করতে চাই, আমরা চাই যে তারা এই সুন্দর পৃথিবীতে সুখে বসবাস করুক, এইজন্যই তাদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী-সম্পন্ন মহাপুরুষদিগের জীবনী ও শিক্ষা তুলে ধরি। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলী শিশুদের মনে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয় না—তাদের সুকুমার মন তাঁদের জীবনের বিরাট মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে

পারে না। তারা তাদের পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মধ্যে সেই গুণ-গুলি সন্ধান করে; সেইজন্যই আমরা আমাদের জীবনে ধর্ম্মের দীপবর্ত্তিকাগুলি এমনভাবে জেলে রাখতে চেষ্টা করবো যাতে তাদের যা শেখাতে চাই তা যেন তারা আমাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্মের মধ্যে দেখতে পায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে—

"অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

1. Charlotte Bühler. From Birth to Maturity. (Kegan Paul)
2. Arnold Gesell. The First Five Years of Life. (Methuen)
3. Susan Isaacs. Intellectual Growth in Young Children. (Routledge)
   Social Development in Young Children. (Routledge)
4. Lillian De Lissa Life in the Nursery School. (Longmans)
5. E. R. Boyce. Infant School Activities. (Methuen)
   Play in the Infant's School. (Methuen)
6. D. E. M. Gardner. Testing Results in the Infant School. (Methuen)
7. Ministry of Eduction, U. K. Infant and Nursery School Report. (H. M. S. O.)
8. C. M. Fleming. Individual Reading in the Primary School. (Harrap)
9. F. J. Schonell. The Psychology of the Teaching of Reading. (Oliver & Boyd)
10. E. Brideoake & I. D. Groves. Arithmetic in Action. (Univ. of London Press)
11. P. B. Ballard Teaching the Essentials of Arithmetic. (Univ. of London Press)
12. E. G. Hume. Learning & Teaching in the Infants School. (Longmans)
13. Helga Eng. Psychology of Children's Drawings. (Kegan Paul)
14. W. Viola. Child Art. (Univ. of London Press)
15. Ann Driver. Music and Movement (Oxford Univ. Press)

16.	R. F. Butts.	A cultural History of Education.	(McGraw-Hill)
17.	R. S. Woodworth.	Psychology. A study of Mental Life.	(Methuen)
18.	Report by the C. A. B. of Education.		(Govt.of India Press)
19.	A. E. Meyer.	The Development of Education in the 20th century.	(Prentice Hall Ed. Series)
20.	Nursery School Association.	Repairing Toys.	
21.	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রচনাবলী	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
22.	পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার	শিক্ষণ ব্যবহারিকা	পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার
23.	শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ	আমাদের শিক্ষা	এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং
24.	শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত	বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
25.	বিজয়কুমার ও সাধনা	বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
26.	শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতা	রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা	দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ
27.	শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথের গান	অভিযান পাবলিশিং হাউস
28.	শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিক	'শিক্ষাব্রতী' মাসিক পত্রিকা	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
29.	শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিক	নূতন শিক্ষা	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
30.	শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য	বুদিয়াদী শিক্ষা	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
31.	শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত	বুনিয়াদী শিক্ষার কথা	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি